বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও পঠনপাঠন সমস্যা

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

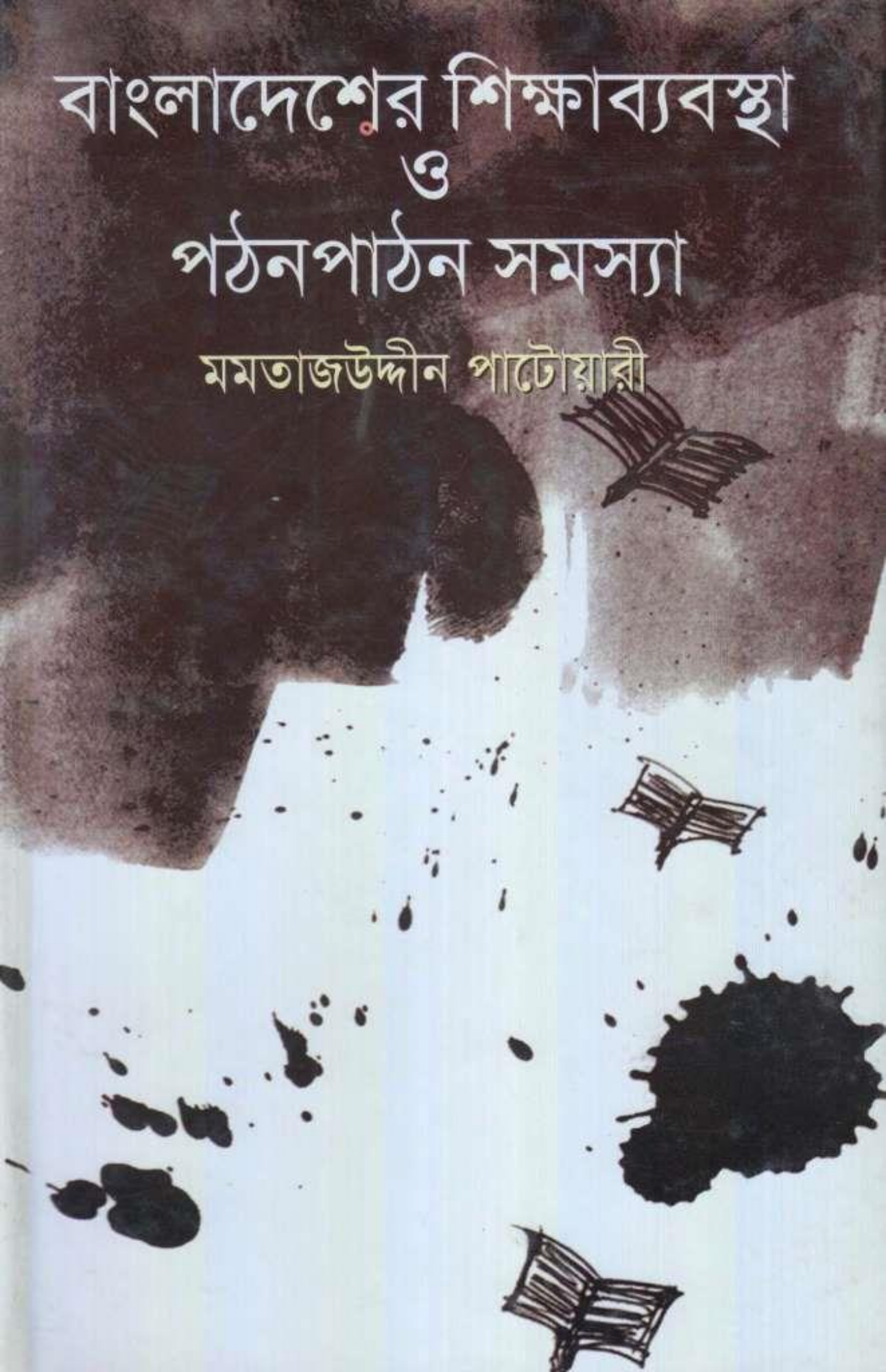

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও পঠনপাঠন সমস্যা

www.pathagar.com

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও পঠনপাঠন সমস্যা

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

অনিন্দ্য প্রকাশ

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪১৬ এপ্রিল ২০০৯

প্রকাশক
আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১৭ ২৯৬৬; ০১৭১১ ৬৬৪৯৭০

বিক্রয় কেন্দ্র
৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১১৯৬ ০৭৪৮৯২

বর্ণবিন্যাস
সেতু কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : শিবু কুমার শীল

বানান সমন্বয় : সেলিম আলফাজ

মুদ্রণে
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা-১১০০
মূল্য : ২২৫.০০ টাকা

Education System and Teaching-Learning Problems in Bangladesh : Mamtazuddin Patwari
Published by Afzal Hossain Anindya Prokash
30/1-Ka Hemendra Das Road Dhaka-1100. Phone 717 2966
First Published in April 2009

Price : Taka 225.00
US $ 8.00

ISBN 984 70082 0181 9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক
এমএ বারী (জন্ম ১৯৪১–মৃত্যু ২০০৩)
ষাটের দশকের শেষের দিকে ছিলেন
মাধাইয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক
তাঁকে একজন প্রগতিশীল, আদর্শ, দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক হিসেবে পেয়ে উজ্জীবিত হয়েছিলাম
আমার এই শিক্ষাগুরুকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিবেদন

কোনোপ্রকার শিক্ষানীতি, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা ছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাটি এ পর্যন্ত বেড়ে উঠেছে। অবশ্য শিক্ষানীতি গ্রহণের চিন্তা স্বাধীনতা লাভের শুরুতে নেওয়াও হয়েছিল। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ৪ জাতীয় মৌলনীতিকে বাস্তবায়নের চিন্তা থেকেই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। একটি চমৎকার শিক্ষানীতি প্রণীতও হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যদিয়ে বেশ পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গতিপথই সম্পূর্ণরূপে উল্টোদিকে পরিবর্তন করা হয়। শিক্ষানীতিও সেইসঙ্গে পরিত্যাজ্য হয়। বারবার নতুন নামে শিক্ষানীতি প্রণীত হলেও কোনো শিক্ষানীতিই শেষপর্যন্ত আলোর মুখ দেখেনি। শিক্ষানীতি আলোর মুখ না দেখলেও দেশে লেখাপড়া বন্ধ থাকেনি, থাকার কথাও নয়। নানা নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অপরিকল্পিতভাবে কোনো প্রকার শিক্ষানীতি ছাড়াই আমাদের দেশে প্রাক-প্রাথমিক থেকে সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। দেশে সরকারি, বেসরকারি, ব্যক্তিগত, যৌথ ও বিদেশি অর্থায়নে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বলা হয়ে থাকে এখন দেশে ১১ ধারার শিক্ষাপ্রতিষষ্ঠান কার্যকর আছে। মোটাদাগে যদিও সাধারণশিক্ষা এবং মাদ্রাসাশিক্ষা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ধারা হিসেবে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু বাস্তবে ধর্মশিক্ষার নামেও একাধিক ধারার শিক্ষাব্যবসস্থা নানা ডাল-পালা বিস্তার করে বেড়ে উঠছে, সাধারণশিক্ষার নামেও ইংরেজি, কেজি স্কুল, সরকারি, বেসরকারি ইত্যাদি পরিচয়ের স্কুল-কলেজ বেড়ে উঠছে। সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাও এখন পাবলিক ও প্রাইভেট নামে বিভক্ত হয়ে গেছে। বাস্তবতা হচ্ছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শুরু থেকে শেষপর্যন্ত হ-য-ব-র-ল অবস্থা বিরাজ করছে।

শুধু প্রতিষ্ঠানিক সমস্যাই প্রধান নয়, দেশব্যাপী সর্বস্তরে শিক্ষার মানের সংকটও প্রকট হয়ে আছে। যত নামিদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথাই শোনা যাক না কেন, নামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাক্রম বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই নেই। সাধারণ বা মাদ্রাসাশিক্ষার গড়পরতা মান কিন্তু নিম্নমুখী, গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই নানা সমস্যায় জর্জরিত, ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান অপ্রত্যাশিতভাবে নেমে যাচ্ছে, শহরাঞ্চলেও মানসম্মত পাঠদান এবং শিক্ষার পরিবেশ দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা মননশীল ও সৃজনশীল লেখাপড়ার চাইতেও পরীক্ষাকেন্দ্রিক প্রস্তুতিনির্ভর লেখাপড়াই করছে বা পাচ্ছে, শিক্ষকদেরও বড় অংশই শ্রেণী পাঠদানে তেমন মনোযোগী নয়, কোচিং ও ব্যাচ পড়ানোতে মনোযোগী হয়ে যাচ্ছেন, ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করা, শেখা এবং নিজেদের প্রস্তুত করার ভিত বেশ নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষায় যে পরিমান ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পাচ্ছে তাতে একধরনের মেধার বিস্ফোরণ ঘটার কথা। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন ততটা ঘটেছে বলে মনে হয় না। এর মূল কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের যথাযথ দায়িত্ব পালন করছে না, করতে পারছে না। সব ধরনের বৈষম্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দিন দিন বেড়ে চলছে। অথচ

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যয় বেড়েই চলছে, সাধারণ মানুষেরও পাঠ্যপুস্তকের মান নিয়ে যথেষ্ট অভিযোগ আছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, জ্ঞানতত্ত্ব, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানব চিন্তার মৌলিক ধারণা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যেভাবে সুবিন্যস্ত হওয়া দরকার তা কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোথাও যথাযথভাবে নেই। আমরা কী পড়ব, ছাত্রছাত্রীদের কী কী পড়াব, শেখাব, কী ধরনের সিলেবাস, মূল্যাবোধ, জ্ঞানগত ধারণায় বর্ধিত করব এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষাব্যবস্থায় থাকতে হয়, দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যসস্থায় এ ক্ষেত্রে বেশকিছু মৌলিক দুর্বলতা ও ঘাটতি রয়েছে। একটি জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষাব্যবস্থা যদি গড়ে উঠত, বই-পুস্তক, শিক্ষাক্রম পরিচালিত হত তাহলে এমন চিত্র হয়তো আজ আমাদের দেখতে হত না। কিন্তু সেই শিক্ষানীতিও নেই, সেই শিক্ষাব্যবস্থাও নেই। ফলে গোটা দেশ ও জাতি প্রকৃত শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে, মেধা, মনন ও সৃজনশীলতায় বেড়ে উঠতে পারছে না। সে কারণে ১৫ কোটি মানুষের এদেশ থেকে প্রত্যাশিত মান ও মেধার মানব সম্পদ তৈরি হতে পারছে না। অথচ এই দেশের প্রতিটি শিশু, কিশোর, তরুণ, তরুণী, যুবকই মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ পেলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিকসহ সবক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদান রাখার পাশাপাশি বিশ্বপরিসরেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হত। সে জন্য প্রয়োজন গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় কতগুলো মৌলিক পরিবর্তন সাধন, নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা, বিনিয়োগ করা একবিংশ শতাব্দির জন্যে অপরিহার্য মানে প্রতিষ্ঠা করা।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার একজন প্রোডাক্ট হিসেবে এর সবলতা ও দুর্বলতাগুলো সব সময় ভেতর থেকে দেখছি। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ১০ বছর মস্কোতে উচ্চতর লেখাপড়া করে অনেককিছু দেখা ও শেখার সুযোগ পেয়েছি। এরপর থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক হিসেবে জীবন প্রায় শেষ করতে যাচ্ছি। বেশ কয়েকটি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সঙ্গে যুক্ত থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা গত ২৩/২৪ বছর ধরে পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে প্রকাশ করে আসছি। বিভিন্ন জার্নাল বা সংকলনে শিক্ষাবিষয়ক আমার বেশকিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রপত্রিকাতে তো নিয়মিত লিখছিই। ইতিপুর্বে কয়েকটি প্রকাশনা সংস্থা আমার শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ নিয়ে কয়েকটি সংকলন প্রকাশ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো নিয়ে অনিন্দ্য প্রকাশের স্বত্বাধিকারী আফজাল হোসেন এ বছর দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। দ্রুত কম্পোজ ও প্রুফ দেখা সম্পাদন করে পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দেওয়ার জন্যে প্রকাশককে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটি দেশের বর্তমান সময়ে শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক, পাঠক, আলোচক সমালোকদের দৃষ্টিতে পড়লে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ — মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

২১ মাঘ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

২০২১ সালের পথে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ১১
বাংলাদেশে স্কুল ও মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠন ২৩
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ৩৬
শিক্ষার প্রভাব : গ্রামীণ জীবন ৫১
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন উপাচার্য এবং প্রত্যাশা ৬৭
নতুন শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে পুরাতন কিছু কথা ৭১
সব কলেজ সেরা কবে হবে? ৭৬
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিযুদ্ধ যখন মহাযুদ্ধ ৮০
রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় : শুরুটা যেন মানসম্পন্ন হয় ৮৫
ফলাফল সুপার-ডুপার, শিক্ষার মানও কি তাই? ৯০
আগে মানসম্মত পাঠ দিন, পরে যেভাবে খুশি পরীক্ষা নিন ৯৪
লেখাপড়া থেকে দূরে আছে ছাত্রসংগঠনগুলো ৯৯
সত্যি কি প্রাথমিক শিক্ষা ব্র্যাকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে? ১০৪
ভুলে ভরা পাঠ্যবই ১১০
পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি ১১৪
বৈধ-অবৈধ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১২৩
উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে উচ্চশিক্ষা নেই ১২৮
শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার আনতে হবে ১৩৩
দেশের শিক্ষাব্যবস্থা চলছে দলবাজি ও দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়ায় ১৩৯
পাঠপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ : যার যা প্রাপ্য ১৪৪
পাঠ্যপুস্তকেই নয়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকতে হবে সর্বত্র ১৫০
গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১৫৫
শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে বিতর্ক ১৬০
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং ইউজিসি ১৬৫
নতুন-পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গন্তব্য কোথায়? ১৭০
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ এবং বাউবি ১৭৬
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষার সংকট নিরসন হওয়া জরুরি ১৮১
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে কী করা উচিত? ১৮৬
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস এবং শিকক্ষার পরিবেশ ১৮৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

২০২১ সালের পথে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

২০২১ সাল অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর একুশ সালের বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা একটি বেশ কৌতূহল-উদ্রেক এবং উদ্দীপনামূলক চিন্তার বিষয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। ঐ বছর বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে। যে সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা ২০২১ সালের পরের বাংলাদেশের সামগ্রিক শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে চাই তা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়—যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে প্রতি দুই-আড়াই বছরে বিশ্বপরিসরে যে পরিমাণ উন্নতি ও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা হয়তো অতীতে এক সহস্রাব্দ, কিংবা এক শতাব্দীতেও ঘটা সম্ভব ছিল না। পরিবর্তনের এমনি এক বিস্ময়কর যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের বসবাস। তাই ২০২১ সালের বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হতে পারে তা নিয়ে আগাম ধারণা পোষণ করা বেশ কঠিন, তবে অল্প কবছর পরের বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাটি কেমন হওয়া উচিত সে-সম্পর্কে ভাবনাচিন্তা করা অবশ্যই সম্ভব। এ ধরনের সুদূরপ্রসারী বিষয় নিয়ে বাংলাদেশে আলোচনা-পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে জরুরি। কেননা বাংলাদেশে শিক্ষার ধারণা এবং বাস্তবতা যেভাবে ধ্বংস হতে বসেছে তার ফলে একবিংশ শতাব্দীতে যে মানের মানবসম্পদ তৈরি করা প্রয়োজন তা বাংলাদেশের জন্য মোটামুটি অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সেই বিবেচনা থেকে একবিংশ শতাব্দীর একুশ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে প্রস্তুতিমূলক একটি শিক্ষানীতি গ্রহণের জন্য এখন থেকেই কাজ করা, অগ্রসর হওয়ার কোনো বিকল্প কিছু থাকতে পারে না বাংলাদেশের। তা করতে ব্যর্থ হলে স্বাধীনতার অর্ধশতকে পৌঁছেও আমরা শিক্ষাসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে গর্ব করার মতো তেমনকিছু হাতের কাছে খুঁজে পাব না।

১। শিক্ষানীতিবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষা প্রতিটি রাষ্ট্রেই এখন সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া বিষয়। সুতরাং, শিক্ষানীতি ছাড়া আজকের দুনিয়ায় কোনো দেশের শিক্ষাব্যবস্থাই চলতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে এদেশের বিশাল শিক্ষাব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে এবং

www.pathagar.com

দিব্যি চলছে কোনোপ্রকার শিক্ষানীতি বা পরিকল্পনা ছাড়াই। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে এ পর্যন্ত সরকার মোট ৫টি (১৯৭২, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৯৭, ও ২০০৩) শিক্ষা কমিশন গঠন করেছে। সব কয়টি শিক্ষা কমিশনই সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করেছে। ১৯৯৭ সালে গঠিত শিক্ষা কমিশনেরও একটি আমলাতান্ত্রিক সংশোধিত রিপোর্ট ২০০০ সালে জাতীয় সংসদে পাস হলেও জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথমে 'শিক্ষা সংস্কার কমিশন ২০০২' গঠন এবং সর্বশেষ ২০০৩ সালে একটি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে। এতসব শিক্ষানীতি কার্যকর হওয়ার সুযোগ লাভ করেনি। এ সম্পর্কে আমাদের অভিমত হচ্ছে দেশের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা সম্পর্কেই সুস্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে। তারা অতিমাত্রায় আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। ফলে যতদিন পর্যন্ত নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে কোনো প্র্যাগমেটিক শিক্ষানীতিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে তেমনটি আশা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার এক নরকে প্রবেশ করেছে। এর থেকে সাধারণভাবে ভালোকিছু লাভের আশা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

২। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা

উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের প্রাপ্ত ব্যবস্থা বাংলাদেশ লাভ করেছে এবং সেটির মর্মার্থ কোনোরূপ পরিবর্তন না করে বজায় রেখে চলেছে। জাতীয় কোনো শিক্ষানীতি না-থাকায় গত ৩৮ বছরে অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধারা-উপধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠক্রম, বই-পুস্তক যা বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছে। একসময় দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় রাষ্ট্রের একমাত্র ভূমিকার কথা বিশ্বাস করা হত। কিন্তু গত দুই-আড়াই দশকে সেই ধারণা পাল্টে গেছে। এখন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। তবে সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোন্ কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, পরিচালিত হবে— এ-ধরনের সুচিন্তিত আইন বা বিধি না-থাকায় সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো গুরুতর মানের সংকট, দলবাজি, সেশনজট ইত্যাদিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে; বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েও কার্যকর কোনো শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে পারছে না। সামগ্রিকভাবেই শিক্ষার দর্শন, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যবস্থাপনায় বিরাজ করছে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। তাই দেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত কোনো স্তরেই

www.pathagar.com

আশাবাদী হওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থার উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে না। দেশের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর দৃষ্টি দিলেই প্রকৃত অবস্থাটি জানা যেতে পারে।

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

একসময় বাংলাদেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ কারণেই শিশুদের জন্য সরাসরি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। তবে বাড়িতে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষায় তালিম নেয়াই ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের সাধারণ রেওাজ। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এটি প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের পঠনপাঠনে তেমন কার্যকর কোনো অবদান রাখছে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোকে দেশের শহর-উপশহর এমনকি গ্রামাঞ্চলেও ব্যক্তি-উদ্যোগে কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের মাত্র ১০-১২% শিশু এসব প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু প্রায় ৯০% শিশু সামগ্রিকভাবেই প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শিশুদের শিক্ষাজীবনের একেবারে শুরুতেই ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। অধিকন্তু এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো অভিন্ন পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষাক্রমও নেই। ইংরেজি, আরবি, বাংলা-ইংরেজি-আরবি এবং সাধারণ বিভিন্ন ধারা-উপধারার কেজি স্কুলশিক্ষা শিশুদের মানসগঠনে যে বৈষম্য, প্রকারভেদ ও বিভিন্নতা সৃষ্টি করছে তা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বাংলাদেশে কোনোপ্রকার অনুমোদন ছাড়াই এ-ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অবাধে যেভাবে গড়ে উঠছে তা কীভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলায় আনা সম্ভব সেটিই দেখার বিষয়, নিঃসন্দেহে এটি এখন জটিলতর হয়ে উঠেছে।

খ. প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কোনো অভিন্ন ধারণা নেই। এখানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশুরা যেসব স্কুলে ভর্তি হয়ে থাকে তা হচ্ছে সরকারি প্রাথমিক স্কুল (প্রায় ৩৮০০০টি), রেজিস্ট্রেশনকৃত-অরেজিস্ট্রেশনকৃত বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল (প্রায় ২০,০০০টি), এনজিও পরিচালিত ৩ বছর মেয়াদি স্কুল (প্রায় ৭০,০০০ টি), এবতেদায়ী মাদ্রাসা (প্রায় ১৭,০০০টি), কমিউনিটি স্কুল (প্রায় ১০,০০০টি), ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, কেজি স্কুল (প্রায় ১৫,০০০টি), স্যাটেলাইট স্কুল উল্লেখযোগ্য। এগুলোর শিক্ষার মানে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। বিশেষত গ্রামের সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা প্রায় ভেঙে পড়েছে। অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক স্কুলে অধিকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, কিন্তু প্রতি স্কুলে ৪ থেকে ৫ জনের অধিক শিক্ষকের ব্যবস্থা না-থাকায় লেখাপড়ার স্বাভাবিক পরিবেশই সেগুলোতে নেই। বেশিরভাগ শিক্ষকের দক্ষতা

www.pathagar.com

ও শিক্ষাগত যোগ্যতাতে যথেষ্ট অভাব আছে। বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের অন্ত নেই।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, গ্রামাঞ্চলে ৬৫ শতাংশ শিশু কোনোপ্রকারে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমাপ্ত করতে সক্ষম হলেও প্রয়োজনীয় গুণগত মানের শিক্ষা লাভ করে মাত্র ২-৩ শতাংশ শিশু। অপরদিকে শহরাঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার অভিন্ন কোনো চিত্র পরিসংখ্যান দ্বারা দাঁড় করানো সম্ভব হচ্ছে না। কেননা, শহরগুলোর মধ্যেই রয়েছে ব্যাপক তারতম্য। তারপরও নিম্নমধ্যবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্তের ঘরের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় 'ঝরে পড়ার' হার খুব বেশি না হলেও মানসম্মত শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে বড়ধরনের ব্যবধান। গ্রামাঞ্চলের ৯০ শতাংশের বেশি সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান গড়পড়তারও নিচে। শহরাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই শিশুদের সহশিক্ষাক্রম, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, জাতীয় চেতনাবোধে উজ্জীবিত করার সুযোগসুবিধা থাকে না বললেই চলে। ফলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম বা শহরের কোনো অবস্থানেই ঈপ্সিত মান ও ধারণায় বেড়ে উঠছে না। ঢাকাসহ বড় বড় কিছুসংখ্যক শহরের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু বাবা-মা, স্কুল এবং টিউটর—এই তিন সহায়ক শক্তির বিশেষ প্রচেষ্টায় লেখাপড়ার একটি মান অর্জন করলেও শিক্ষাবিজ্ঞান (Pedagogical Science) এ প্রক্রিয়াটি সমর্থন করে না। এখানে শিক্ষণ-পদ্ধতিতে বড়ধরনের গলদ রয়ে গেছে। সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক শিক্ষার চিত্রটি আমাদের জন্য মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। এর প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাজীবনে।

গ. মাধ্যমিক শিক্ষা

দেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় (ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী) যে-ধরনের প্রতিষ্ঠান জড়িত তা হচ্ছে সরকারি স্কুল (৩১৭টি), এমপিওভুক্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (আনু. ২০,০০০টি), মাদ্রাসা (৫৮০০টি), কেজি বেসরকারি স্কুল (আনু. ১০,০০০ টি), ইংরেজি মাধ্যম স্কুল (১০০০-র অধিক), কারিগরি বৃত্তিমূলক স্কুল (১৫৩)টি ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলে আনুমানিক দুই কোটি শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও তাদের ৩৫% এমনিতেই ঝরে পড়ে। বাকি যারা পঞ্চমশ্রেণী উত্তীর্ণ হয় তাদের বিরাট অংশ মাধ্যমিক স্কুল বা মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারে না বা পড়াশোনা চালিয়ে যায় না। দেশের উল্লিখিত মাধ্যমিক স্কুল ও মাদরাসায় লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০ লাখের ঘরে অবস্থান করছে। গত দু/তিন বছরকে বাদ দিয়ে আগের দশ বছরের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অকৃতকার্যের হার ৫৮ শতাংশ। এটিকে 'সিস্টেম লস'ই বলা চলে। তা হলে সহজেই অনুমেয় যে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার মান কোথায়

www.pathagar.com

অবস্থান করছে। যে ৪২ শতাংশ ছাত্রছাত্রীকে কৃতকার্য বলে ধরা হয়ে থাকে তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি বাংলা এবং ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীর ইংরেজি ভাষাজ্ঞান কাঙ্ক্ষিত মানের নয়। বিজ্ঞানশিক্ষায় দক্ষতা আছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র ৭-১০ শতাংশ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ে দক্ষতা আছে মাত্র ৫-৭ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর। সুতরাং, বাকি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যবহারিক গুরুত্ব এবং অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ কীভাবে এ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে তা সহজেই অনুমেয়। মানবিক ও সামাজিক গ্রুপের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ থাকে লক্ষ্যবিহীন এবং অনেকটাই অনিশ্চিত। এতে সমাজ, ইতিহাস, মানুষ, জীবন ও জগতের ধ্যানধারণাও যথাযথ মানে থাকে না। ফলে মানবিক ও সামাজিক বিভাগের বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা নিতান্তই সার্টিফিকেট প্রাপ্তিমুখী হয়ে আছে।

ঘ. কলেজ-মাদ্রাসা ও দেশের উচ্চশিক্ষা

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) এবং দাখিল পাসকৃত ছাত্রছাত্রীদের (বছরে গড়ে ৪ থেকে ৬ লক্ষ) একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উচ্চমাধ্যমিক কলেজ ও কামিল মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে থাকে। প্রতিবছর ভর্তির এই সংখ্যাটি দাঁড়ায় আনুমানিক ৪ লক্ষ। এ পর্যায়ে সরকারি কলেজ (২৩৩টি), বেসরকারি কলেজ (আনু. ২০০০টি), ক্যাডেট (১০টি), আলিম মাদ্রাসা (১০০০টি-এর অধিক) রয়েছে। ব্রিটিশ আমলে প্রবর্তিত ২ বছর মেয়াদি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার খোলসটি এখনো অব্যাহত থাকলেও এ-পর্বের লেখাপড়াতে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক প্রভাব, শিক্ষাক্রমের ত্রুটি, নকল ও ত্রুটিযুক্ত পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এইচএসসিতে কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৪-১৫ শতাংশ বিজ্ঞান বিভাগ, ১৮–২০ শতাংশ বাণিজ্য বিভাগ এবং বাকি ৬০-৬৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীই মানবিক বিভাগের। যে ৩০-৩৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে পাস করে তাদের এক-চতুর্থাংশ বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ থেকে ঝরে পড়ে। অবশ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা সৃষ্টি না করে যেভাবে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে তাতে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান অধঃমুখীই হচ্ছে বেশি। কলেজগুলো এইচএসসি, স্নাতক, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স নিয়ে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থায় আছে। মাদ্রাসাগুলোর এ পর্যায়ের শিক্ষাও মানসম্মত নয়। সুতরাং কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্রছাত্রীই সিস্টেম লস হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

ঙ. পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজসমূহকে বাদ দিলে বাংলাদেশে ২৮টি পাবলিক এবং ৫৪-এর অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য

www.pathagar.com

ছাত্রছাত্রীরা প্রতিবছর ভর্তি হচ্ছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ, চিকিৎসা কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ সবধরনের পাবলিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছর গড়ে ২৫-৩০ হাজারের মতো ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনুরূপ ৬০-৭০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০০টি কলেজে অনুরূপ প্রায় লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী প্রতিবছর বিভিন্ন অনার্স কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে সকল ধারায় উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রতিবছর পৌন দুই লক্ষ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়াসহ পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতেও প্রতিবছর কমপক্ষে ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে।

বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হলেও শিক্ষক এবং ব্যবহারিক শিক্ষা-উপকরণের অভাবে কাঙ্ক্ষিত মানের Product বের হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠক্রম সেকেলে, শিক্ষকদের পাঠদান মানসম্মত নয়। অধিকন্তু উচ্চশিক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষা ও গবেষণাখাতে ব্যয় করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মোট বরাদ্দের মাত্র ১৩ শতাংশ। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই এখনো বিশ্ববিদ্যালয় Concept-কে ধারণ করার পর্যায়ে যায়নি, তারপরও এগুলোর প্রতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ঝোঁক দিনদিন বাড়ার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা, শিক্ষক, অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা ও ক্যাম্পাস নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে সেটি এখন দেখার বিষয়।

বস্তুত, দেশের প্রাক-প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত যেখানেই যে-স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে, এগুলোর বড় অংশই অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার অভাবে; দক্ষ শিক্ষক, ব্যবস্থাপক এবং পাঠক্রমের মৌলিক দুর্বলতার কারণে সত্যিকারের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াতে পারছে না। আসলে দেশের গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক বেশকিছু দুর্বলতা বিরাজ করায় কোনো স্তরেই ছাত্রছাত্রীগণ মানসম্মত শিক্ষালাভ করতে পারছে না।

কেন হচ্ছে না?

এর অনেক কারণ আছে। প্রথমত : সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। দেশে কত সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে, সরকার কত সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বভার গ্রহণ করবে, কত সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনুদান দেবে, কিসের ভিত্তিতে তা প্রদান করবে, বেসরকারি শিক্ষা কোন্ মানের অনুমোদন দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে, কতটি তা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে ইত্যাদি কোনো নীতিমালাই যথাযথভাবে কার্যকর হচ্ছে

www.pathagar.com

না। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, পাঠদান, শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদিতে বিরাজ করছে চরম অব্যবস্থাপনা, নৈরাজ্য, লুটপাট, দুর্নীতি ও শিক্ষাবিবর্জিত কর্মকাণ্ড। এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য এখন আর সরকারের আছে বলে মনে হয় না। নানা স্বার্থবাদী গোষ্ঠী দেশের সকল স্তরের শিক্ষায় গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত : প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের জন্য নীতিমালার অভাব। বাংলাদেশে এখন বছরে শিক্ষাখাতের বরাদ্দ ১০ হাজার কোটি টাকার অধিক। এটি মোট বাৎসরিক বাজেটের ১২-১৩ শতাংশ হলেও মোট জাতীয় উৎপাদনের ২ শতাংশ মাত্র। এই অর্থের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রাথমিক ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি বাবদ ব্যয় করা হয়। সরকারি স্কুল বরাদ্দের মোট ৯৪.৬ শতাংশ, বেসরকারি স্কুল বরাদ্দের ৮৭.৬ শতাংশ এবং মাদ্রাসা বরাদ্দের ৯৩.০ শতাংশ অর্থ শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ খরচ করা হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মোট বরাদ্দের মাত্র ১৩ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, ল্যাব ও গবেষণা খাতে ব্যয়িত হয়। বাকি সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় করতে হচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ। মনে হচ্ছে শিক্ষাবাজেটের সিংহভাগই শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ খেয়ে ফেলছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা কোনো বেতনস্কেল নেই। আসলে শিক্ষাখাতে বরাদ্দটি ধরা হয় মূলতই বেতন-ভাতাকে বিবেচনা করেই। নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি, মানসম্মত বইপুস্তক রচনা ও মুদ্রণ, পাঠসামগ্রী বৃদ্ধি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শিক্ষাবাজেটে বিবেচনা করা হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

শিক্ষাখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের একটি বড় অংশ দুর্নীতি ও অপচয়ে ব্যয়িত হয়। অপরদিকে শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনে ছেলেমেয়ের শিক্ষাব্যয় ক্রমেই তাদের ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। এমনকি গ্রামাঞ্চলেও এখন শিক্ষার আনুষঙ্গিক ব্যয় বেড়ে গেছে। কিন্তু অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব প্রকটতর হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার কোনো মানই নেই। শহরাঞ্চলেও মহল্লা বা এলাকাভিত্তিক মানসম্মত স্কুল, কলেজ বা অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নেই। ফলে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি এবং অর্থদণ্ডের শিকার হতে হয়, মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পেছনে ছুটতে হয়।

আসলে বাংলাদেশে মানসম্মত শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়লেও অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই তা প্রদানে সক্ষম নয়। দক্ষ, মেধাবী ও পারদর্শী শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার অভাব সমাজের মেধাবীদের শিক্ষকতার পেশায় আসতে নিরুৎসাহিত করছে। এর ওপর বর্তমানে যুক্ত হয়েছে দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় এবং ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের একটি অলঙ্ঘনীয় ব্যবস্থা। বাংলাদেশে এখন শিক্ষার মান পড়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণই হচ্ছে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের বেশিরভাগ নিয়োগেই প্রকৃত মেধাবী, দক্ষ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা বঞ্চিত হচ্ছেন; শিক্ষকদের বেশিরভাগই শ্রেণীকক্ষে মানসম্মত পাঠদানে যোগ্যতা রাখছেন না; Teaching Method-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাংলাদেশে শিক্ষকতা পেশায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং মানসম্মত নয়, এমনকি চলনসই শিক্ষাই দেশে দেওয়া বা পাওয়া যাচ্ছে না।

৩। ২০২১ সালের পথে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

অ াদের জনসংখ্যা ১৫ কোটি বলা হচ্ছে। অথচ এখন দেশে সবধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষের কিছু বেশি। মোটামুটি সকল ছেলেমেয়ের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে বাংলাদেশে এ মুহূর্তে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ৬ লক্ষের অধিক। এর জন্য বাজেটবরাদ্দ বর্তমানের কমপক্ষে চারগুণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিক্ষকপ্রশিক্ষণ, শিক্ষার উপকরণ, অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির বিষয়গুলো নিশ্চিত করা না গেলে বাংলাদেশ সত্যিসত্যিই শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অগ্রসর হতে পারবে না। আগামী ২০২১ সাল নাগাদ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৯ থেকে ২০ কোটি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই জনগণকে শিক্ষিত করতে হলে বাংলাদেশে সবধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাড়াতে হবে। ২০২১ সালে আমাদের জনসংখ্যা যদি ২০ কোটিতে উন্নীত হয়, তাহলে এর মধ্যে ৬ কোটিই হবে শিশু-কিশোর। ৬ কোটি শিক্ষার্থীর জন্য দেশে প্রায় ৮ লক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে। একই সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ লক্ষের মতো মানুষকে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত করতে হবে। সে-ধরনের চিন্তাভাবনা, পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির কোনোটিই দেশের নীতিনির্ধারকদের মাথায় আছে কি?

প্রশ্ন উঠতে পারে : এত অর্থে যোগান বাংলাদেশ কোত্থেকে দেবে? হ্যাঁ, সম্পদ ও অর্থের সীমাবদ্ধতা বাংলাদেশের যথেষ্ট রয়েছে—একথা নতুন করে বলার কিছু নেই। তবে দক্ষ ও সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠীই মেধা, উদ্যোগ এবং সৃজনশীলতা দ্বারা দেশের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে—একথা বিশ্বাস করতে হবে, বুঝতে হবে। বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে যদি যথাযথভাবে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তাহলে বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে মানবসম্পদ সৃষ্টি, বস্তুগত সম্পদ সৃষ্টি ও দেশের দারিদ্র্যবিমোচন খুব বেশি দুরূহ কাজ নয়। বাংলাদেশ শিক্ষাখাতে এখনো পর্যন্ত যে-অর্থ খরচ করে তার সিংহভাগই যথাযথভাবে ব্যয়িত হয় না। ফলে সমস্যার আবর্ত থেকে বের হওয়া যাচ্ছে না, বরং সমস্যা সংকটে রূপান্তরিত হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন থেকে জিডিপির মোট ৬ থেকে ৭ শতাংশ পরিকল্পিতভাবে

www.pathagar.com

শিক্ষাখাতে ব্যয় করার প্রক্রিয়া শুরু করলে ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যেই এর সুফল হাতেনাতে পেতে পারে।

বিশ্বায়নের এই যুগে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তি পৃথিবীর সর্বত্র কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনের উদ্যোগের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পারবে। আগামী এক দশকের মধ্যে পৃথিবী এমনই একটি কর্মচঞ্চল ব্যবস্থায় আরো বেশি জড়িয়ে পড়তে পারে যদি যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটে। তখন মানসম্পন্ন শিক্ষাই কেবল মানুষকে এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার নিশ্চয়তা দেবে। এই মানসম্মত শিক্ষায় ব্যাপকভাবে অর্থাৎ শিক্ষার সর্বনিম্নস্তর থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত প্রবেশ করতে যাচ্ছে— Internet, Web Course, Electronics and Tele-Communication Engineering, Computerised Management Information System, Computer Science and Technology, International Super high Way, Cyber System Business, Management Quality Assurance, Language Proficiency, Professional Skillness, Health, Agriculture, Biotechnology, Genetic Engineering, Bio-Chemistry Biosafety, Environment, Education ইত্যাদি। জ্ঞানগত শাখাপ্রশাখা এ-ধরনের ব্যাপক শিক্ষাক্রম জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। এর জন্য দুটো উপায় আছে। একটি হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, যা দ্রুত প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও অর্থায়ন করা বাংলাদেশের পক্ষে এটি কঠিন কাজ। তবুও পরিকল্পিতভাবে কাজটি করা গেলে বাংলাদেশের পক্ষেও ব্যাপক জনগণকে শিক্ষিত করা সম্ভব। অপরটি হচ্ছে দূরশিক্ষণের কলাকৌশলকে রপ্ত করে বাংলাদেশ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে এসব বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলতে পারে। বেতার-টিভি, টিউটরিয়াল সার্ভিস প্রদান, অডিও-ভিত্তিও -এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সরকার এ লক্ষ্যে অনেকটাই পৌছাতে পারে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেও একটি জাতীয় দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু করার কথা বিবেচনা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে একবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি বছর নতুন নতুন তথ্য, প্রযুক্তি, চিন্তাভাবনা ও অর্জন নিয়ে মানুষের কাছে হাজির হচ্ছে। এ সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল শাখার শিক্ষার পাশাপাশি সমাজ, রাষ্ট্র-রাজনীতি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা-সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদিও বেশ জটিল হয়ে উঠছে। জ্ঞানজগতের এসব ক্ষেত্রেও ধারণার জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা যদি যুগের চিন্তাধারার চর্চাকে অবহেলা করি; বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যকে নিরঙ্কুশ মনে করি; তাহলে মানুষের মেধা, মনন, সৃজনশীলতা, সমাজ-রাষ্ট্র-সচেতনতা, মানুষের জীবন-জীবিকা ও টিকে থাকার সংকট তৈরি

www.pathagar.com

হবে। সুতরাং এ-সময়ের শিক্ষাব্যবস্থায় আধুনিক চিন্তার চর্চায় গবেষণাকর্মকে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীরা একবিংশ শতাব্দীর একুশ সালের মানে আধুনিক দক্ষ, মেধাবী ও চিন্তাশীল মানুষরূপে গড়ে উঠবে, অবদান রাখবে।

৪। করণীয়সমূহ

এসব লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে যে-কাজগুলো শুরু করতে হবে তা হল :

ক. অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য একটা আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার স্তরকাঠামো নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবশ্যই সুসামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদি রোধ করতে হবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও শিক্ষার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাদান কর্মসূচি পালনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সর্বস্তরে অভিন্ন শিক্ষাক্রম কার্যকর করার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

খ. ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী দেশের গ্রাম ও শহরাঞ্চলের সকল শিশুকে অভিন্ন পাঠক্রমের একটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। ছাত্রবেতন ও অন্যান্য খরচ বহন করতে অসমর্থ পরিবারের শিশুদের জন্য সরকারি উদ্যোগে কেজি স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যাদের সামর্থ্য আছে তারা বেসরকারি কেজি স্কুলে পড়তে পারে। তবে সরকারি ও বেসরকারি কেজি স্কুলসমূহের পাঠক্রম হতে হবে অভিন্ন শিশুতোষবিষয়ক। উভয় প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষকতার দক্ষতা ও মান বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে।

গ. প্রাথমিক স্তরের বর্তমান বহু ধারা ও উপধারার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনোভাবেই দেশের দুই কোটি শিশুকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য উপযোগী করে তুলতে সহায়ক হবে না। তাই এক্ষেত্রে পাঠক্রমের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে বর্তমান শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১ : ৭৫-এর পরিবর্তে অবশ্যই ১ : ১৫ প্রথা চালু করতে হবে। দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং শিশু-মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে চাকুরিবিধির বর্তমান নীতিমালার সংশোধন ও পরিমার্জন এবং যোগ্য, মেধাবী, দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষকদের উচ্চতর বেতনস্কেল প্রদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন; ছাত্রছাত্রীদের ধারণক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাতৃভাষা, ইংরেজি ও গণিত শেখা; জাতীয় ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞানের কিছু প্রাথমিক

www.pathagar.com

ধারণার সঙ্গে পরিচিত করার মাধ্যমে শিশুদেরকে জ্ঞানজগতের এসব বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী করে তোলার বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হবে। এর জন্য আধুনিক ধ্যানধারণা ও শিক্ষায় শিক্ষিত মেধাবী শিক্ষকদের নিয়োগদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।

ঘ. মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের ভাষাজ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার সুযোগ মাধ্যমিক স্তরেই যথাযথ মানে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. পাবলিক পরীক্ষার ধারণা দ্রুতই ত্যাগ করতে হবে। কেননা এটি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান নির্ধারণের জন্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না। শ্রেণী-পরীক্ষার বিষয়টিকে নিয়মিত করতে হবে। এতে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তারা নিয়মিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থায় এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল অধিদপ্তরকে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হবে। ঘুষ-দুর্নীতির বর্তমান সকল অপব্যবস্থাই বন্ধ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় বা রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়; কেবলমাত্র মেধা, মনন ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই নিয়োগ দানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

ছ. অপরিকল্পিত উপায়ে গড়ে ওঠা দেশের কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যাগত বৃদ্ধির আর বোধহয় প্রয়োজন নেই। ডিগ্রির তুল্যতা নির্ধারণ করা হলেও উভয় ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম, বই-পুস্তকের মানের মধ্যে যে বিস্তর তারতম্য রয়েছে তা দূরীভূত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। জাতীয় উন্নয়ন, একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির আলোকে উভয় ক্ষেত্রেই মানবসম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার ডিগ্রিসমূহকে মানসম্পন্ন করতে হবে। বাংলাদেশে সাধারণত স্নাতক ও মাদ্রাসা থেকে প্রাপ্ত ডিগ্রিধারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বিরাট বেকার-বাহিনী তৈরিতে অবদান রাখছে। সুতরাং কর্মমুখী, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষাব্যবস্থায় বড়ধরনের একটি গুণগত পরিবর্তন আনয়ন একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

জ. দেশে পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার গুণগত মান, বিষয় নির্বাচন—জাতীয় উন্নতি অগ্রগতির নিরিখে তৈরি করা হচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান মোটেও সন্তোষজনক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একদিকে মেধাবী, দক্ষ, উচ্চতর গবেষণায় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব প্রকটতর হচ্ছে; অন্যদিকে

www.pathagar.com

শিক্ষকদের লেখাপড়া ও গবেষণার সুযোগসুবিধাও দিনদিন হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে অধীত বিষয়ের শিক্ষাক্রম, নতুন বিভাগ খোলা, ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞানের উচ্চতর যাত্রায় সম্পৃক্ত করা এখন সুদূরপরাহত হয়ে উঠছে। এ সবই দুশ্চিন্তার বিষয়। পরিমাণগত চাহিদাকে সুযোগ দেওয়ার পাশাপাশি এখন শিক্ষাব্যবস্থার সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত গুণগত মানের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়ার কোনো বিকল্প থাকতে পারে না।

এসব বিষয়ে এখনই পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে ২০২১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনকালে আমাদেরকে আক্ষেপ করতে হবে না, লজ্জাও হয়তো পেতে হবে না, বরং কিছুটা আত্মতৃপ্তি নিয়েই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির কথা ভাবতে পারব।

তথ্যসূত্র

১। Bangladesh Educational Statistics 2000

২। বার্ষিক প্রতিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০০১

৩। বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪

৪। প্রতিবেদন, জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি ১৯৯৭

৫। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ (২০০০), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার

৬। প্রফেসর ড. মেজবাহ উদ্দিন আহমদ (২০০১) : বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের প্রত্যাশা

৭। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সেমিনার

৮। পাটোয়ারী, মমতাজউদ্দীন (২০০০) : বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি, ঢাকা

৯। Proceedings of the International Seminar on Quality Assurance in Higher Education in Bangladesh (2002) Sponsored by UGC of Bangladesh and COL.

১০। আলম মাহমুদ ও মিয়া মো. কবির, ১৪০৬ : একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু-দশকের শিক্ষা, বিআইডিএস, ৭ম খণ্ড।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে স্কুল ও মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠন

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী বাঙালি এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই আমাদের জনগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এর বিপরীতে শোষণহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করেছিল, স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে আপামর জনসাধারণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ডাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত এই যুদ্ধে স্থাপনও করেছিল। এককথায় জনগণের শৌর্যবীর্যের শ্রেষ্ঠত্বে রচিত হয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বিশ্বরাষ্ট্র ব্যবস্থায় বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র বলে মর্যাদা এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই রাষ্ট্রের পরিচয়েই এখন বাঙালি এবং এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী প্রায় ৩০টি নৃজাতিগোষ্ঠী বিশ্বব্যাপী পরিচিত হচ্ছে। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধই সম্ভব করেছে বিশ্বপরিসরে আমাদের অস্তিত্ব ও বিকাশকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলতে এবং রাখতে। জাতীয় জীবনের এই মহান গৌরবদীপ্ত অধ্যায় তথা মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের শিশু ও তরুণ প্রজন্ম যথাযথ ধারণা লাভ করবে, উজ্জীবিত হবে—এটিই প্রত্যাশিত বিষয়। ইতিহাস শিক্ষার সেই আবেদন যথাযথভাবে থাকতে হবে জাতীয় শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকে। অথচ দীর্ঘদিন থেকেই বলা হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোনো স্তরেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যথাযথ মানে পঠিত হচ্ছে না; ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডিত, বিকৃত কিংবা অসত্য তথ্য সম্বলিত তথাকথিত ইতিহাস পাঠ করছে।[১]

এই অভিযোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের মাত্র সাড়ে তিন বছর পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় পাকিস্তানি ভাবাদর্শপুষ্ট সামরিক সরকারের আরোহণ এবং প্রায় একুশ বছর সামরিক, আধাসামারিক ও বেসামরিকভাবে বাংলাদেশকে শাসন করার ফলে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিকৃতভাবে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনীতি, প্রচারযন্ত্র এবং পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতদিন রাষ্ট্রযন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হেয় করে দেখেছে,

www.pathagar.com

সামরিক শক্তিকে উক্ত স্থানে প্রতিস্থাপন করেছে, ফলে একটি প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ধারণায় লালিত হয়েছে, বেড়ে উঠেছে। নাগরিক সমাজ থেকে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস পঠনপাঠন নিয়ে যে সমালোচনা ঐ সময়ে উত্থাপিত হয়েছিল তার প্রতি ন্যূনতম কর্ণপাতও করেনি ঐসব শক্তি।

১৯৯৬ সালের ১২ জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সরকার গঠনের পর পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস সংশোধনের একটি উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল।[২] কিন্তু সেই কমিটির কার্যপরিধি ছিল শুধুমাত্র স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস সংশোধন করা। কমিটি সেই দায়িত্ব স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার পর আশা করা হয়েছিল দেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসাসহ সকল স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের যথাযথ ইতিহাস লেখার উদ্যোগ সরকার থেকে নেওয়া হবে। বাস্তব সত্য হচ্ছে, এ পর্যন্ত সে-ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত সরকার থেকে নেওয়া হয়নি। ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস উপস্থাপনের কাজটি অসমাপ্ত থেকে গেছে। ভবিষ্যতে তা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা বলা মুশকিল। তবে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় স্কুল, মাদরাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কীভাবে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে এ নিয়ে শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ মহলে যথেষ্ট আলোচনা-পর্যালোচনার এখনও প্রয়োজন রয়েছে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি, সাহিত্য ও ইতিহাসের পঠনপাঠন কোন্ পর্যায়ে এখন অবস্থান করছে তা পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের স্কুল ও মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পঠনপাঠন সম্পর্কে পরিচিত হব এবং করণীয় কিছু বিষয় সম্পর্কে আমাদের মতামত উপস্থাপন করব।

মাধ্যমিক স্কুলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠন

বাংলাদেশের স্কুলপর্যায়ে ইতিহাস আবশ্যিক বিষয় নয়।[৩] প্রাথমিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী থেকে সমন্বিত বিষয়রূপে 'পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)'-এর ধারাবাহিকতা হিসেবে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত 'সামাজিক বিজ্ঞান'কে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এ বিষয়টিকে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও জনসংখ্যার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণীতে মানবিক শাখার নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস' এবং বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য 'সামাজিক বিজ্ঞান'কে আবশ্যিক

www.pathagar.com

করা হয়েছে। উপর্যুক্ত পাঠ্যক্রম কাঠামোতেই বাংলাদেশের স্কুল ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতির মতো বিষয়সমূহের ধারণা লাভের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর মধ্য থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ কতখানি আছে তা কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক স্কুল স্তরের শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অংশের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর 'সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়ের বিষয়বস্তুর সূচিপত্রে ইতিহাসের যে কয়েকটি অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে তাতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বা মুক্তিযুদ্ধের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অষ্টম শ্রেণীর 'সামাজিক বিজ্ঞান' পাঠ্যপুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়'। পুস্তকের ৬২ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে।[৪] অবশ্য ১৯৯৬ সালে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন কমিটি এই অধ্যায়টিকে ব্যাপকভাবে পুনর্লিখনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্য ও ব্যাখ্যা-নির্ভর ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপন করেছে। এই অধ্যায়ে বর্ণিত পাকিস্তান আমলে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঞ্চম শ্রেণীতে পঠিত 'পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)' পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সংস্করণ বলা চলে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৯৬ শিক্ষাবছর থেকে নবম-দশম শ্রেণীর মানবিক শাখার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে 'বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস' নির্ধারণ করেছে। তখন বইটির সপ্তম অধ্যায় ' পাকিস্তান আমল'[৫] (১৯৪৭-১৯৭১)-এর ব্যাপক কাঠামোগত পরিবর্তন ও তথ্যগত সংশোধন করতে হয়েছিল। বর্তমানে এই অধ্যায়টির কাঠামো দাঁড়িয়েছে এরূপ : ভাষা আন্দোলন, আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের চেষ্টা, ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, আওয়ামী মুসলীম লীগ গঠন, চুয়ান্ন সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচি, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য, শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, সামরিক শাসন জারি, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ, বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য, সামরিক বৈষম্য. অর্থনৈতিক বৈষম্য, ৬ দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ছাত্রদের ১১ দফা, ইয়াহিয়া খানের শাসন, আইন কাঠামো আদেশ, স্মরণকালের বৃহত্তম প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও ভুট্টোর ভূমিকা, অসহযোগ আন্দোলন, ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ, ভাষণের পরবর্তী সময়ের সরকারি পদক্ষেপ ও তার প্রতিক্রিয়া, স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের শুরু, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা, বিভিন্ন দল ও পেশাজীবীদের

www.pathagar.com

ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের সাহায্য, মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর যৌথ আক্রমণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, মহান মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।[৬]

ধারণা করা হচ্ছে যে, এখন নবম-দশম শ্রেণীর মানবিক শাখার শিক্ষার্থীগণ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের একটি নির্ভরযোগ্য ধারণালাভের সুযোগ পেয়েছে। একইভাবে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের 'সামাজিক বিজ্ঞান' বইয়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়'[৭]-এ বেশকিছু তথ্যগত সংশোধনী এবং কাঠামোগত বিন্যাস সাধন করা হয়েছে। বর্তমানে এই পরিচ্ছেদটির কাঠামো দাঁড়িয়েছে এরূপ : রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক অবস্থা, ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়, ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়, ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য, যুক্তফ্রন্ট গঠন (১৯৫৪), ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের তাৎপর্য, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের শাসন, জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল, পাকিস্তানি আমলে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য, প্রশাসনিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, ছয় দফা আন্দোলন, ছয় দফার তাৎপর্য, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, এগারো দফা, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, জেনারেল ইয়াহিয়া খান, সত্তরের সাধারণ নির্বাচন, আওয়ামী লীগের বিজয়ের কারণ, নির্বাচনের তাৎপর্য, অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন, বিএলএফ (মুজিব বাহিনী), বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, অন্যান্য বাহিনী, শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অবদান, প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অবদান, বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ড গঠন, চূড়ান্ত বিজয় ও স্বাধীনতা অর্জন। এই পরিচ্ছেদটিতে পাকিস্তানকালের যে রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে তা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা সৃষ্টিতে মোটামুটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে বলে মনে হচ্ছে।

মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের পাঠক্রমেও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং ঘটনাবলি বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা সৃষ্টিতে এসব গদ্য ও কবিতা নানাভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।[৮] ষষ্ঠ শ্রেণীর 'চারুপাঠ' পুস্তকে সাহিদা বেগম রচিত 'রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক রচনায় ২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণে ঢাকা শহরের ভয়াবহ অবস্থার মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন। শামসুর রাহমানের 'প্রিয় স্বাধীনতা'[৯] কবিতাটি একাত্তরের কথা মনে করিয়ে দেবে শিক্ষার্থীদের।

৭ম শ্রেণীর 'সপ্তবর্ণা'তে আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখা 'সময়ের হৃদপিণ্ড'[১০] গল্পটি একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতের এক ভয়াবহ কল্পচিত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এ-যুগের ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

www.pathagar.com

অষ্টম শ্রেণীর 'সাহিত্য কণিকা'[১১] পুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসবিষয়ক দুটি রচনা সংযোজিত হয়েছে। ড. হারুন-অর রশিদ রচিত 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' জীবনীমূলক রচনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক নেতৃত্বদানের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর জীবনের সঙ্গে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঘনিষ্ঠতা কতখানি গভীরভাবে যুক্ত ছিল সেই ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এই প্রবন্ধে। অপর রচনাটি শহীদ জননী জাহানারা ইমামের বিখ্যাত স্মৃতিকথা 'একাত্তরের দিনগুলি' থেকে নেওয়া হয়েছে। এই রচনাটি আমাদের কিশোরদের আবেগকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নাড়া দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নবম-দশম শ্রেণীর 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য'-এ[১২] আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত 'বীরশ্রেষ্ঠদের কথা' রচনাটিতে মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতিদানকারী সাতজন বীর মুক্তিযোদ্ধার কীর্তির ইতিহাস বিধৃত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি মুক্তিযুদ্ধের বহু আলোচিত বীরদের আত্মত্যাগের দিককে উন্মোচিত করেছে। জহির রায়হান রচিত 'সময়ের প্রয়োজন'[১৩] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি গল্প। একজন মুক্তিপাগল তরুণ মুক্তিযোদ্ধার রোজনামচা গল্পাকারে লেখক প্রকাশ করেছেন। এই গল্পে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মানুষের ঐক্য এবং সংগ্রামী চেতনা বিধৃত হয়েছে নিপুণভাবে। 'মাধ্যমিক বাংলা সংকলন কবিতা' সংকলনে স্থান পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা বিষয়ক দুটি কবিতা।[১৪] শামসুর রাহমানের কালজয়ী 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি ছাত্রছাত্রীদের অন্তরকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় আন্দোলিত করতে পারে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'শহীদ স্মরণে' কবিতায় রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে দেশের অগণিত বীর সন্তানের মহান আত্মত্যাগের মহিমাকে কবি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সামগ্রিকভাবে সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, ১৯৯৬ সালে স্কুলপর্যায়ে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন করার ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি মাধ্যমিক স্কুলের পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন দিক থেকে উঠে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠন

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাদরাসার অবস্থান ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের হিসেব মোতাবেক দেশে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত ১৭,০০০ ইবতেদায়ি মাদরাসা ছিল। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মাদরাসা বোর্ডের জরিপে দাখিল মাদরাসার সংখ্যা ৪৮২৬টি, আলিম ৯৯৬টি, ফাজিল ৯৫৮ এবং কামিল মাদরাসার সংখ্যা ১২৬টি উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫]

www.pathagar.com

মাদরাসাগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও মাদরাসাগুলোতে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত পরিসংখ্যান জানা যাচ্ছে না, তথাপি প্রতিবছর মাদরাসা থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা দেখে এই সংখ্যা ঊর্ধ্বমুখী বলে বোঝা যাচ্ছে। ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার বলে বিভিন্ন সূত্র উদ্ধৃত করেছে। ১৯৮৫ সাল থেকে মাদরাসা শিক্ষার দাখিল স্তরকে মাধ্যমিক এবং ১৯৮৭ সাল থেকে আলিমকে উচ্চমাধ্যমিক ডিগ্রির তুল্যতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাতেও ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রথাগত স্কুলশিক্ষার পাঠ্যক্রমের সাথে মাদরাসা শিক্ষার পাঠ্যক্রমের যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে, বইয়ের মানেও সেই পার্থক্য বিরাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশের স্কুল শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পুস্তক অনুসরণ করার নীতিমালা বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ড এখনো চালু করতে পারেনি। মাদরাসা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী অনুমোদিত, অননুমোদিত একাধিক বই বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে লেখা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এসব বই বাজার থেকে সংগ্রহ করে থাকে। দেশের গোটা মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থার ছাত্রছাত্রীদের জন্য অভিন্ন মানের পাঠ্যপুস্তক থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু তা না-হওয়ার ফলে বইয়ের মানের তারতম্য ঘটছে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তথ্যের নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ধর্মশিক্ষার আলোকে দাখিল ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস সিলেবাস অনুমোদন দিয়েছে। দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস বইয়ের নাম 'পুরানো দিনের ইতিহাস'।[১৬] বাংলায় ব্রিটিশদের আগমন থেকে '১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ঘটেছে। দাখিল সপ্তম শ্রেণীর 'ইতিহাসের আলো' পুস্তকটি ইসলামের ইতিহাস বিষয়ক।

দাখিল অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাস পুস্তকটির নাম হচ্ছে 'মুসলিম জাহানের ইতিহাস'। বইটির সিলেবাসের প্রথম ছয়টি অধ্যায় ইসলামের ইতিহাস সংক্রান্ত। সপ্তম অধ্যায়টি হঠাৎ করে এই অঞ্চলের তথা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে নবম অধ্যায়টি 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম'-এ শেষ হয়েছে। উক্ত সিলেবাসে মাদরাসা বের্ডের অনুমোদিত ইতিহাসপুস্তকটির রচয়িতা সৈয়দ আবুল হাসান। বইটি প্রকাশ করেছে আদিল ব্রাদার্স এন্ড কোং লি. ঢাকা। বইয়ের অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ'। অধ্যায়ের শুরুতেই লেখক লিখেছেন 'পাকিস্তান রাষ্ট্রের এই ২৪ বছর কাল হইল বাংলাদেশের ইতিহাসে পাকিস্তান আমল। তাহার মধ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ ঐতিহাসিক স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করে।'[১৭]

www.pathagar.com

উদ্ধৃতির বক্তব্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কয়েকটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে বলে আমাদের ধারণা। ১৯৭১ সালে ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হওয়ার পর থেকে মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের সময়কে 'পাকিস্তানের আমল' হিসেবে উল্লেখ করার সুযোগ থাকে না। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার বিজয় অর্জিত হয়েছে মাত্র। সুতরাং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশ ভূখণ্ডের উপর পাকিস্তানের কোনো বৈধ কর্তৃত্ব ছিল না। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কোনোপ্রকার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এমন তথ্য ও বাক্যরচনায় লেখকদের সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। আলোচ্য পুস্তকে তা করা হয়নি। ফলে মাদরাসার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশ কালের যাত্রা নিয়েই বিভ্রান্তিতে পড়তে পারে। দ্বিতীয় বাক্যটিও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'মুক্তিযুদ্ধ' এবং 'ঐতিহাসিক স্বাধীনতা যুদ্ধ' সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টিতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের প্রথম পবিত্র সংবিধানের 'জাতীয় মুক্তির জন্য একটি ঐতিহাসিক সংগ্রাম' ("a historic struggle for national liberation") কথাটি লিপিবদ্ধ ছিল। একথাটি দ্বারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত ২৩ বছরের সংগ্রামের মর্মার্থকে সকলপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তির সাথে যুক্ত করে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামকে ১৯৭১ সালে ব্যাপক তাৎপর্য দেওয়া হয়েছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতির এক ফরমান বলে সংবিধানের এই অংশ পরিবর্তন করে লেখালেন, "জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ" ("a historic war for national independence")[১৮] উক্ত ফরমানের গূঢ় অর্থ হচ্ছে, ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক যুদ্ধ ছিল শুধুমাত্র জাতীয় স্বাধীনতার জন্য; মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে এর গুরুত্ব এই বক্তব্যে স্বীকৃত হয়নি। লেখক সামরিক শাসকের ফরমানের বক্তব্যকেই যেন তার লেখায় প্রতিধ্বনিত করেছেন মাত্র। অষ্টম অধ্যায়ে পাকিস্তান আমলের ইতিহাস লেখা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে 'বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম'। মাত্র তিন পৃষ্ঠায় লেখক এই অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের একটি সাদামাটা বিবরণ প্রদান করেছেন মাত্র। অধ্যায়ের প্রথম প্যারাতে লেখক ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল এবং পাকিস্তানি শাসকমহলে এর প্রতিক্রিয়া খুব সংক্ষেপে বিবৃত করেছেন। লেখক লিখেছেন : "১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আগমন করেন এবং ১৬ই মার্চ হইতে ২৪শে মার্চ ৯দিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু এই আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং ২৫শে মার্চ রাত্রে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই শুরু হয় বাংলাদেশের শসস্ত্র (সশস্ত্র) মুক্তিসংগ্রাম।"[১৯]

www.pathagar.com

বক্তব্য সংক্ষেপ হওয়ার কারণেই মনে হচ্ছে, এতে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের ঢাকায় আগমনের কথা উল্লেখ নেই। ২৫ মার্চে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকবাহিনীর আক্রমণ পরিচালনায় ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের কথা জানার তাগিদ থেকেই ইয়াহিয়ার সাথে ভুট্টোর নাম লেখা থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। তবে এই প্যারার শেষ বাক্যটি ঠিক ছিল বলে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু এর পরের প্যারাতেই ইতিহাসবিকৃতি ঘটানো হয়েছে। লেখা হয়েছে : "১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের মধ্যরাত্রিতে গ্রেফতার হইবার পূর্ব মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু তাহার সেই স্বাধীনতার ঘোষণা বাঙালি জাতি সেই মুহূর্তে শুনিতে পায় নাই। পরদিন ২৬শে মার্চ রেডিও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম কেন্দ্র হইতে মেজর জিয়াউর রহমান সেই ঘোষণা বাঙালী জাতির সামনে তুলিয়া ধরেন। সেইসঙ্গে শুরু হয় মুক্তিসংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলন।"[২০]

এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এই যে, স্বাধীনতার এত বছর পরও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রকাশিত পুস্তকে এ-ধরনের ভুল তথ্য ও ব্যাখ্যা ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হচ্ছে। এখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ধারণাই পুস্তক-লেখকের নেই বলে মনে হচ্ছে। লেখক চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে 'রেডিও বাংলাদেশ চট্টগ্রাম কেন্দ্র' বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ সকলেই জানেন, ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের কয়েকজন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিল্পী চান্দগাঁওস্থ বেতার ট্রান্সমিটারকে 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নামে তাদের কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত কেন্দ্র থেকে ঐদিন দুপুরবেলা চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার কথা দেশবাসীকে জানান। তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান ২৭ তারিখ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আর একটি ঘোষণা পাঠ করেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অন্য অনেকের মতো মেজর জিয়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই ভাষণ প্রদান করেছেন। এম. এ. হান্নান, মেজর জিয়াসহ আরো অনেকেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা জানিয়ে উক্ত বেতার থেকে যে ভাষণ দেন তা মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল, মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। মনে রাখতে হবে এ সবই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ, কোনো বৈধ কর্তৃপক্ষের তারা কেউ ছিলেন না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ-ধরনের অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে স্বাধীনতাকামী মানুষ তখন গ্রহণ করেছিল। এর প্রত্যেকটির মূল্যই অপরিসীম ছিল।

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণার বৈধতা তখন রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা বঙ্গবন্ধুরই ছিল। জনগণ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার কথাই শুনতে আগ্রহী ছিল। বেতার থেকে যারাই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রসঙ্গে ভাষণ দিয়েছেন তারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথাই জাতিকে অবহিত করেছিলেন মাত্র। সুতরাং, বেতার থেকে স্বাধীনতার কথা প্রচার করাকে স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে এক করে ফেলার মারাত্মক ভ্রান্তি থেকে সচেতন থাকতে হবে লেখকদেরকে। আলোচ্য পুস্তকে তা থাকেনি। বলা হয়েছে : "প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই শুরু হয় বাংলাদেশের শসস্ত্র (সশস্ত্র) মুক্তি সংগ্রাম।" কথাটি নানা দিক থেকেই ত্রুটিযুক্ত। এখানে লেখক সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম বলতে যা বুঝিয়েছেন তা হবে মূলত মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরুর বিষয়টিকে গ্রন্থে সরলীকরণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম' অধ্যায়ে 'মুজিবনগর সরকার' এবং 'মুক্তিবাহিনী গঠন' উপশিরোনামে মুক্তিযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বিবরণটি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং মামুলিভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। বলা হয়েছে : "১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকহানাদার বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল নিয়াজী তাহার ১৩ হাজার (এটি হবে ৯৩ হাজার—লেখক) সৈন্য এবং বিপুল পরিমাণ রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রসহ বাংলাদেশ বাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।"[২১]

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণীতে 'ইসলামের ইতিহাস' নামক বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কিংবা উপমহাদেশের ইতিহাস এতে স্থান পায়নি। সুতরাং, মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠন এ-পর্বে এখানেই পরিসমাপ্ত বলা যায়। তবে এতক্ষণের আলোচনা থেকে দাখিল মাদরাসার বিভিন্ন শ্রেণীতে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা এতে ফুটে উঠেছে বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, যুদ্ধের ঘটনাবলি সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণা দেওয়ার হালকা চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

ষষ্ঠ শ্রেণীর 'সাহিত্য সওগাত' পাঠ্যপুস্তকে 'বাংলাদেশ' নামক গদ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে এভাবে : "দীর্ঘকাল পরাধীনতার পর ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হয়েছে। কত দেশপ্রেমিক বীর জীবন দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। অনেক দুঃখ, কষ্ট এবং ত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তাই মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্য আমাদের যত টান, এত ভালোবাসা। বাংলাদেশ আমাদের চোখের মণি, প্রাণের প্রাণ।[২২] তবে কথা হচ্ছে এখানে যে বিদেশী শাসনের কথা বলা হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়, অথচ স্পষ্টভাবেই পাকিস্তানি শাসনের কথা বলা যেত। মুক্তিযোদ্ধাদের কথা সরাসরি উল্লেখ করা হলে দেশপ্রেমিক

www.pathagar.com

হিসেবে তাদের সাধারণ পরিচয় ফুটে উঠত, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধের প্রমাণ পাওয়া যেত।

সপ্তম শ্রেণীর বাংলা 'সাহিত্য চয়ন' পুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত কোনো গল্প, প্রবন্ধ অথবা কবিতা স্থান পায়নি। ৮ম শ্রেণীর 'বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে 'বাংলাদেশ : মাটি ও মানুষ' নামক একটি তিন পৃষ্ঠার নিবন্ধে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মাত্র এইটুকু লেখা হয়েছে : "বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। কঠোর সংগ্রাম ও লক্ষ প্রাণের আত্মাহুতির বিনিময়ে অর্জিত এর স্বাধীনতা।"[২৩]

নবম-দশম শ্রেণী 'দাখিল বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কোনো কাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন, রণাঙ্গনের বিবরণ, গল্প অথবা কবিতা-এর কোনোটিই সংকলিত হয়নি।

দেখা যাচ্ছে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ৫টি শ্রেণীতে মাদরাসার ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রমে মুক্তিযুদ্ধের মতো এত গভীর প্রভাববিস্তারকারী ঘটনা, ইতিহাস, কবিতা, গল্প, স্মৃতিকথা, রণাঙ্গনের যুদ্ধের স্মৃতি, সাধারণ মানুষের জীবন ও অংশগ্রহণ সম্পর্কীয় বিষয়াবলি খুব একটা স্থান পায়নি। আমাদের লক্ষ লক্ষ কিশোরকে তাদের মাদরাসা সিলেবাস ও পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতার সাথে পরিচিত করতে না পারলে মুক্তিযুদ্ধের শৌর্যবীর্যের সাথে একাত্ম হতে এরা ব্যর্থ হবে। আমাদের ধারণা মাদরাসাগুলোতে কার্যত হচ্ছেও তাই। মহান মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপকতা আমাদের ইতিহাস, সাহিত্য এবং শিক্ষাক্রমের মধ্যদিয়ে তরুণ প্রজন্মের চিন্তাশক্তিকে উজ্জীবিত করবে, তাদেরকেও এ-যুগের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারাক-বাহক হিসেবে গড়ে তুলবে যদি পাঠক্রমের মধ্যে জাতীয় জীবনের এই মহৎ অধ্যায়ের ব্যাপক বিস্তার ঘটানোর উদ্যোগ গৃহীত হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে তা বলতে গেলে খুব সামান্যই ঘটেছে।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

স্কুল ও মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরের সমতা এবং ডিগ্রির মানে সমতুল্যতা নির্ধারিত হলেও উভয় ধারার পাঠক্রমের মধ্যে এখনও যথেষ্ট অসমতা বিরাজ করছে। স্কুলের পাঠক্রম যত দ্রুত পরিবর্তন করা যাচ্ছে মাদরাসার ক্ষেত্রে তা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না। পরিবর্তনের প্রতি একধরনের ভীতি মাদরাসার শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিরাজ করছে। মাধ্যমিক স্কুলে অধীত সামাজিক বিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিষয়ের বিষয়বস্তু মানের দিক থেকে বিবেচনা করলে এখন একটি অবস্থান দাবি করতে পারে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকগুলিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজন ও সংশোধনীর মাধ্যমে মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাসবিকৃতির হাত থেকে

www.pathagar.com

রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে—এক্ষেত্রেও মাদরাসাগুলো পিছিয়ে আছে। বস্তুত মাদরাসা শিক্ষাক্রমে জাতীয় ইতিহাসের স্থান অনুল্লেখযোগ্য, মুক্তিযুদ্ধের অবস্থান আরো কম। বাংলাদেশ মাদরাসা বোর্ড দেশের মাদরাসাগুলোর জন্য অভিন্ন মানের পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে এখনও যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। মাধ্যমিক স্তরের স্কুলের সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে যেখানে বিভিন্ন দিক থেকে পড়ানো হচ্ছে, মাদরাসা স্তরে তা সাধারণভাবেও পঠিত হচ্ছে না। যেহেতু দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে, তাই পাঠক্রমের সমতা রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয় ইতিহাসসহ সকল ক্ষেত্রে স্কুল ও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হওয়ার ধারণা রাখতে হবে। তাহলেই উভয় ধারার মধ্যে বর্তমানে বিরাজমান দূরত্ব একদিন হয়তো কমে আসতে পারে।

কতিপয় সুপারিশ

স্বীকার করতে হবে ১৯৯৬ সালে স্কুল পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংশোধনের পর মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ এতে বিস্তৃত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে একরৈখিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সামরিক যুদ্ধ হিসেবে অতীতে চিহ্নিত করা হয়েছিল, সংশোধনী কমিটি এটিকে জনযুদ্ধ হিসেবে চিত্রায়িত করেছে। এই উদ্যোগ মাদরাসা পাঠ্যপুস্তকেও গ্রহণ করতে হবে। মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পঠনপাঠন যথাযথমানে সংযোজন করতে হবে।

শুধু পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়ন করলেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে পঠিত হচ্ছে বলে বিশ্বাস করা যাবে না, স্কুল ও মাদরাসা পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক তথা ইতিহাস বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করাও একান্তভাবে প্রয়োজন। আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্কুল ও মাদরাসা পর্যায়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি এখনও গুরুত্ব পায়নি। ফলে ইতিহাস বিষয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। যে মানের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক এখন মাধ্যমিক স্কুলের জন্য অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে তা থেকে পাঠদানের জন্য অবশ্য ইতিহাস বিষয়ের দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন রয়েছে। মাদরাসাগুলোকেও এর বাধ্যবাধকতায় আনতে হবে।

শুধু ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষকের নিয়োগই ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। স্কুল ও মাদরাসা পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকের তাগিদ একান্তভাবে বেড়ে যাচ্ছে। দেশের স্কুল ও মাদরাসাগুলোতে এক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে। মানসম্পন্ন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকের সংখ্যা

www.pathagar.com

বৃদ্ধি করে উপর্যুক্ত সমস্যার নিরসন করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শিক্ষার আধুনিক ধারণা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে শিক্ষকদের সংযোগ ঘটলে হয়তো বর্তমান অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটতে পারে। সরকারকে স্কুল ও মাদরাসার মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রম, মানসম্পন্ন বই এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষকের বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা সেই আশাই পোষণ করি।

তথ্যনির্দেশ

১. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠন', *ভোরের কাগজ*, ২২-১২-১৯৯৭

২. ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে দেশের বরেণ্য ইতিহাসবেত্তা প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহমদকে আহ্বায়ক করে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংশোধনী কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য ছিলেন প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী, প্রফেসর সন্‌জীদা খাতুন, প্রফেসর মুনতাসীর মামুন, প্রফেসর হারুন-উর-রশীদ, ড. মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী এবং সাংবাদিক জি. এম. গাউস।

৩. বিস্তারিত জানতে দেখুন : মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, *বাংলাদেশে ইতিহাস পঠনপাঠন*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫

৪. *সামাজিক বিজ্ঞান*, অষ্টম শ্রেণী, এনসিটিবি, ঢাকা (পুনঃমুদ্রণ)

৫. *বাংলাদেশে ও প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস*, নবম-দশম শ্রেণী, এনসিটিবি, ঢাকা, ১৯৯৯ পৃ.১৪০-১৬০

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০-১৬০

৭. *সামাজিক বিজ্ঞান*, নবম-দশম শ্রেণী (বিজ্ঞান শাখার পাঠ্যবই), এনসিটিবি, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৬-১০৫

৮. *চারুপাঠ*, ষষ্ঠ শ্রেণী, এনসিটিবি, ঢাকা ১৯৯৭ (পুনঃমুদ্রণ) পৃ. ১১-১৩

৯. ঐ, পৃ. ১১৩

১০. সপ্তবর্ণা, সপ্তম শ্রেণী, এনসিটিবি, ঢাকা ১৯৯৭ (পুনঃমুদ্রণ), পৃ. ১৪-১৮

১১. *সাহিত্য কণিকা*, অষ্টম শ্রেণী, এনসিটিবি, ঢাকা ১৯৯৮ (পুন) পৃ. ১০২ - ১১০, ১১৩-১২০

১২. *মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য*, নবম-দশম শ্রেণী, এনসিটিবি, ঢাকা, ১৯৯৭(পুন), পৃ. ১৬২-১৭০

১৩. *ঐ*. পৃ. ১৭৩-১৭৮

১৪. *মাধ্যমিক বাংলা সংকলন কবিতা*, নবম-দশম শ্রেণী, এনসিটিবি, ঢাকা, ১৯৯৭ (পুন), পৃ. ৯০-৯১, ১০৪-১০৬

১৫. দেখুন : প্রফেসর এটিএম শরীফ উল্লাহ, *মাদরাসা শিক্ষা সম্পর্কে দুটি কথা*, জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০০০,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৭৪

www.pathagar.com

১৬. সৈয়দ আবু হাসান, *পুরনো দিনের ইতিকথা*, ষষ্ঠ শ্রেণী, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৬। মাওলানা আ. ন. ম. আবদুর মান্নান, *ইতিহাসের আলো*, সপ্তম শ্রেণী, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ২০০০। সৈয়দ আবুল হাসান, *মুসলিম জাহানের ইতিহাস*, অষ্টম শ্রেণী, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৬। অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নূরুল করিম, *ইসলামের ইতিহাস*, বাংলাদেশ শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৯ (পুনঃমুদ্রণ)

১৭. সৈয়দ আবুল হাসান, মুসলিম জাহানের ইতিহাস, পৃ.১০৭

১৮. *The Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh* (modified), 1986, p.15

১৯. সৈয়দ আবুল হাসান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬

২০. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২৬

২১. *পূর্বোক্ত* পৃ. ১২৮-১২৯

২২. *সাহিত্য সওগাত*, দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণী, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা ২০০০,পৃ. ৫-৬

২৩. *বাংলা সাহিত্য*, অষ্টম শ্রেণী, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা, পৃ. ৬৮

[জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন পরিচালিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত 'মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ' জার্নাল, প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০০০ প্রকাশিত (পৃ.৪৩-৫৪)।

২০০১ সালে ৪দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর স্কুল ও মাদরাসার পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চরমভাবে বিকৃত করা হয়। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসব বিকৃতির সংশোধনের সীমিত উদ্যোগ নেয়।—লেখক।]

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব

এক

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে নয় মাসের একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে। এই যুদ্ধের পেছনে পূর্ববাংলার জনগণের দীর্ঘদিনের আন্দোলন-সংগ্রামের একটি তাৎপর্যপূর্ণ পর্ব ছিল, ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন কারণও। একই সঙ্গে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে দেশের আপামর জনসাধারণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল ছিল, ফলে একটি অসংগঠিত অবস্থা থেকে জনগণ মুক্তিযুদ্ধে সফলভাবে অংশগ্রহণ করা এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের সকল পরিকল্পনা ও নির্দেশনা সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে সফল করতে সচেষ্ট ছিল। সে কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আর দ্বিতীয়টি নেই। দেশের নতুন প্রজন্ম নিজের দেশ ও জাতির এমন অশেষ গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে একদিকে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল হতে পারে; অপরদিকে দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগী মানুষের বীরত্ব, শৌর্যবীর্যে তাদের উদ্দীপিত করতে পারে। সব সময়ের জন্য দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠী গঠনে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে, নতুন প্রজন্মকে এক্ষেত্রে বঞ্চিত করা যাবে না। বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকারকে সেভাবে সচেষ্ট থাকতেই হবে—এমনটি প্রত্যাশিত।

কিন্তু দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না, অধিকন্তু বিকৃত ইতিহাসসহ তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকা উপস্থাপনার ফলে ছাত্রছাত্রীরা চরমভাবে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। বিশেষত সামরিক-আধাসামরিক সরকার, আওয়ামীবিরোধী সরকারসমূহ বাংলাদেশের সব স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায় মুক্তিযুদ্ধকে ন্যক্কারজনকভাবে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রক্ষমতায় আওয়ামী লীগ সরকারে থাকার সময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস যথাসম্ভব সঠিকভাবে পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া

www.pathagar.com

হয়েছিল। কিন্তু ২০০১ সালে চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধকে সামরিক বাহিনীর তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সামরিক যুদ্ধ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে; বঙ্গবন্ধুসহ তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে স্বাধীনতা ঘোষণায় ব্যর্থতার জন্য অভিযুক্ত করে একটি বিকৃত ধারণা দেওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিশু-ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস পঠনপাঠনে বাধ্য হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে প্রচারমাধ্যম, বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকায় তাদের জানা তথ্যের বিপরীতে পাঠ্যপুস্তকে বানোয়াট তথ্য ও মিথ্যা ভাষ্যে দেশের ছাত্রছাত্রীরা মারাত্মক বিভ্রান্ত ও উভয় সংকটে পড়েছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে এটি এক অবিশ্বাস্য দুঃখজনক, গ্লানিকর অভিজ্ঞতা—যা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে ঘটেছে বলে মনে হয় না।

একটি বিষয়ের অবতারণা করলে পাঠকরা হয়তো অবাকই হবেন। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) যাত্রা শুরু করলেও তৎকালীন (১৯৭২-উত্তর সময়) পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, যুদ্ধে জনগণের ভূমিকা, বীরত্বগাথা ঘটনা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবদান, ভূমিকা ইত্যাদি কোনো প্রসঙ্গই খুব একটা অন্তর্ভুক্ত করেনি। সেই সময়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহে এতবড় মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কীয় রচনা, গল্প, কবিতা, রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতার অবলম্বন করে রচিত নিবন্ধ বা প্রবন্ধ কেন স্থান পায়নি তা বুঝতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। গোটা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে মুক্তিযুদ্ধকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে পড়ানোর কোনো চিন্তাভাবনা এবং উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুলে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে ইতিহাস পঠনপাঠনের কোনো নিয়ম নেই। কেবল নবম-দশম শ্রেণীতে মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা এ বিষয়টির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হয়। তবে প্রাথমিক স্কুলে *পরিবেশ পরিচিতি* (সমাজ) নামক একটি বিষয় তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে পঠিত হয়। এতে ইতিহাসের যৎসামান্য অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে—তাতে বাংলাদেশ তথা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় বা স্তরের শিক্ষাক্রমে উক্ত পরিবেশ পরিচিতিও (সমাজ) ছিল না। সম্ভবত ১৯৮০ সাল থেকে প্রাথমিক স্কুল শিক্ষাক্রমে *পরিবেশ পরিচিতি* (সমাজ) প্রবর্তিত হলে ওই পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত একটি ধারণা লাভের সুযোগ পায়। মাধ্যমিক স্তরে *সামাজিক বিজ্ঞান* বিষয়টি ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীতে প্রবর্তিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কীয় কোনো অধ্যায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণীর মানবিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা *ইতিহাস*, বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা *সামাজিক*

www.pathagar.com

বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি জানা বা শেখার সুযোগ লাভ করেছে। ব্যবসায় শাখার ছাত্রছাত্রীদের জন্য *সামাজিক বিজ্ঞান* বিষয়টি আবশ্যকীয় নয়।

গত শতাব্দীর আশির দশকে স্কুলপাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুতে বেশকিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাতে প্রতিটি শ্রেণীতে আবশ্যকীয় বাংলা বিষয়ে গদ্য বা পদ্যের ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের কোনো গল্প, কবিতা অথবা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার জীবন ও রণাঙ্গনের কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রচলিত ইতিহাস পঠনপাঠনের বাইরে বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের কিছু ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ বা তাদের বীরত্ব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের জানা ও শেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে সামরিক, আধাসামরিক এবং এমনকি গণতান্ত্রিক শাসন বলে পরিচিত সময়েও আমাদের স্কুলের পাঠক্রমে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, রণাঙ্গন, নেতৃত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে প্রকৃত সত্যকে বাদ দিয়ে বানোয়াট, বিকৃত তথ্যে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ১৮টি পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় যেসব বিকৃত, ভুল ও বানোয়াট তথ্য ছিল তা সংশোধন করা হয়েছে। কিন্তু ২০০১ সালে চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সম্পূর্ণরূপে মনগড়া কাহিনী দিয়ে লেখা হয়েছে যেখানে শিশু-কিশোর ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত সত্যের পরিবর্তে মিথ্যা ধারণায় বিভ্রান্ত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ব্যর্থ, আত্মসমর্পণকারী এবং ভারতে পলায়নকারী হিসেবে পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক এবং কাণ্ডারী হিসেবে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধের পরিবর্তে একটি সামরিক যুদ্ধ তথা পাকিস্তান বাহিনী এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে চিত্রায়িত করার চেষ্টা সূক্ষ্মভাবে করা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু এবং মুজিবনগর সরকারকে আড়ালে রেখে ১১টি সেক্টরকে প্রাধান্য দেওয়া এবং মেজর জিয়াউর রহমানকে এসব কর্মকাণ্ডের মহানায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার রাজনৈতিক চেষ্টা করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তকে। বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত রচনা, গল্প ও পাঠসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হলে। এ প্রবন্ধে তা সম্ভব নয়। তবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কী কী রচনা, গল্প, কবিতা ও জীবনীমূলক রচনায় স্কুলপর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ সাজানো হয়েছে তা নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

www.pathagar.com

দুই

বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা প্রথমে দেখে নেওয়া যাক।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে *আমার বাংলা বই* প্রথম ভাগ। 'বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান' শিরোনামে একটি রচনা এতে স্থান পেয়েছে (পৃষ্ঠা-৬৮)। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ইতোপূর্বে কোনো রচনা পাঠ না করে ৬ বছরের শিশুদের এ-ধরনের রচনা হুট করে পড়ানো কতখানি যুক্তিসঙ্গত সেই প্রশ্ন করা যায়। রচনাটি পড়ে পাঠকরা সামগ্রিক বিষয়টি বিচার-বিশ্লেষণ করবেন আশা করি।

"ছোটবেলায় সবাই তাকে মতি বলে ডাকত। তার আসল নাম মতিউর রহমান। তারা নয় ভাই, দুই বোন। ১৯৪২ সালের ২৯ নভেম্বরে মতির জন্ম হয়। তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল রায়পুর থানায়। তাঁর গ্রামের নাম রামনগর। মতির মায়ের নাম মোবারকন্নেসা বেগম। বাবার নাম মৌলভী আবদুস সামাদ। মতিউর লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিলেন। তিনি খুব সাহসী আর বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি খেলতে খু-উ-ব ভালোবাসতেন। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন। সেখানে তিনি প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। তারপর তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বড় হয়ে তিনি পাইলট হবেন। মতিউর ১৯৬১ সালে পাকিস্তান বিমানবাহিনী একাডেমীতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ হয়। তখন মতিউর ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। তিনি গ্রামের লোকদের সামরিক শিক্ষা দিয়েছিলেন। যুদ্ধের কৌশল শিখিয়েছিলেন। বোমার আঘাত থেকে বাঁচতেও শিখিয়েছিলেন। এপ্রিল মাসে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যুদ্ধের জন্য বিমান প্রয়োজন। তাই তিনি কর্মস্থলে ফিরে গেলেন। মতিউর দেশকে ভালোবাসেন বলে বিপদকে ভয় পাননি। তাই মতিউর একটি বিমান নিয়ে দেশে ফিরে আসার চিন্তা করেছিলেন। এই চিন্তাটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। মে, জুন ও জুলাই মাসে তিনবার তিনি এই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয়নি। আগস্ট মাসের ২০ তারিখে তিনি টি-৩৩ নামে একটি বিমান নিয়ে উড়েছিলেন। টি-৩৩-এর নাম ব্লু-বার্ড ১৬৬। বিমানবাহিনীর লোকেরা টের পেয়েছিল বিমানটি কেউ নিয়ে যাচ্ছে। তাকে বাধা দিলে দুশমনের সাথে তাঁর লড়াই হয়। এই লড়াইয়ে মতিউর রহমান শহীদ হন।" (পৃষ্ঠা-৬৮)

বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে রচনাটি বেশ দুর্বোধ্য হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া মতিউরের কর্মস্থল কোথায় ছিল, দুশমন বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে তা স্পষ্ট করা হয়নি। ফলে শিশুদের বিভ্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ এই রচনায় রয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের একটি সাধারণ ধারণা না দিয়ে বীরশ্রেষ্ঠদের জীবনী ও বীরত্ব নিয়ে রচনা পরবর্তী শ্রেণীসমূহেও

www.pathagar.com

অব্যাহত রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর *আমার বাংলা বই* দ্বিতীয় ভাগ পাঠ্যবইতে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখকে নিয়ে (পৃষ্ঠা ৮১–৮৩) অনুরূপ একটি রচনা সংকলিত হয়েছে। এই রচনাটিতে অবশ্য স্পষ্ট করা হয়েছে যে, "তিনি পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।" (পৃষ্ঠা-৮১)

তৃতীয় শ্রেণীর *আমার বই* তৃতীয় ভাগে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক দুটি রচনা এবং একটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। বিজয় দিবসের আনন্দকে ঘিরে 'বিজয় দিবস' রচনাটিতে (পৃষ্ঠা ৬২-৬৫) মুক্তিযুদ্ধের একটি ভাসাভাসা ধারণা দেওয়া হয়েছে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের। সুকুমার বড়ুয়ার লেখা 'মুক্তিসেনা' (পৃষ্ঠা-৬৭) ছড়াটি গ্রথিত হয়েছে। 'বীরশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর' নামে অপর রচনাটি বইয়ের ৮৬-৮৮ পাতায় স্থান পেয়েছে। বাংলা বিষয়ে সংখ্যার বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক তিনটি রচনা কম নয়। কিন্তু উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার দুর্বলতার কারণে ছাত্রছাত্রীদের মানস গঠন, চিন্তাধারা গড়ে ওঠা এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব তাদের ওপর এসব রচনা কতখানি ফেলতে পারছে তা নিয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

তৃতীয় শ্রেণীর *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)* পাঠ্যপুস্তকের 'আমাদের জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় দিবস' অধ্যায়ে ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে (পৃষ্ঠা ৪৫–৪৮)। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণার অংশও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ২০০১ সালের পরের সংস্করণসমূহে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে :

"১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা হাজার হাজার নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। এতে সারা দেশ ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে পড়ে। পরের দিন মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তারপর থেকে শুরু হয় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। এজন্য ২৬ মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।" (পৃষ্ঠা-৪৭)।

১৯৯৩ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকার সময় উক্ত বইয়ের এই প্যারাতে কী লেখা ছিল তা দেখুন। লেখা ছিল,

"... পরের দিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ।" (পৃষ্ঠা-৪৭)।

১৯৯৬ সালে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি পূর্ববর্তী প্যারাসহ উল্লিখিত অংশ নিম্নোক্তভাবে পরিমার্জন করেছিল :

"১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বঙ্গবন্ধু মধ্যরাতের পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা

www.pathagar.com

দেন। পাকবাহিনী সেই রাতেই তাঁকে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুর ... স্বাধীনতার ঘোষণা দেশবাসীকে জানানোর জন্য ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে... প্রচার করেন। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আর একটি ঘোষণা প্রচার করেন।" (পৃষ্ঠা ৪৭) অথচ ২০০১ সালের পরবর্তী সব সংস্করণে জিয়াউর রহমানকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর *আমার বাংলা বই*-এ 'আমাদের জাতীয় দিবস' (পৃষ্ঠা ২২-২৬) এবং 'বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ হামিদুর রহমান' (পৃষ্ঠা ৭১ -৭৪) শিরোনামে দুটি রচনা সংকলিত হয়েছে। প্রথমটিতে ২৬ মার্চ কেন স্বাধীনতা দিবস সে-প্রসঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)* বইতে এর পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় রচনাটি বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ হামিদুর রহমানের জীবন ও রণাঙ্গনে যুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। তবে চতুর্থ শ্রেণীর *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)* বইটির নবম অধ্যায়ের শিরোনাম 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' (পৃষ্ঠা ৫৭–৬৫) এবং অধ্যায় দশ-এর শিরোনাম হচ্ছে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃৎ' (পৃষ্ঠা ৬৭–৮১)। 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' অধ্যায়টি ২০০৪ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ২০০২ সালে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃৎ' শিরোনামে একটি রচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' রচনাটি মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বটি নিম্নোক্ত মনগড়া তথ্যে লিখিত হয়েছে :

"১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। এ রাতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করা হয়। আর হাজার হাজার পাকিস্তানি সৈন্য ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৫শে মার্চ রাতেই অসংখ্য ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, ইপিআর ও সাধারণ নারী পুরুষকে হত্যা করা হয়।

এ আক্রমণে জনগণ প্রথমে কিছুটা দিশেহারা ও হতচকিত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ২.১৫ মিনিটে অর্থাৎ ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে চট্টগ্রামস্থ ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সাথে সাথে তিনি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন। তিনি ব্যাটালিয়নের সকল বাঙালি অফিসার ও জোয়ানদের একত্রিত করে তাদের সামনে প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দেন। এ ঘোষণায় তিনি তাদেরকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর ২৭শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান নিজেকে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট এবং মুক্তিবাহিনীর প্রধানরূপে ঘোষণা করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং সকলকে যুদ্ধে যোগ

www.pathagar.com

দেয়ার আহ্বান জানান। এ ঘোষণার মাধ্যমে সমগ্র জাতি আশার আলো খুঁজে পায় এবং মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।" (পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪)

দীর্ঘ এই বিবরণটি যে নির্জলা মিথ্যা এবং বানোয়াট তথ্য দ্বারা লিখিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ধরনের বিকৃত তথ্যের ইতিহাস পাঠে ছাত্রছাত্রীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার চাইতে বিরূপভাবাপন্ন হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃৎ' শিরোনামের রচনায় শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ জিয়াউর রহমান, এমএজি ওসমানীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। এসব জীবনীতেও একদিকে জিয়াউর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের রূপকার ও ত্রাতা হিসেবে; অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়ক এবং অন্যদের সাধারণভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণীর বইয়ে সংকলিত এই রচনাটির ২০০১-এ ডিসেম্বর সংস্করণে এমএজি ওসমানীর জীবনী অন্তর্ভুক্ত হয়নি, ২০০৫ শিক্ষাবছরের সংস্করণে জিয়াউর রহমানের পরে এমএজি ওসমানীর একটি ছোট জীবনী সংকলিত হয়েছে। 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃৎ' রচনাটিতে যাঁদের জীবন ও কর্ম ছাত্রছাত্রীদের জানার জন্য উপস্থাপিত হয়েছে তা জোট সরকারের রাজনৈতিক বিবেচনা ও চিন্তাভাবনায় লিখিত হয়েছে। বাংলা ও বাঙালির জন্য শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দীর অবদান থাকলেও বাংলাদেশের স্বপ্ন তারা দেখেননি। মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্যতম নেতা হলেও পাকিস্তান আমলে এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নদ্রষ্টা বা মূল নেতা তিনি ছিলেন না, ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকে রচিত শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী পাঠ করে ছাত্রছাত্রীরা সেই ধারণা মোটেও পাবে না, বরং তারা তাকে একজন স্বৈরশাসক, ব্যর্থ শাসক হিসেবেই খুঁজে পাবে। একমাত্র জিয়াউর রহমানের জীবনী পাঠ করে ওই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের কাছে মনে হবে তিনিই সেই সময়ে মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র নেতা ছিলেন যাকে বাংলাদেশের ত্রাতা, স্বপ্নদ্রষ্টাসহ সব সফল কাজের উদ্যোক্তা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল নেতা বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতার তুলনায় ১১ জনের মধ্যে অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের পথিকৃৎ বলে দাবি করার চিন্তাই অবান্তর এবং দুঃখজনক। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথিকৃৎ অভিহিত করতে যে-কোনো নেতার যে-ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগ্রাম, সংগঠন গড়ে তোলা, গণচেতনা সৃষ্টি করা ইত্যাদি থাকতে হয় তা একজন সামরিক কর্মকর্তার কোনোভাবেই থাকার কথা নয়, তার সেই সুযোগও নেই। একজন রাজনৈতিক নেতা তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনগণের

www.pathagar.com

মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন। সুতরাং একটি দেশের পথিকৃৎ হিসেবে কাউকে অভিহিত করার পেছনে কোনো ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ বা অপছন্দের কোনো বিবেচনা কাজ করা উচিত নয়, সমর্থনযোগ্যও নয়। অথচ আমাদের পাঠ্যপুস্তকে জোট সরকার সেই কাজটিই ন্যক্কারজনকভাবে করেছে।

পঞ্চম শ্রেণীর *আমার বই* (পঞ্চম ভাগ) বাংলা পাঠ্যপুস্তকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ ৩টি রচনায় রয়েছে। এগুলো হচ্ছে : 'বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল' (পৃষ্ঠা ৩৬–৩৯), 'স্মরণীয় বরণীয় যারা' এবং 'মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী' (পৃষ্ঠা ৯৯-১০২)। 'স্মরণীয় বরণীয় যারা' রচনাটি পাঠ্যপুস্তকের ২০০০ সালের সংস্করণে সংকলিত হয়েছে। এতে ১৯৭১ সালে যেসব বুদ্ধিজীবীকে ঘাতক রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছিল তাদের পরিচয় এবং কর্মজীবন সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত করা হয়েছে। তবে ২০০১ সালের পরের সংস্করণে হত্যাকারী হিসেবে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীকে উল্লেখের অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। ডা. ফজলে রাব্বী, ড. জিসি দেব, ডা. আলীম চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, সিরাজউদ্দিন হোসেনসহ ডাক্তার, শিক্ষক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের নাম আড়াল করে পাঠ্যপুস্তকে পাকিস্তানি বাহিনীকে দেখানো হয়েছে। জোট সরকারের শরিক দল জামায়াত ১৯৭১ সালে আলবদর, আলশামস বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা এবং বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারী বলে দীর্ঘদিনের প্রচারিত ও প্রমাণিত সত্য যেন ছাত্রছাত্রীরা জানতে না পারে সে-ব্যবস্থাই এ রচনাতে করা হয়েছে। বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর জীবন ও কর্মের ওপর রচিত রচনা দুটোতেও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ কম-বেশি স্থান পেয়েছে। এসব রচনায় ছাত্রছাত্রীরা একদিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের কিছু কিছু ঘটনা, কোনো কোনো যোদ্ধার অংশগ্রহণ এবং তাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারছে, অন্যদিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যাপক কর্মকাণ্ডকে উহ্য রেখে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করা, দেশী-বিদেশী সব প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে সফলভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার দুরূহ অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার যে মহান দায়িত্ব পালন করেছেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেটিকে ছাত্রছাত্রীরা জানা ও বোঝার বাইরে রেখে শুধু কয়েকজন সামরিক বাহিনীর সদস্যের যুদ্ধে অংশগ্রহণ ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের ঘটনাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সমগ্রতাকে খণ্ডিতভাবে বোঝা ও জানার মধ্যে রেখে দিয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে এ ধরনের পাঠ্যসূচি বিন্যস্ত করাটি মোটেও শিক্ষা বিজ্ঞানের দর্শন থেকে সমর্থনযোগ্য নয়। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ওপর ভিত্তি করে রচিত গদ্য, পদ্য, ইতিহাস এবং জীবনীমূলক রচনা থেকে প্রাথমিক স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীগণ সুস্পষ্ট বা স্বচ্ছ

www.pathagar.com

কোনো ধারণা লাভ করতে পারছে না, অধিকন্তু তারা যুদ্ধ-পূর্ববর্তী, যুদ্ধ-সময় এবং যুদ্ধ-পরবর্তী নানা ঘটনা, সাংগঠনিকসহ জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হচ্ছে।

পঞ্চম শ্রেণীর *পরিবেশ পরিচিতি* (সমাজ) বইটিতে প্রায় প্রতি বছরই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অংশে নানারকম বিভ্রান্তিমূলক তথ্য সংযোজন করা হচ্ছে। ২০০৬ সালের পূর্ববর্তী সংস্করণে *পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ)* বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়'। বিশাল এই অধ্যায়ের অষ্টম পর্বের শিরোনাম ছিল 'স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়'। এই পর্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি বিবৃত হয়েছে। তাতে যথারীতি সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার ঘোষণার দিন, ক্ষণ এবং ব্যক্তির নামের মধ্যে বিশেষভাবে পরিবর্তন ঘটানো হয়ে থাকে। জোট সরকার অথবা বিএনপির শাসনামলে মেজর জিয়াউর রহমানকে এককভাবে স্বাধীনতার ঘোষক, আওয়ামী লীগের শাসনামলে ২৬ মার্চে প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে এম এ হান্নান, ২৭ মার্চ মেজর জিয়া দেশবাসীকে জানান—এমন বিপরীতমুখী পরিবর্তন পাঠ্যপুস্তকে থাকে।

জোট সরকার ২০০৬ শিক্ষাবছর থেকে পঞ্চম শ্রেণীর উক্ত সমাজ পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তুতে ঘটায় ব্যাপক রদবদল। অধ্যায় পনেরো-এর শিরোনাম রাখা হয়েছে : 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' (পৃষ্ঠা ১২৬–১৩৮)। এই অধ্যায়ে ১৯৭০ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মূল ঘটনাসমূহ জোট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। নতুন এই অধ্যায়ে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে লেখা হয়েছে : "১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলন শুরু করেন" (পৃষ্ঠা-১২৭)। অথচ ওই ভাষণে পূর্ববাংলার জনগণকে স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ, স্বাধীনতার প্রাথমিক ঘোষণা জানিয়ে দেওয়াসহ গুরুত্বপূর্ণ যেসব দিকনির্দেশনা স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু দিয়ে রেখেছিলেন তা সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। মূলত স্বাধীনতার মূল নায়ক হিসেবে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাবকে যুক্তিযুক্ত করার একটি বানোয়াট প্রেক্ষাপট তৈরি করার চিন্তা থেকেই যে তা করা হয়েছে, ২৫শে মার্চ পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের বর্ণনা থেকে পুস্তকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখা হয়েছে :

"২৫ মার্চ রাতের প্রথম আক্রমণের মুখে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বাঙালি পুলিশরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শহরের নানাস্থানে মানুষ রাস্তার ওপর

www.pathagar.com

ব্যারিকেড দেয়। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রবল আক্রমণে এই প্রতিরোধ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি।

এ রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে গ্রেফতারের ফলে নেতৃত্বে বিরাট শূন্যতা দেখা দেয়। সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বের অভাবে জনগণ প্রথমে কিছুটা দিশেহারা ও হতচকিত হয়ে পড়ে। এ সময় ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ২.১৫ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তৎকালীন ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া ব্যাটালিয়নের কমান্ডার লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন এবং ব্যাটালিয়নের সমস্ত বাঙালি অফিসার, জেসিও জোয়ানদেরকে একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সাথে সাথে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের তা জানানো হয়।"

(সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ জুন-২০০৪, পৃষ্ঠা-১)।

এরপর ২৭শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দেন এবং সকলকে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে তার এই ঘোষণা ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই ঘোষণার মধ্যদিয়ে প্রথম দেশের মানুষ জানতে পারে বাঙালি সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। ফলে তাদের শক্তি, সাহস ও মনোবল অনেক গুণ বেড়ে যায়। দেশের সকল স্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে ২৬ মার্চ প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। ২৬শে মার্চ তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস"। (পৃষ্ঠা ১২৭–১২৮)।

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও এ থেকে পাঠকের কাছে পরিষ্কার হওয়ার কথা যে, জোট সরকারের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও সম্পাদনাকারীগণ কীভাবে মুক্তিযুদ্ধের বানোয়াট ইতিহাস রচনা করে আমাদের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের বিভ্রান্ত করেছে, অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ঘটনা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভূমিকাকে খাটো করে দেখানো হয়েছে। এই অধ্যায়ের বাকি পৃষ্ঠাসমূহে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে দুই-তিন বাক্যের অধিক কিছু লেখা হয়নি, অথচ ১১টি সেক্টর কমান্ডারের কর্মকাণ্ড, জেড-ফোর্সের কমান্ডার জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে কিছু অভিযান সম্পর্কে এমন ধারণা দেওয়া হয়েছে যেন মুক্তিযুদ্ধের মূল সেনানায়ক তিনি ছিলেন, তার নেতৃত্বে সংগঠিত যুদ্ধ অভিযানসমূহই যেন মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র উল্লেখ করার ঘটনা।

এভাবেই মুক্তিযুদ্ধকে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে সংগঠিত একটি সামরিক যুদ্ধের চরিত্র প্রদান করা হয়েছে। অথচ এই যুদ্ধে দেশের লক্ষ লক্ষ বেসামরিক মানুষও স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে, যে কারণে বাংলাদেশের

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধকে একটি জনযুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকার সামরিক, বেসামরিক, পুনর্বাসন, কূটনৈতিকসহ অজস্র সমস্যাকে মোকাবিলা করে নয়মাস একটি অসংগঠিত ও অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে একটি কার্যকর প্রস্তুতি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সফলভাবে সমাপ্ত করার যে গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন সেসব সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে কোনো বক্তব্য নেই। মূলত অধ্যায়টিতে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতা হিসেবে তুলে ধরার সংকীর্ণ দলীয় চিন্তা থেকেই যা-খুশি তা লেখা হয়েছে।

তিন

মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে বাংলা সাহিত্য, নবম-দশম শ্রেণীর ইতিহাস এবং সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত রচনাবলি, ইতিহাস ও ঘটনাবলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ স্তরে বাংলাসাহিত্য বিষয়ক সব পাঠ্যপুস্তকেই মুক্তিযুদ্ধের গল্প, রচনা এবং আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনী বিশেষভাবে সংকলিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এসব রচনাপাঠের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের ইতিপূর্বকার ধারণা আরো বিস্তৃত করার সুযোগ লাভ করেছে। তবে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের কোনো পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাস অংশ বা পর্বে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা নেই। অষ্টম শ্রেণীর সমাজপাঠে স্বাধীনতার বিকৃত ইতিহাস যথারীতি স্থান পেয়েছে। নবম-দশম শ্রেণীর মানবিক শাখার ইতিহাস এবং বিজ্ঞান শাখার সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও রাজনৈতিক ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে। পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে আমরা মাধ্যমিক স্তরের বাংলাসাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকসূহে আলোচিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনা, কবিতা ও জীবনীসমূহের সঙ্গে প্রথমে, এরপর নবম-দশম শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করব।

ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা *চারুপাঠ* পাঠ্যপুস্তকের প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তকের গদ্যাংশে সাহিদা বেগমের 'রক্তে লেখা মুক্তিযুদ্ধ' বিষয়ক রচনাটি প্রাসঙ্গিক। কবিতাংশে শামসুর রাহমানের, 'প্রিয় স্বাধীনতা' এবং মহাদেব সাহার 'হে কিশোর, শোন' কবিতাদুটি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মনে মুক্তিযুদ্ধের মর্মকে কিছুটা হলেও স্পর্শ করার মতো উপযোগী হয়েছে। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে জোট সরকার ক্ষমতারোহণের পর *চারুপাঠে* সাহিদা বেগমের এই রচনাটিতে স্বাধীনতার ঘোষণার অংশ বিকৃতভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৯০৬-২০০১ শিক্ষাবছরের সংস্করণে এই রচনাটির একটি প্যারায় লেখা ছিল : "২৬ মার্চ অল্পক্ষণের জন্য চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হল। ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান সেই বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর

www.pathagar.com

রহমানের পক্ষে দিলেন স্বাধীনতার ঘোষণা। বিশ্ববাসী শুনল, বাঙালি স্বাধীনতার ঘোষণা করেছে। শত্রুর অস্ত্রের মোকাবেলা করতে সশস্ত্র যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া জাগল সর্বত্র" (*চারুপাঠ*, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১৩)। কিন্তু ২০০১ সালের পরবর্তী সংস্করণের এই অংশটুকু পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে : "২৬ মার্চ অল্পক্ষণের জন্য চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু হল। ২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান সেই বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন" (... ২০০২ সংস্করণ, পৃষ্ঠা-১৩)। এ ধরনের নির্লজ্জ তথ্যবিকৃতি এবং স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে জিয়াউর রহমানকে প্রতিষ্ঠিত করার উদগ্র চেষ্টা ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার ক্ষেত্রে দারুণভাবে অনাগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া বইপুস্তকে একই ঘটনার ইতিহাস রাজনৈতিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন, বঙ্গবন্ধুর স্থলে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার একমাত্র ঘোষক হিসেবে উপস্থাপিত করা, জিয়াউর রহমানের বেতার-ভাষণের তারিখ ও বক্তব্যকে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্নভাবে লেখার কারণে ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্তিতে পড়ে। বইপুস্তকে অসত্য কথা লেখা হতে পারে এটি তাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

সপ্তম শ্রেণীর *সপ্তবর্ণা* পাঠ্যপুস্তকের প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে। তাতে আলাউদ্দিন আল আজাদের লেখা 'সময়ের হৃৎপিণ্ড' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে রচিত। ২০০০ শিক্ষাবছরে *সপ্তবর্ণায়* 'জাতীয় চারনেতা' রচনাটি মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামানের জীবন, কর্ম এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে ৩ নভেম্বর তাদের হত্যা করার ঘটনার বিবরণসমৃদ্ধ। অথচ ২০০২ শিক্ষাবছর থেকে *সপ্তবর্ণাতে* এই রচনাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক *সাহিত্য কণিকা*। উক্ত পাঠ্যপুস্তকের ১০২-১০৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কর্ম ও জীবন নিয়ে রচিত একটি রচনা সংকলিত হয়েছিল। এই রচনাটি পড়ে ছাত্রছাত্রীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, নেতৃত্ব প্রদান এবং কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছিল। একই সঙ্গে উক্ত সংস্করণে জাহানারা ইমামের সাড়াজাগানো দিনপঞ্জিভিত্তিক বই *একাত্তরের দিনগুলি* থেকে শিক্ষণীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ পাঠ্যপুস্তকের ১১২ থেকে ১১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সংকলিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের বেশকিছু ঘটনা, রুমির যুদ্ধে যাওয়া, যুদ্ধের খণ্ড খণ্ড ঘটনা, শহীদ হওয়া ইত্যাদি নিয়ে সংকলিত রচনাটিই মুক্তিযুদ্ধের ওপর ছাত্রছাত্রীদের মন ছুঁইয়ে যাওয়ার মতো লেখায় পরিণত হয়েছিল। সাহিত্যরসের বিচারেও এটি একটি চমৎকার রচনা ছিল। *সাহিত্য কণিকার* ২০০১ সালের ডিসেম্বর সংস্করণে রচনা দুটিই বাদ দেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

সাহিত্য কণিকার পদ্যাংশে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে নির্মলেন্দু গুণ 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হল' কবিতায় অত্যন্ত শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবিতাটি সংকলিত হয়েছিল ১৮১ থেকে ১৮৩ পৃষ্ঠায়। এছাড়া ১৯৫২-এর ভাষা-আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতিরক্ষার্থে প্রথম নির্মিত শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে লিখিত আলাউদ্দিন আল আজাদের সাড়াজাগানো কবিতা 'স্মৃতিস্তম্ভ' উক্ত পাঠ্যবইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠায় সংকলিত হয়েছে। আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রজ্বলিত করে লেখা হাসান হাফিজুর রহমানের 'অবাক সূর্যোদয়' সংকলিত হয়েছিল ১৮৯-১৯০ পৃষ্ঠায়। দুঃখজনক হলেও সত্য এই যে, ২০০১ সালের ডিসেম্বর সংকলনে উপরে উল্লেখিত সবক'টি কবিতাই বাদ দেওয়া হয়েছে। গদ্যাংশে 'স্বাধীনতার পথে স্মরণীয় যারা' শিরোনামে একটি বৃহৎ রচনায় চতুর্থ শ্রেণীর *পরিবেশ পরিচিতি* (সমাজ) বইয়ের অনুকরণে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মজলুম জননেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান এবং জিয়াউর রহমানের কর্ম ও জীবন বিবৃত করা হয়েছে। এই রচনাটিতেও মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণার প্রধান নায়ক হিসেবে জিয়াউর রহমানকে উপস্থাপন করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবনকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর *সাহিত্য কণিকায়* রচিত ৫টি জীবনীমূলক রচনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোচিত নেতৃবৃন্দ সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টিতেই অবদান রাখছে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। পরিসরের অভাবে রচনাটি নিয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে দেশের অভিভাবক, সচেতনমহল-সহ সবারই পাঠ্যপুস্তকটি হাতে নিয়ে পড়া দরকার বলে লেখক মনে করেন। তাহলে পাঠকরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবেন তাদের সন্তানদের কীভাবে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

নবম-দশম শ্রেণীর *মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য* এবং *মাধ্যমিক বাংলা কবিতার* প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। গদ্যে আলাউদ্দিন আল আজাদ রচিত 'বীরশ্রেষ্ঠদের কথা' (পৃষ্ঠা ১৬১–১৭০) এবং জহির রায়হানের লেখা 'সময়ের প্রয়োজনে' (পৃষ্ঠা ১৭৩–১৭৮) সংকলিত হয়েছিল। পদ্যাংশে কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' (পৃষ্ঠা-৯৩), সৈয়দ শামসুল হকের 'তোমাকে অভিবাদন, বাংলাদেশ' (পৃষ্ঠা-১০১) এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের 'শহীদ স্মরণে' সংকলিত হয়েছে। কবিতা তিনটিতে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা চিন্তা করার কিছুটা সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের জীবনে ঘটেছে। অপরদিকে 'বীরশ্রেষ্ঠদের কথা' রচনাটি ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠের জীবনালেখ্য নিয়ে রচিত। এই রচনাটি বাদ দিয়ে ২০০১ সালের সংকলনে দুজন বীরশ্রেষ্ঠ যথাক্রমে মুন্সী আবদুর রব এবং স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমীনের বীরত্ব ও অবদানের ওপর ভিত্তি করে একটি

www.pathagar.com

নতুন রচনা সংযোজন করা হয়েছে। এই রচনার শুরুতেই লেখা হয়েছে : "২৬ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। অগ্নিঝরা সে ঘোষণায় বাংলার মানুষ উদ্বেল হল। অকাতরে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপ দিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। কৃষক, মজুর, ছাত্র, শিক্ষক, তরুণ, প্রবীণ, সেনা, পুলিশ, গৃহবাসী আর কর্মচারী সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। এক সত্য একথা, চাই বাংলার স্বাধীনতা।" (পৃষ্ঠা -১৬৩)

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করেই পাঠক বুঝতে পারছেন পাঠ্যপুস্তকের এমন একটি সাধারণ রচনাতেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কীভাবে বিকৃত করা হয়েছে।

নবম-দশম শ্রেণীর মানবিক শাখার ছাত্রছাত্রীরা *বাংলাদেশ ও প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস* এবং *মাধ্যমিক পৌরনীতি* পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ছে। ১৯৮৪ সাল থেকে চালু করা ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ (পৃষ্ঠা ১৭৯–২১১) রয়েছে। এতে যথারীতি 'মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ' পরিচ্ছেদে মুক্তিযুদ্ধের অংশে স্বাধীনতা-ঘোষণার কৃতিত্ব জিয়াউর রহমানকে ২০০১ সালের পরের সংস্করণসমূহে দেওয়া হয়েছে। অধিকন্তু স্বাধীনতাযুদ্ধে জামায়াত, ইসলামী ছাত্রসংঘের বিরোধিতার বাক্যসমূহ বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী কর্তৃক দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার বাক্যসমূহও বাদ দিয়ে উক্ত হত্যাকাণ্ড হানাদার বাহিনী ঘটিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে *মাধ্যমিক পৌরনীতি* পাঠ্যপুস্তকেও মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও পরিচালনা পর্ব দুটিতে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস লেখা হয়েছে। বিজ্ঞানশাখার ছাত্রছাত্রীরা *মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান* বইতেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অনুরূপ বিকৃত তথ্য জানতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশের মাদ্রাসা স্তরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠিত হচ্ছে না, শুধু পঞ্চম শ্রেণীর *পরিবেশ পরিচিতি সমাজ* পাঠ এবং নবম-দশম শ্রেণীতে প্রসঙ্গক্রমে স্বাধীনতার ঘোষণা সংক্রান্ত বিষয়টি জোট সরকার একই তথ্যে ও বক্তব্যে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। সুতরাং মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, ঘটনাবলি, আবেগ-অনুভূতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি বলতে গেলে উপেক্ষিত।

আমাদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে *উচ্চমাধ্যমিক পৌরনীতি* পাঠ্যপুস্তকে একইভাবে বিকৃত ইতিহাস পঠিত হচ্ছে। এর কারণ হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকই (বেসরকারি উদ্যোগে লিখিত হওয়াসহ) এনসিটিবি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হয়। এনসিটিবি মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটি সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কর্তৃক গঠিত সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে বইসমূহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অংশ পরীক্ষানিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর

www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তকে কী লেখা থাকবে, থাকবে না তা অনুমোদন দিয়ে থাকে। অনুমোদিত বইসমূহে তা হুবহু ছাপাতে হয়। এমতাবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠনে সরকারের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, নির্দেশ ও প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকর থাকতে দেখা যায়। বিশেষত বিএনপি অথবা বিএনপি-জামাত জোট সরকারের শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস পঠনপাঠনের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠনে সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই, তবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পঠনপাঠন এবং গবেষণার প্রয়োজনীয় উদ্যোগও তেমন একটা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানার মধ্যে বেশ ঘাটতি লক্ষ করা যাচ্ছে। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে যেসব যুক্তিহীন কথাবার্তা শোনা যায়, দলীয় প্রভাবাধীন ছাত্রছাত্রীরা সেভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে বক্তব্য রাখে। প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়-পর্যায়ে তেমন একটা পঠিত বা গবেষণা হচ্ছে না। বিষয়টি এখনো দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণ অবস্থানে আটকে আছে। এমনটি মোটেও কাম্য নয়।

তথ্যসূত্র

১. *আমার বাংলা বই*, প্রথম ভাগ
২. *আমার বাংলা বই*, দ্বিতীয় ভাগ
৩. *আমার বই*, তৃতীয় ভাগ
৪. *পরিবেশ পরিচিতি*, তৃতীয় শ্রেণী
৫. *আমার বাংলা বই*, চতুর্থ শ্রেণী
৬. *পরিবেশ পরিচিতি সমাজ*, পঞ্চম শ্রেণী, ২০০৪ পূর্ববর্তী, ২০০৫
৭. *চারুপাঠ*, ষষ্ঠ শ্রেণী
৮. *সপ্তবর্ণা*, সপ্তম শ্রেণী
৯. *সাহিত্য কণিকা*, অষ্টম শ্রেণী
১০. *সমাজবিজ্ঞান*, অষ্টম শ্রেণী
১১. *মাধ্যমিক বাংলা সংকলন গদ্য*, নবম-দশম শ্রেণী
১২. *মাধ্যমিক বাংলা সংকলন পদ্য*, নবম-দশম শ্রেণী
১৩. *মাধ্যমিক পৌরনীতি*, নবম-দশম শ্রেণী
১৪. *বাংলাদেশ ও প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস*, নবম-দশম শ্রেণী
১৫. *মাধ্যমিক সামাজিক বিজ্ঞান*, নবম-দশম শ্রেণী
১৬. *পরিবেশ পরিচিতি সমাজপাঠ*, পঞ্চম শ্রেণী, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
১৭. বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী, *পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা. ২০০৪

www.pathagar.com

শিক্ষার প্রভাব : গ্রামীণ জীবন

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় (১৯০৩-১৯৮১) তাঁর কালজয়ী গবেষণাগ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব'-এ লিখেছেন : "বাংলায় ইতিহাসের আদিপর্বে এবং শুধু আদিপর্বেই নয়, সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া এবং বহুলাংশে এখনো বাঙালি জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক এবং বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ বাঙালির দৈনন্দিন জীবন এবং তাহার সমস্ত ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইত। কিছু দিন আগে পর্যন্তও ইহাই ছিল আমাদের জীবনের সবচাইতে বড় কথা।" (সূত্র-২, পৃষ্ঠা-৭০৩)। মূলত উৎপাদনব্যবস্থা হিসেবে কৃষিভূমিকে কেন্দ্র করেই এখানে গ্রামগুলো গড়ে উঠেছিল। গ্রামগুলো ছিল স্বনির্ভর তথা স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে কতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন আছে, মেলা বিতর্ক হতে পারে। মানুষের জীবন-জীবিকা, উৎপাদন ও ভোগ বলতে যা-কিছু ছিল তার সবটাই গ্রামীণ সমাজকেন্দ্রিক হত। এটি অব্যাহত ছিল শত শত বছর ধরে। ফলে একধরনের পাথরসম জড়তা ও কাঠিন্য বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরে বিরাজ করছিল—যার পরিবর্তন সাধন খুবই কঠিন ব্যাপার ছিল। তারপরও সকলের অজান্তেই গ্রামীণ সমাজের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটেছে, জড়তা ও কাঠিন্য কিছুটা হলেও কাটতে শুরু করেছে। যেসব বিষয়ে এসব জড়তা ও কাঠিন্যকে ধীরে ধীরে সহজ করতে অবদান রেখেছিল তার মধ্যে একটি হচ্ছে উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তন, অন্যটি হল শিক্ষা। আরো কিছু উপাদানও বাংলাদেশের হাজার বছরের গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তন, নাগরিক জীবন ও সমাজের উদ্ভবে অবদান রেখেছিল—সেগুলোকে অস্বীকার করা হচ্ছে না, গৌণও করা হচ্ছে না। তবে গ্রামীণ কৃষিভূমি-কেন্দ্রিক উৎপাদনব্যবস্থাই ব্যবসা-বাণিজ্য, গ্রাম্য গৃহশিল্প ইত্যাদিকে প্রসারিত করতে অবদান রেখেছিল, তা থেকে দ্বান্দ্বিক নিয়মেই নতুন উৎপাদন সম্পর্ক ও ব্যবস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণসমাজ দেরিতে হলেও অভিঘাতের কিছু কিছু প্রভাবে পড়ে।

পরিবর্তনের দ্বিতীয় যে উপাদানটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে শিক্ষা। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সমকালীন শিক্ষাকে ধারণ করতে পারেনি। প্রচলিত অর্থে এখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগ পর্যন্ত কোনো

www.pathagar.com

যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, সেভাবে পরিচালিত হয়নি। শিক্ষাও প্রকৃত চরিত্রে বেড়ে ওঠেনি; বরং এর যাত্রা এবং যৎসামান্য বিস্তার ঘটেছে ধর্মশিক্ষার হাত ধরে, সে-ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই। মোটা দাগে বলা যায়, বৈদিক যুগ থেকে ব্রিটিশ-পূর্বকাল পর্যন্ত পূর্ববাংলা তথা বৃহত্তর বাংলা অঞ্চলে প্রায় অভিন্ন এক গ্রামীণ জীবন ও অর্থনীতি সচল এবং বহাল ছিল। গণ্ডিবদ্ধ গ্রামীণ-জীবন ধর্মভিত্তিক শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইহকাল যেহেতু সকলেরই জানা ছিল, দেখা ছিল; তাই পরকালের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির কামনা তাদের বিশেষভাবে তাড়িত করেছে। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যযুগ—একে একে পার করলেও জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনো মৌলিক বা গুণগত পরিবর্তন এখানে ঘটেনি, তাই বিশ্ববীক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গিতেও বিশেষ কোনো হেরফের হয়নি। ব্যতিক্রম শুধু একবারই পরিলক্ষিত হয়েছে, তা হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (খ্রি. পূ. ৩য় শতাব্দীতে রচিত)—এতে জাগতিক সমস্যা ও চিন্তা শাসকশ্রেণীকে দোলা দিয়েছিল, রাষ্ট্রচিন্তার কিছু ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশ ঘটেছে, যা বেশ সূক্ষ্ম এবং গভীর। এখানেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বিদ্যাশিক্ষার কথা কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গোটা মধ্যযুগ, এমনকি ব্রিটিশ-পূর্ব যুগ পর্যন্ত এখানকার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বজনীন কথা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া হয়নি। অথচ বৌদ্ধযুগে নালন্দায় ও বিক্রমশীলায় বৌদ্ধধর্মভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা ছিল—যেখানে এ অঞ্চলের বাইরে থেকে অনেকেই এসে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ময়মনামতি, পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড়েও বৌদ্ধধর্মভিত্তিক শিক্ষাগ্রহণ করা হত। আচার্য শীলভদ্র (৭ম শতাব্দী) এবং অতীশ দীপঙ্কর (৯৮২-১০৫৪ খ্রি.) জ্ঞানসাধক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তবে মৌর্য ও চন্দ্রগুপ্ত যুগে বৃহত্তর ভারতবর্ষে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, ধর্ম ও জ্যোতির্বিদ্যার যে চর্চা শুরু হয় তা বাংলায় প্রবেশ করতে আরো অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ৪০০ বছর পালরা, পরবর্তী ১০০ বছরের কিছু অধিক সময় সেনদের শাসনকালে (১০৯৮–১২০৫) বাংলার রাজনীতিতে নানা উত্থান-পতন ঘটেছে। এ সময়েই বৌদ্ধবিহারসমূহে বৌদ্ধধর্ম চর্চার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়। বিক্রমশীল বিহারে ১১৪ জন শিক্ষক ছিলেন, অসংখ্য তিব্বতী ছাত্র পড়াশোনা করতে আসেন।

নানা তাম্রশাসনে বিধৃত 'প্রশস্তি' অংশে সংস্কৃতভাষা চর্চার স্পষ্ট কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীতে কবি অবিনন্দ রচনা করেন 'রামচরিতম' মহাকাব্য। তবে বিরল কাব্যরীতি অনুসরণ করে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিতম্' কাব্য রচনা করেন। তিনি একদিকে বাল্মিকীর রামায়ণের কাহিনী, অন্যদিকে সম্রাট রামপালের কাহিনী এতে প্রকাশ করেন। দর্শন, চিকিৎসা, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি শাখায় গ্রন্থরচনা

www.pathagar.com

পাল ও সেন যুগে বঙ্গ-অঞ্চলের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভ্যন্তরে চিরায়ত শিক্ষার বাতাবরণ তৈরি করতে সক্ষম হয়। এর ওপর ভিত্তি করে মধ্যযুগে সংস্কৃত ভাষা, ব্যাকরণ, অভিধান, অলঙ্কার ইত্যাদি শিক্ষার উন্মেষ ঘটে বঙ্গ-অঞ্চলে। তখন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যই ছিল ঈশ্বর, পরকাল, নির্বাণ, স্বর্গ-নরককে চেনা, মৃত্যুপরবর্তী জীবনকে প্রস্তুত করা। ধর্মগ্রন্থই ছিল মৌলিক পাঠ্যপুস্তক।

অবশ্য মধ্যযুগে গুরু-শিষ্যের ধারণাটি প্রবল হয়ে ওঠে। বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরু ও শিষ্যের কসরত একটি অপরিহার্য বিষয় ছিল; যেহেতু প্রতিষ্ঠান, বইপুস্তক, সরকারি নীতিমালা বলতে কিছুই ছিল না। তাই সাধনার কোনো বিকল্প সেই যুগে ছিল না। শিক্ষার জন্য সাধনাকে পুণ্যের মতো মহামূল্যবান মনে করা হত, শিক্ষালাভ মানে পুণ্যলাভ বলে ভাবা হত, বৈষয়িক লাভালাভের কোনো ধারণার কথা মধ্যযুগের সূচনাতে সূচিত শিক্ষায় ভাবা যেত না। বস্তুত তখনো পর্যন্ত বঙ্গ অঞ্চলে যে আধ্যাত্মিক তৃপ্তিলাভের জন্য একধরনের শিক্ষা গড়ে উঠেছিল, এর পেছনে জাগতিক সমৃদ্ধির ধারণা অনুমিত ছিল না। তবে যে শিক্ষাই (এমনকি ধর্মশিক্ষা হলেও) গ্রহণ করা হোক না কেন, শিক্ষার একটি মৌলিক দিক হচ্ছে—তা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়। তা থেকে জাগতিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাবলিকে যতই দূরে রাখা হোক না কেন, কোনো-না-কোনোভাবে সে শিক্ষা মানুষকে উজ্জীবিত করবেই। মধ্যযুগে অবচেতনে তেমন পরিবর্তন ক্ষীণভাবে হলেও বঙ্গীয় গ্রামীণজীবনে কমবেশি পড়তে থাকে।

মধ্যযুগে স্বাধীন বাংলার উৎপত্তি বাংলাভাষার গুরুত্বকে অপরিহার্য করে তোলে। সুলতানি যুগে বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটায়। একদিকে হিন্দু পণ্ডিত, অন্যদিকে সুফিসাধক, এই দুই গোষ্ঠী তখন শিক্ষার প্রসারে ভূমিকা রাখেন। টোল এবং মাদ্রাসা শিক্ষার একধরনের গোড়াপত্তন সুলতানি যুগেই (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রি.) ঘটে। দুর্বলভাবে হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা তখনই ঘটে। মুঘল যুগে এটি সম্প্রসারিত হয়। মাদ্রাসায় ইসলাম ও শরিয়া শিক্ষা, টোলে সংস্কৃত বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যম বেদ ও পুরাণ পড়ানো হতো। হিন্দুদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে নবদ্বীপ বিখ্যাত হয়ে ওঠে। বাংলার বাইরেরও অসংখ্য ছাত্র এসে নবদ্বীপে পড়াশোনা করত। মসজিদ, মক্তব ও মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের শিক্ষা মূলতই শহরকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। তবে গ্রাম থেকে অবস্থাপন্নদের ছেলেরা সোনারগাঁও, সাতগাঁও, রাজশাহীর বাঘা, গৌড় ইত্যাদি জায়গায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত।

লক্ষণীয়, মধ্যযুগে গড়ে ওঠা ধর্মভিত্তিক শিক্ষার কারণে প্রধান দুই সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে যায়, দুই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। তবে হিন্দুদের টোল প্রথা ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়েও ভাষা, ব্যাকরণ, পাটিগণিতসহ সাধারণ শিক্ষার ধাঁচ কিছুটা অনুসরণ করে পরিচালিত হওয়ার কারণে হিন্দুসম্প্রদায় শিক্ষার

www.pathagar.com

স্বাদ মধ্যযুগেই পেতে শুরু করে। মুসলমানগণ ধর্মশিক্ষার বাইরে ভাবতে পারেনি। ফলে বঙ্গীয় দেশজ মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়তে থাকে। এমনকি নবাব আবদুল লতিফ তার একটি লেখায় দেশজ তথা গ্রামীণ এই মুসলমানদের 'ছোটোলোক' বলে অভিহিত করেন। শিক্ষাদীক্ষার অভাবেই এখানকার গ্রামীণ মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়তে থাকে।

তখনো নগর বলতে যা বোঝায় তা বাংলা ভূখণ্ডে তেমন গড়ে ওঠেনি। বেশিরভাগ মানুষই বসবাস করত গ্রামে। গ্রাম মানেই কৃষিনির্ভর অর্থনীতি ও জীবন ব্যবস্থা। ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, বিচারকাজ, কুটিরশিল্প ইত্যাদির সঙ্গে অপেক্ষাকৃত পড়াশোনা জানেন এমন মানুষ যুক্ত হয়ে পড়েন। এরা নগরজীবনকে ক্রমেই বিস্তৃত করতে থাকে। গৌড়, পাণ্ডুয়া, সাতগাঁও, চাটগাঁও, সোনারগাঁও ইত্যাদি গ্রাম থেকে শহরে রূপান্তরিত হতে থাকে।

চোখে পড়ার মতো পরিবর্তন ঘটে গেল হিন্দুসমাজের মধ্যে। নানা বর্ণ, জাতিগত সমস্যার হিন্দুসমাজ অন্তত ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষায় দারুণভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ ছিল। সুলতানী আমলে (চতুর্দশ-ষোড়শ শতাব্দী) পাঠশালা ও টোল প্রথার সুযোগ মুসলমানদের চাইতে অনেকটা হিন্দুরাই বেশি গ্রহণ করেছিল, বাংলার বাইরে থেকে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে বাংলায় ফিরে আসেন অনেকেই। প্রথমে যদিও কিছুটা নগরকেন্দ্রিক টোল, পাঠশালা ও মাদ্রাসা গড়ে উঠেছিল, কালক্রমে তা গ্রামেও ধীরে ধীরে প্রবেশ করে।

মুঘল আমলেও বাংলার সমাজজীবন একই ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন ছিল, চতুষ্পঠী এবং মক্তব ছিল। মুঘল আমলে ফারসি ভাষার প্রচলন হলে স্বভাবতই গ্রামের মানুষ পিছিয়ে পড়ে। তবে মুঘল যুগে অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে নারীশিক্ষা কিছুটা উদারভাবে গৃহীত হয়, যেহেতু মুঘল সম্রাটদের অনেকেই নারীদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন। তবে সে-যুগের গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই ছিল হতদরিদ্র, নানা বৈষম্যের শিকার। গ্রামগুলো ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ছিল প্রকট; ফলে নানা নিপীড়ন, দাস-ব্যবসা, চুরি, ডাকাতি, লাম্পট্য, মিথ্যাচার বাঙালির গ্রামীণ সমাজে সহচর হিসেবে সক্রিয় ছিল। কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, দাসী হিসেবে নারীর ক্রয়-বিক্রয়, উপপত্নী প্রথা ইত্যাদি গোটা মধ্যযুগের গ্রামীণসমাজের এক বীভৎস রূপ পরিস্ফুট হয়। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার গ্রামীণসমাজে নারীকে পণ্যের বেশিকিছু ভাবা হত না। মেয়েদের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে বঞ্চনা ছিল ব্যাপক। যে সমাজে শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ছিল না, সেখানে নারীশিক্ষার কল্পনাই ছিল দুরাশা মাত্র।

তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা আবেদন হারাতে বসে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ফার্সি শেখা অসংখ্য ব্যক্তি

www.pathagar.com

বেকার হয়ে পড়ে, তাদের কর্মসংস্থান হচ্ছিল না কিছুতেই। দেশী পৃষ্ঠপোষকতাও কমতে থাকে। কোম্পানি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা দেশীয় 'টোল', 'চতুষ্পঠী', 'মক্তব', ও মাদ্রাসাভিত্তিক শিক্ষায় কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। সম্ভবত কোম্পানি শাসকরা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন। আবার ইংরেজি তথা আধুনিক শিক্ষা এখানকার জনগণ গ্রহণ করবে কিনা তা নিয়ে সংশয়মুক্ত ছিল না। হতে পারে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করার পর মানুষের ধ্যানধারণার মধ্যে যে পরিবর্তন হবে তা কোম্পানি শাসনের বিরুদ্ধে যাবে এমনটি বুঝতে পেরে কোম্পানি শাসকশ্রেণী আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে এ অঞ্চলের মানুষকে পরিচিত করাতে আগ্রহী ছিল না। কিন্তু বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষেই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাব্যবস্থা এ সময়ে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। ফলে সেটি ছাত্রদের আকর্ষণ হারাতে থাকে। সে প্রেক্ষিতেই মুসলমানদের একটি গণ্যমান্য প্রতিনিধিদলের অনুরোধে মুসলিম শিক্ষা ও চর্চার মান উন্নয়নের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এটিকেই শিক্ষাখাতে ভারতে কোম্পানি শাসনকালের প্রথম উদ্যোগ বলা যেতে পারে। এর ১০ বছর পর অর্থাৎ ১৭৯১ সালে স্যার উইলিয়াম জোনস এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ। যদিও শহরে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবুও বলা চলে ভারতবর্ষে সাধারণ শিক্ষার যাত্রা এখান থেকেই গ্রাম-গঞ্জেও ছড়িয়ে পড়া শুরু হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজির পাশাপাশি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে এ অঞ্চলের মানুষের। গ্রাম-গঞ্জেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলে। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে চার্টার আইন গৃহীত হয়। এতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমবারের মতো ১০ হাজার পাউন্ড শিক্ষাখাতে খরচ করার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে তখনো শিক্ষা কীভাবে, কোন্ ভাষায়, কোন্ পাঠক্রমে পরিচালিত হবে তাই স্থির করা যায়নি। ততদিন সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণীর মধ্যে তৈরি হতে থাকে।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের পাশাপাশি কিছু ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক বড়লাট হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আসার পর শিক্ষাক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার আনা হয়। ১৮৩৫ সালে থমাস বেবিংটন ম্যাকলে তার বিখ্যাত স্মারক পেশ করেন। তবে শিক্ষাবিস্তারে মূল ইউনিট হিসেবে গ্রামকে গণ্য করতে সুপারিশ করেন শিক্ষাবিষয়ক কর্মকর্তা উইলিয়াম অ্যাডাম। এটি ছিল ম্যাকলের বিকল্প প্রস্তাব। অ্যাডাম মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুপারিশ করেন, একই

www.pathagar.com

সঙ্গে তিনি শিক্ষার দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করার ওপর জোর দেন। কোম্পানির শাসকগোষ্ঠী অ্যাডামের শিক্ষাচিন্তা কার্যকর করেনি সত্য, কিন্তু বেশিদিন এখানে শিক্ষার প্রতি সৃষ্ট আগ্রহ বন্ধ করে রাখা যায়নি। বাংলা ভূখণ্ডের বিভিন্ন জেলা শহরে বেসরকারি উদ্যোগে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন চার্লস উড। তিনি ১৮৫৪ সালে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার একটি রূপরেখা সরকারের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন। এতে ভারতীয়দের শিক্ষাদানকে সরকারের একটি 'পবিত্র দায়িত্ব' বলে উড উল্লেখ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষা নিয়ে এ-ধরনের ধারণাকে অবমূল্যায়ন করার অবকাশ নেই। রাষ্ট্রীয়ভাবে শিক্ষার প্রসারে কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করা না হলেও বেসরকারি উদ্যোগে তখন অনেকেই আধুনিক শিক্ষার প্রসারের উদ্যোগ নিতে থাকেন; ধর্ম পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে তারা নগর বা শহরাঞ্চলে চালু করেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব উদ্যোগকে লঘু করে দেখার উপায় নেই। হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বসার সুযোগই তো এর আগে ছিল না—ধর্ম পরিচয়ের কারণে; কিন্তু কয়েকটি কলেজ প্রতিষ্ঠা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং স্কুলগুলোতে ধীরে ধীরে এখানকার অন্যতম দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ছেলেদের একসঙ্গে বসা, শিক্ষালাভের ধারা সূচিত হওয়ার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে। এর প্রভাব অচিরেই গ্রামেও পড়তে থাকে। মনে রাখতে হবে : অগ্রসর চিন্তা, শিক্ষাদীক্ষা নগরসভ্যতাকেন্দ্রিক উদ্ভাসিত হওয়ার পরই তা কেবল গ্রামগুলোকে হাতছানি দেয়, আহ্বান জানায়, ধীরে ধীরে এর প্রসার ঘটে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডেও তেমনটি ঘটেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে ইহজাগতিক আধুনিক শিক্ষার উদ্যোগ ইংরেজদের প্রচেষ্টায় সূচিত হয় তা ধীরে ধীরে হলেও গ্রামগুলোতে প্রবেশ করে। রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালন না করলেও সমাজের ভেতরে প্রতিষ্ঠান গড়া, শিক্ষাদীক্ষা করা ও করানোর তাগিদ অনুভূত হতে থাকে। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন দানশীল ব্যক্তির অর্থে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ছেলেদের থাকা-খাওয়া, কাপড়চোপড়সহ সবধরনের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হতো। উইলিয়াম অ্যাডামের রিপোর্টে তৎকালীন বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত ছাত্রদের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া, আসবাবপত্র সরবরাহ, পাণ্ডুলিপি কপি করার খরচ, কাগজ-কলম ইত্যাদি দেওয়ার চমৎকার সব বিবরণ দেওয়া আছে। ধনী ব্যক্তিদের সন্তানরা গৃহশিক্ষক রেখে পড়াশোনা করত, গরিব ছেলেরা অন্যের বাড়িতে জায়গির থেকে অথবা অর্থসংগ্রহ করে লেখাপড়া করত। শিক্ষকদের বেশিরভাগই কোনো অর্থকড়ি পেতেন না, অন্যের বাড়িতে জায়গির থেকে শিক্ষকতা করতেন, তারা ধনী

www.pathagar.com

ব্যক্তিদের যৎসামান্য অর্থসাহায্য পেতেন। তবে উনিশ শতকে পরনির্ভর বেশিরভাগ গ্রামীণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। কেননা সঙ্গতিপূর্ণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটি অংশের দক্ষিণার ওপর গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নির্ভরশীল ছিল। তাদের বড় অংশ শহরে চলে যাওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

অবশ্য বাংলা স্কুল তখনো মুসলমানদের আকৃষ্ট করতে পারত না। তারা ফার্সি-আরবি স্কুলেই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। ফার্সিকে মাতৃভাষা বাংলার ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়ার প্রবণতা শিক্ষাক্ষেত্রে গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণ ছিল। অন্যদিকে হিন্দুসম্প্রদায় ফার্সিভাষা থেকে সরে ইংরেজি ও বাংলা স্কুলের দিকে ঝুঁকতে থাকে। অ্যাডাম ১৮৩৮ সালেও লক্ষ্য করেছেন, মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে ফার্সির প্রীতি উর্দুর চাইতেও বেশি ছিল। সংস্কৃত শব্দ প্রভাবিত বাংলাভাষায় শিক্ষাদান ও পাঠগ্রহণকে সহজে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে মুসলমানদের ভয়ানক রকমের অনীহা এবং সংকোচ ছিল। তাছাড়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, রচনা ও বিষয়বস্তু নির্ধারণে বড় ধরনের সমস্যা ছিল, তখনো পর্যন্ত লেখকরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠে পাঠ্যপুস্তক রচনা করার কথা ভাবতেই পারেননি। ফলে হিন্দুলেখকদের লেখা পাঠ্যপুস্তক মুসলিম ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। মুসলমান পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা দীর্ঘদিন ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার ধারণা এখানকার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বোঝা ও চর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমস্যা ছিল, ঘাটতি ছিল।

ড. এফ বুকাননের তিন খণ্ডের রিপোর্টে (১৮৩৫-৩৮) দিনাজপুর জেলার ১১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে মুসলমানদের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রকোপের কথা উল্লেখ আছে। এছাড়া বিদ্যালয়ের মান নিম্নগামী ছিল, সাধারণ মানুষ তাদের সন্তানদের এসব বিদ্যালয়মুখী করার ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহী ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে ফার্সি এবং আরবি মাধ্যম স্কুলের আগ্রহ ছিল বেশি। ফলে মুসলিম-অধ্যুষিত গ্রামগুলোতে প্রাথমিক স্কুল খুব বেশি ছিল না। অ্যাডামের প্রতিবেদনেই লক্ষ্য করা যায়, ১৮২৩ সালে অন্তত ১৯টি মহকুমার মধ্যে ১৪টিতে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। বাকি ৫টির মধ্যে ১০টি বাংলা, ১২টি ফার্সি স্কুল ছিল প্রাথমিক শিক্ষার (সূত্র-৩, পৃ-১৭৭)। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অর্থায়ন, শিক্ষক, ছাত্র ও অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধার অভাব এতটাই প্রকট ছিল যে, একটির সংস্থান হলে অন্য একাধিক অভাবের কারণে যে-কোনো উদ্যোগই থেমে যেতে বাধ্য ছিল। মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলো এমনিতেই আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি ভাষার দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত ছিল। বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ইত্যাদি শিক্ষার ধারণা গ্রামগুলোতে ছিল না।

তবে গোটা উনবিংশ শতাব্দীতে শহরকেন্দ্রিক ইংরেজি, বিজ্ঞান, আইন, আধুনিক জ্ঞানতাত্ত্বিক বিষয়ে যে-শিক্ষার প্রসার ঘটে তা বাংলার গ্রামগঞ্জেও প্রভাব

www.pathagar.com

ফেলতে শুরু করে। গ্রামের অবস্থাপন্ন, মেধাবী, আগ্রহী বেশকিছু ছাত্র শহরে প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেছেন; আধুনিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে সরকারের নানা সংস্থায় চাকরি, আইনজীবী, শিক্ষকতা, চিকিৎসা ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হন; পারিবারিক জীবন ও অর্থনৈতিক আয়-উন্নতি তাদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদাকে পরিবর্তিত করতে থাকে। শহর থেকে প্রত্যাগত অনেকেই তখন গ্রামের স্কুল, মাদ্রাসাসহ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়। বস্তুত শহর-প্রত্যাগত শিক্ষিত একটি অংশের মানুষ গ্রামে শিক্ষা বিতরণে ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। শতভাগ পরকালনির্ভর শিক্ষা থেকে ইহজাগতিক শিক্ষায় বাংলাদেশের গ্রমীণসমাজ মোড় নিতেই ২০০ বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। রূপান্তরের বিষয়টি এখনো হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগুচ্ছে মাত্র, সম্পন্ন হওয়ার পথ অনেক দূর, অনেক কঠিনও বটে।

বাংলাদেশের চিরাচরিত গ্রামীণসমাজের স্থবির আর্থব্যবস্থা ইংরেজ আমলের আধা-আধুনিক ও আধা-সামন্ত রক্ষণশীল শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সংস্কারের যে-ধারা সূচনা করেছিল তা নিঃসন্দেহে এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা। তবে এ বিপ্লবের প্রতি সহানুভূতির চাইতে বাধার সমাহারই বেশি ছিল, একে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ সবচাইতে বেশি দেরি করেছিল। হিন্দুসমাজ অপেক্ষাকৃত দ্রুতই ইংরেজি, আধুনিক ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে গ্রহণ করে। ফলে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ওকালতি, বিচারিক কাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান গবেষণা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই বেশিসংখ্যক হিন্দুসম্প্রদায়ের ব্যক্তি এগিয়ে আসে। গ্রাম থেকেও অবস্থাপন্ন হিন্দুপরিবারের ছেলেরা শহরে স্কুল, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে, এমনকি সুদূর ইংল্যান্ডে পড়াশোনার জন্যও অনেকে পাড়ি জমায়। সেক্ষেত্রেও মুসলমান ঘরের ছেলেদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই কম এবং বিলম্বিত। এমনকি হিন্দুসমাজের নারীদের মধ্যেও আধুনিক শিক্ষালাভের প্রতি আগ্রহ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে লক্ষ্য করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন নানা মাত্রিকতা লাভ করে। এতে গ্রামে অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং উঠতি শিক্ষিতরাই যুক্ত হয়। কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা আসবে না, এমন ধারণা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মধ্যদিয়ে এসব তরুণের মনে বাসা বাঁধে। তাই তারা 'সন্ত্রাসবাদী' বা সশস্ত্রপন্থায় 'ইংরেজ শাসক হটাও' আন্দোলনে যুক্ত হয়। যেসব তরুণ এসব আন্দোলনে যুক্ত হয় তারা সবাই কমবেশি স্কুলশিক্ষা লাভ করেন, তাদের উত্থানও গ্রামে। এখানেই মৌলিক যে-বিষয়টি লক্ষ্য করার আছে তা হচ্ছে, আধুনিক যে শিক্ষা এসব তরুণ বিদ্যালয়ে লাভ করেছে তাতে ইতিহাস, রাজনীতি, মানুষ, দেশ, সমাজ, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শবোধ ইত্যাদির বিস্তর

www.pathagar.com

প্রভাব ছিল। কোম্পানি ও ইংরেজ শাসনামলে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির ক্ষেত্রে মৌলিক যে-বিষয়গুলো এখানকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষালাভকারী সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল তা হাজার বছরের ঐতিহ্যগত, প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এটিকে আমরা আধুনিক তথা জীবন-জগৎ, কর্ম ও চিন্তামুখী শিক্ষা বলেই অভিহিত করে থাকি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ১০০ বছরের মধ্যেই এখানকার সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ সবক্ষেত্রেই একটি গুণগত পরিবর্তনের ধারা সূচিত হতে থাকে। সেই ধারার প্রভাব অবশ্যই গ্রাম-গঞ্জেও পড়তে থাকে।

১৯০৫-৭ তথা বঙ্গভঙ্গ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির ধারণা নানাভাবে শাখাপ্রশাখা লাভ শুরু করে। সমাজে একটি মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্ম ও বিকাশ শুরু হতে থাকে—যারা শিক্ষাদীক্ষা, চাকরি, স্বাধীন পেশা, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত হতে থাকে। এদের উত্থানের পেছনে যেমনিভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক শিক্ষার প্রভাব ছিল, একইভাবে এ শ্রেণীর মানুষজন শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাদীক্ষার প্রসারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে আর্থ-সামাজিক দিক থেকেও পরিবর্তনের কার্যকর ছোঁয়া লাগতে থাকে। গ্রামগুলোতে সনাতন পদ্ধতির ধর্মশিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক জীবনধর্মী শিক্ষারও বিস্তার শুরু হতে থাকে।

গত শতাব্দীর শুরু থেকে ১৯৪৭-এর দেশভাগ পর্যন্ত এ ধারা অনেকটাই নিরবচ্ছিন্ন ছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর দেশভাগ পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ধারাকে দ্বি-জাতিতত্ত্বের উদ্ভট ভাবাদর্শে বিভক্ত করে ফেলায় অগ্রসর মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হওয়া দক্ষ হিন্দুসমাজের বড় অংশই নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তায়, নিরাপত্তার বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, কুচবিহারে পাড়ি জমায়। ফলে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের ব্যবচ্ছেদ ঘটে।

তবে অচিরেই এসব জায়গায় সম্বিৎ ফিরে আসা শুরু হয়—ভাষাকেন্দ্রিক জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন তথা বাংলাভাষা প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেখা দেয়। লক্ষণীয় বিষয় হল, ১৯৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনে যারা প্রাণ দিলেন তাদের সবার জন্ম এবং অবস্থান ছিল গ্রামে। তখনো পর্যন্ত নাগরিক সমাজ বা শহুরে মানুষের সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। শহরে যারা পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসাবাণিজ্য (তেমনি সুসংগঠিত ছিল না) ইত্যাদিতে যুক্ত ছিলেন তাদের প্রায় সকলেরই স্থাবর-অস্থাবর ও পরিবার-পরিজনের অবস্থান ছিল গ্রামকেন্দ্রিক; শহর তখনো পরিবারগুলোর স্থায়ী আবাসের ভরসার স্থল হয়ে ওঠেনি। শহরে কর্মসংস্থান, আয়-উপার্জন করলেও গ্রামেই তাদের পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য ও নির্ভরশীল ব্যক্তিরা বসবাস করত। ফলে শহরের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক খুবই নিবিড় ছিল।

www.pathagar.com

এককথায় শহর পুষ্ট হয়েছে গ্রামের লোকজন দ্বারা; আবার গ্রামে আর্থ-সামাজিক, শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ঘটেছে জেলা ও মহকুমা শহরের কর্মজীবী মানুষগুলোর মাধ্যমে।

১৯৪৭-উত্তর এবং ১৯৭১-পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশ ভূখণ্ড একদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিষ্পেষিত হয়েছে, অন্যদিকে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, ঐতিহ্যবাহী কলেজসহ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গ্রাম থেকে উঠে আসা হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর শিক্ষালাভ, সমগ্র বাংলাদেশ ভূখণ্ডেই নানাভাবে জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সময়ে ব্রিটিশ আমলের আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্র-রাজনীতির বৈপরীত্য বাঙালি এসব ছাত্রছাত্রীর জীবনকে নানা প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সম্মুখীন করে; তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আশঙ্কার জন্ম দেয়। উঠতি বাঙালি শিক্ষিত, মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে গ্রাম থেকে উঠে আসা এসব শিক্ষিত তরুণ-তরুণী জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের বোধ, চিন্তাচেতনার উপলব্ধিতে সংগঠিত হতে থাকে। তারাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যের নীতির স্পষ্টবিরোধী অবস্থানে চলে আসে; পূর্ববাংলার সাধারণ জনগণ, গ্রামের কৃষক, শহরের শ্রমিক চাকরিজীবীদের ন্যায্য পাওনা, চাকরি সুবিধা, পাটের মূল্য, লবণের দাম, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি নিয়ে সোচ্চার হতে থাকে। ১৯৪৮-৫২ সালে যারা ভাষার জন্য সোচ্চার ছিল তাদের প্রত্যেকেরই জন্ম ও বসবাস গ্রামে, আবার ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণের ঐক্যের সিংহভাগ কৃতিত্ব গ্রামাঞ্চল; এর পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্দোলন, দাবিদাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল গ্রাম থেকে উঠে আসা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্রদের বেশিরভাগই সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির পরিবর্তনের এ-ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়নি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। এর কারণ হচ্ছে তখনো পর্যন্ত এখানকার মাদ্রাসাশিক্ষা রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো আধুনিক ধারণা দেওয়ার শিক্ষাক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। তাদের শিক্ষা মূলতই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, পরকালনির্ভর। তবে সেখানেও ব্যবস্থাটি অনড় অবস্থানে থাকতে পারেনি; পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি একধরনের অন্ধ আনুগত্য ভেতর থেকে তৈরি হয়েছিল। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সে-কারণে পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অধিকার, স্বার্থ, চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা না ঘটে বরং একধরনের বিরোধী ও দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। এর আসল কারণই হচ্ছে দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থার দর্শন, পাঠক্রম এবং শিক্ষাক্রমের প্রভাব।

www.pathagar.com

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে যে তরুণ-তরুণীরা গ্রাম থেকে শহরে, অথবা গ্রামের স্কুল ও কলেজসমূহে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছে তারা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমই নয়, ত্রিশ-চল্লিশের দশকের ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ও রাজনীতির প্রভাবেও আন্দোলিত হয়েছিল; তাদের শিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্র-রাজনীতি ও সংস্কৃতির তাগিদ পরিস্ফুট হয়েছিল। সে কারণে এই ছাত্রছাত্রীরা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকে শহর থেকে গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছিল। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের বেশিরভাগ হাইস্কুল ও কলেজের ছাত্র-শিক্ষক অংশগ্রহণ করেছিল, পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বরূপ গ্রামের জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেছিল। সরকারি চাকরিতে বৈষম্য, পুলিশ-সেনাবাহিনীর চাকরিতে বৈষম্য, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সমস্যা, পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক-বণিক শ্রেণীর শোষণ, শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা ইত্যাদি তৃণমূল পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের চাইতে শতগুণ বেশি এই কাজগুলো স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে করছিল স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। এ প্রচারণার ফলে মস্তবড় প্রভাব পড়েছিল গ্রামে গ্রামে। কেননা, তখনো পর্যন্ত গ্রামের কৃষক, নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীরা একটি অগ্রসর চিন্তাচেতনার অধিকারী মর্যাদার আসনে থাকা মানুষ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। তাছাড়া গ্রামের কৃষকদের ছেলেমেয়েরাই তাদের পিতামাতাকে রাজনৈতিক ওই আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা সবচাইতে নিষ্ঠার সঙ্গে তুলে ধরতে পেরেছিল। তাদের বক্তব্য সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জেই ১৯৬৯ সালে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পদচারণা, মিছিল, সভা-সমাবেশ যত হয়েছিল তা ইতোপূর্বে কখনো হয়নি, ঘটেনি। সুতরাং এর একটি সাক্ষাৎ প্রভাব পড়েছিল ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চল ওই সময় কতটা আন্দোলন-সংগ্রামে উজ্জীবিত হয়েছিল তা তৎকালীন পত্রপত্রিকার পাতায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। গ্রাম এবং শহরের মধ্যে রাজনৈতিক যে সেতুবন্ধন রচিত হয়েছিল এর মূলে ছিল প্রাপ্ত স্কুল, কলেজ তথা উচ্চশিক্ষা। এর আগে কখনো বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল এতখানি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হওয়ার অবস্থানে যেতে পারেনি, যাওয়ার সুযোগ তাদের ছিল না যতখানি এ সময়ে হয়েছিল।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের গ্রামগুলোর ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে এক গৌরবের বিষয়। প্রতিটি গ্রামই যেন এক-একটি দুর্গে পরিণত হয়েছিল। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছে গ্রামগুলো ছিল সবচাইতে আতঙ্কের বিষয়। অথচ সবক'টি শহর পাকবাহিনী দখল করে নিতে সক্ষম হয়। সেখানে তারা তাদের দখলদারিত্ব নিরঙ্কুশ করেছিল, নিরীহ শহুরে জনসাধারণকে তারা

www.pathagar.com

জিম্মি করে রেখেছিল। শহুরে প্রতিটি মানুষ পাকিস্তানি সৈন্যদের ভয়ে তটস্থ ছিল। অথচ বাংলাদেশে গ্রাম সবসময়ই ছিল সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাৎপদ, প্রশাসনের অবহেলার শিকার। সেই গ্রামগুলো ১৯৭১ সালে হয়ে ওঠে প্রতিরোধের এক-একটি কেন্দ্রবিন্দুতে। শহর থেকে প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, গ্রামগুলোতে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, গ্রামের অতি সাধারণ মানুষ শহর ফেরত এসব মানুষকে পথে পথে আশ্রয় ও খাদ্য সহযোগিতা দিয়েছিল। গ্রামগুলোর মানুষ স্বাধীনতার জন্য এতটাই মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল, যা বিশ্বাস করাই এখন অনেকের জন্য বেশ কষ্টকর হতে পারে। কিন্তু ১৯৭১ সালের গ্রাম, গ্রামীণজীবন স্বাধীনতার জন্য এতটাই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। যারা এই প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল তারা হচ্ছে গ্রামের কৃষক, মজুর, সাধারণ নারী-পুরুষ, তরুণ-তরুণী। যে কৃষক হালের বলদ, লাঙল-জোয়াল ছাড়া অন্য তেমন কিছুর সঙ্গে পরিচিত ছিল না সে-ই দেশমাতৃকা ছেড়েছিল পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে; প্রশিক্ষণ নিয়ে সেই কৃষক বা কৃষকের সন্তান সম্মুখসমরে এক-একজন অকুতোভয় মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ করেছে, বীরত্ব প্রদর্শন করেছে, প্রাণ-উৎসর্গ করেছে, দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ প্রমাণ রেখেছে।

আমাদের গ্রামীণসমাজের নারীরা দেশমাতৃকার জন্য নিজ নিজ সন্তানকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত হামলায় কোথাও কোথাও লাঞ্ছনার শিকারও হয়েছেন। তারপরও বিজয় অর্জন, স্বাধীনতা লাভ করা ছাড়া কেউই পাকিস্তানে ফিরে যেতে চায়নি। এ এক বিস্ময়কর, অভাবনীয় পরিবর্তন, বাস্তবতা—যা বাংলাদেশের গ্রামগুলো ১৯৭১ সালে দেখিয়েছিল। মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তনের মূলে রয়েছে পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতা, স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির প্রত্যাশা। বাংলাদেশের গোটা গ্রামীণসমাজ যেখানে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ লাভের জন্য এভাবে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে পড়ে সেখানে পৃথিবীর কোনো শক্তির পক্ষে সে আকাঙ্ক্ষাকে দমন করা সম্ভব ছিল না; ১৯৭১ সালে সে সত্যই আবার প্রমাণিত হল।

স্বাধীনতা লাভের পর স্বভাবতই মানুষের অনেক প্রত্যাশা থাকে, বাস্তবে সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। কিন্তু এর জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরিকল্পনা, দেশ পরিচালনা, মিশন-ভিশনসহ অনেক কিছুরই সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর জন্য দেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে গণতন্ত্রের শাসন থাকতে হয়। বাংলাদেশে

www.pathagar.com

সেটি ছিল না। ১৯৭৫ সালের পর থেকে বাংলাদেশ উল্টোস্রোতের দিকে তরী ছেড়ে দেয়। ফলে প্রত্যাশিত পরিবর্তন বাংলাদেশে ঘটা সম্ভব হয়নি। তারপরও গত ৩৭ বছর ধরে বাংলাদেশের গ্রামীণজীবন ও সমাজব্যবস্থা অনেকটাই ভেঙে যাচ্ছে; এর আকার-প্রকার-ইকার, জীবনব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অভাবনীয় সব পরিবর্তন ঘটে চলেছে। স্বাধীনতা-উত্তর ৩৭ বছরে বাংলাদেশে গ্রামীণ জীবন ও সমাজ যতটা পরিবর্তিত হয়েছে ইতোপূর্বেকার দুই-আড়াই হাজার বছরেও ততটা পরিবর্তন আসেনি। তবে এসব পরিবর্তনের কতটা ইতিবাচক, সমাজ-প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে, কতটা হয়নি—তা নিয়ে হাজার প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্যাখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। এখন বিষয়টি বেশ জটিলও হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে যথাযথ জ্ঞানতাত্ত্বিক সমাধান না-খোঁজার চেষ্টা করা হলে এটি আরো জটিলতর হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই রাজনৈতিক সরকার একটি সর্বজনীন গণমুখী শিক্ষা চালু করার জন্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠন করে দেয়। কমিশন দেশী-বিদেশী নানা অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা পর্যালোচনা করে ১৯৭৪ সালে যে রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ সম্পন্ন করে বঙ্গবন্ধুর সরকারের হাতে অর্পণ করে তা এককথায় একটি চমৎকার দলিল; মেধা ও আন্তরিকতার শ্রেষ্ঠ ছাপ রাখা দলিল। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা গেলে দেশে একটি অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠত যার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হত বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক সরকারকে হটিয়ে বাংলাদেশে যে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তার ফলে বাংলাদেশ থেকে বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ার সব চিন্তাচেতনা পরিকল্পনা পরিত্যাজ্য হয়েছে, বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রেই বৈষম্য ও বিভ্রান্তির দিকভ্রান্তিতে হাঁটতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত কোনো সঠিক শিক্ষানীতি দ্বারা এর জনসমষ্টিকে গড়ে তোলার চেষ্টাই করেনি। ফলে বাংলাদেশে একটি নীতিহীন, আদর্শহীন, পরিকল্পনাবিহীন বাণিজ্যনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা নানা ধরনের ডালপালা, শাখাপ্রশাখা মেলে বেড়ে উঠেছে, যার ফল দেশ ও সমাজের জন্য তেমন কোনো মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনি, ভবিষ্যতেও বয়ে আনবে বলে মনে হয় না।

গত ৩৭ বছরে যে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থা বাংলাদেশে বেড়ে উঠেছে তাতে নানা ধারা, উপধারার শিক্ষা গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। একদিকে সাধারণ প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক কলেজের সংখ্যা বেড়েছে, অন্যদিকে সাধারণ মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসাও বেড়েছে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে। দেশে যে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তৃত হয়েছে তাতেও নানা সমস্যা ঘনীভূত হয়েছে।

www.pathagar.com

ব্রিটিশযুগে বেসরকারি উদ্যোগে যেসব স্কুল-কলেজ এই ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেগুলোতে মানসম্মত পাঠদান, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধাদানের চেষ্টা ছিল। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই মানের চরম সংকটে ভুগছে, বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই নানা অনিয়ম, অদক্ষ শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। একসময় গ্রামের স্কুল ও কলেজ থেকে ছাত্রছাত্রীরা অসাধারণ কৃতিত্বের ফলাফল দেখাত, এখন সে ধারাটি প্রায় বিলুপ্তির পথে। শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অন্তত পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফল প্রাপ্তির দৌড়ে জয়লাভের একটা প্রতিযোগিতায় চলে গেছে, সেক্ষেত্রে গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে। সে কারণে গ্রামের অবস্থাপন্ন অভিভাবকমহল ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য শহরমুখী হচ্ছে, অন্তত উপজেলার নামিদামি স্কুল-কলেজে তাদের সন্তানদের পাঠানোর চেষ্টা করেছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এখন গ্রামের অভিভাবকমহলও ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যেখানেই পড়াশোনা ন্যূনতম সুযোগসুবিধা আছে সেখানেই প্রচুর ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, পড়াশোনা করার চেষ্টা করছে। বিশেষত যে বিষয়টি এর মধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে—নারীশিক্ষার হার গ্রামেও দ্রুতগতিতে বেড়েছে; স্কুলগুলোর বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। গ্রামে এখন মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে আগের মতো রক্ষণশীলতা নেই বললেই চলে। যেসব গ্রামে স্কুল, কলেজ ও যাতায়াতব্যবস্থা ভালো সেসব গ্রামে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম থেকে এখন হাজার হাজার ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজ পাস করছে, এদের অনেকেই উচ্চতর শিক্ষার জন্য এখন বড় শহরে ছুটে আসছে; বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সহ নানাধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করছে।

অথচ ১০০ বছর আগেও বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে শিক্ষার হার তেমন উল্লেখ করার পর্যায়ে ছিল না, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া কল্পনার বাইরে ছিল। ৯-১০ বছর বয়সের মধ্যেই বাল্যবিয়ের পিঁড়িতে ছেলেমেয়েদের প্রায় সবাইকে বসতে হত; গৃহস্থালি, কৃষিকাজ ছাড়া এদের জীবন-জীবিকার কোনো সুযোগই ছিল না। গত ১০০ বছরে এক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে। গ্রামগুলো এখন আর চিরায়ত প্রথায় চাষবাস করছে না, চিরায়ত খাদ্যোৎপাদনও করছে না। এর মধ্যে গত ৩০-৪০ বছরে চাষাবাদে বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে, উচ্চফলনশীল বীজ ও চাষাবাদে কৃষকরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, খাদ্যোৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে গেছে, ঘরে সচ্ছলতা অনেকেরই এসে গেছে, গ্রামের লাখ লাখ তরুণ মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের জন্য পাড়ি জমিয়েছে। যে বাঙালি একদা নিজ গ্রাম থেকে কখনো বের হয়নি, শহর দেখেনি; সেই বাঙালি বাংলাদেশ ছেড়ে এখন

www.pathagar.com

পৃথিবীর অনেক দেশেই চাকরি করছে, অর্থোপার্জন করছে, আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে পরিশ্রম করছে—এ এক অভাবনীয়, অভূতপূর্ব পরিবর্তন। সেই পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছে বাংলাদেশের বেশিরভাগ গ্রাম, গ্রামের মানুষ। সুতরাং, এই মানুষগুলো চেষ্টা করছে তাদের ছেলেমেয়েদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করতে। কেননা, তারা বুঝতে পারছে শুধু জমির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা যাবে না। অতএব, তাদের পড়াশোনা শিখতে হবে, উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে সবাইকে পড়তে হবে—এমন ধারণাটি এখন গ্রামীণসমাজে মোটেও নতুন নয়, অগ্রহণযোগ্যও নয়।

গ্রামীণসমাজে গত চারদশকে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটে গেছে—যেগুলো আগে আশা করা কঠিন ছিল। যোগাযোগব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে যাওয়ার ফলে মানুষের যাতায়াত, চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে কর্মরত গ্রামীণসমাজ থেকে উঠে আসা তরুণদের অভিভাবকদের যে সংযোগ ঘটেছে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যেসব সুযোগসুবিধা বিস্তৃত হচ্ছে তাতে জীবনব্যবস্থাতেই আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এখন গ্রামীণসমাজে টিউবওয়েল, পাকা-পায়খানা, স্নানাগার, পাকাবাড়ি, বিদ্যুৎ সংযোগ ইত্যাদির সম্প্রসারণ ঘটছে; সঙ্গে সঙ্গে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদির লালনপালন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে; গ্রামের মানুষ সেভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অধিকন্তু গ্রামগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা বিস্তৃত হওয়ায় জন্মনিয়ন্ত্রণ আপনাআপনি কার্যকর হচ্ছে, শিশুজন্মের ক্ষেত্রে মান্ধাতা আমলের পদ্ধতির চাইতে নিকটস্থ হাসপাতালের ওপর আস্থা বেড়েছে, শিশুমৃত্যুর হারও তাই কমতে শুরু করেছে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির ফলে এসব সুযোগসুবিধা পরিবারে গ্রহণের আগ্রহ বেড়ে গেছে।

গ্রামগুলোতে নানা ধরনের এনজিও, শিক্ষাদীক্ষা, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প বিস্তৃত হওয়ায় মানুষের আয়-উন্নতি, রোজগারের উপায়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে, মেয়েদের নানা ধরনের চাকরি গ্রহণের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেকেই এখন বাড়িতে সংসারের খরচ নির্বাহের জন্য অকৃষিজ অর্থাৎ চাকরি, কুটিরশিল্প ইত্যাদি আয়ের সংস্থান করছে, নিজেদের সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই শিক্ষকতা, স্বাস্থ্যসেবা, এনজিও ইত্যাদি পেশায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অনেকেই কাজ করছেন, আয়-উপার্জন করছেন—যা আগে কেবল শহরেই কল্পনা করা যেত, গ্রামে নয়। এখন গ্রামাঞ্চলেও রেডিও, টিভি চ্যানেল, মোবাইল ফোন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে নাগরিক সভ্যতার সুযোগসুবিধাগুলো বিস্তৃত হচ্ছে, গড়ে উঠছে এসব যন্ত্রপ্রযুক্তির পেশা ও শিক্ষা। বস্তুত গ্রামগুলো পরিবর্তিত হয়ে এখন কয়েক যুগ আগের শহরের চরিত্রই যেন ধারণ করতে যাচ্ছে। গ্রাম যেন আর

www.pathagar.com

আগের গ্রাম থাকছে না, দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের মূলশক্তি শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে আসার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর শহরের মানুষের মতো গ্রামের মানুষেরাও জীবনবোধ, চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। সেই পরিবর্তনের বাইরে থাকতে পারেনি হাজার বছরে হিমালয়সম অনড় বাংলার গ্রামীণ সমাজ; শিক্ষা এর ভেতরের পাথরকে তরল জলে রূপান্তরিত করছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ জীবন ও সমাজব্যবস্থাও আধুনিক হতে শুরু করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ* দুই খণ্ড, দেশ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৯৯ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

২। নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব*, দেশ পাবলিশিং কলিকাতা ১৯৯৩ সংস্করণ

৩। ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

৪। ড. এম এম রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ১৫৭৬-১৭৫৭*, ১ ও ২ খণ্ড, ১৯৮২

৫। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, *বাঙালির ইতিহাস*, পশ্চিমবাংলা আকাদেমি, ১৯৯৯

৬। তেসলিম চৌধুরী, *মধ্যযুগের ভারত*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৪

৭। তেসলিম চৌধুরী, *মধ্যযুগের ভারত, সুলতানি যুগ, মুঘল আমল*, ২০০০

৮। হোসেন আরা শাহেদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা*, ২০০২

৯। তপন বাগচী, সাইফুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, ২০০৬

১০। ড. হরিসাধন গোস্বামী, *ভারতে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্রমবিকাশ*, প.ব.রা. পর্ষদ, ১৯৮১

www.pathagar.com

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন উপাচার্য এবং প্রত্যাশা

গত ১৭ জুলাই (২০০৮) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. এম মোফাখখারুল ইসলাম। আমরা যারা পেশাগত কারণে প্রফেসর ইসলামকে কাছ থেকে দেখেছি তাঁকে চিনি এবং জানি, তাদের মনে দু-ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আমরা এ নিয়োগে সন্তুষ্ট। কেননা, প্রফেসর ইসলাম একজন স্বনামধন্য শিক্ষকই শুধু নন, তিনি একজন বলিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং দৃঢ়চেতা মানুষও বটে। এদিক বিবেচনা করলে এ নিয়োগে অবশ্যই সন্তুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, আমরা কিছুটা শঙ্কিত এবং দ্বিধান্বিত, কেননা জায়গাটি এমন সৎ, যোগ্য উপাচার্য মানুষটিকে আদৌ ধারণ করতে পারবে কিনা, নাকি কিছুদিন পর আবার তার বিরুদ্ধেও নানা সত্য-মিথ্যা জড়িয়ে প্রচারণা শুনতে হবে, দেখতে হবে। সম্ভবত ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম উপাচার্যের মেয়াদ শেষ করে বিদায় নিতে পেরেছিলেন, আর কারোই ভাগ্যে স্বাভাবিক বিদায় ঘটেনি। প্রথম উপাচার্য এম এ বারীর কথা বেশি না-বলাই ভালো, আমরা এসবের পুনরাবৃত্তিতে অবিষ্যতে শুধু দুঃখই পাব না, আশাহতও হব।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধারণাটি নিয়েই গুরুতর অভিযোগ আছে। স্নাতক ডিগ্রি দুনিয়া জুড়েই কোনো-না-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ থেকে দেওয়া হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও তাই ছিল। ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন দেশের সমস্ত ডিগ্রি কলেজ ছিল। এগুলোর অনুমোদন, শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ওই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ নিয়ে অভিযোগ থেকে তখন কথা উঠেছিল যে, স্বতন্ত্র একটি জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজগুলো করা হলেই তো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যেই ভাবা সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হল। বাঙালির দক্ষতা এক্ষেত্রে অতুলনীয়। কিন্তু একবারও ভাবা হল না, আমরা কোথা থেকে কোথায় যেতে চাচ্ছি, কী করতে যাচ্ছি, কী বাদ দিয়ে কী গড়তে যাচ্ছি—এর কিছুই ভেবে দেখা হয়নি। দেশের উচ্চশিক্ষার এতগুলো ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ, ছাত্র-শিক্ষক এবং তাদের উচ্চশিক্ষা নিয়ে আমরা কী করতে যাচ্ছি, তা মোটেও গভীরভাবে ভেবে দেখা হল না—এটিই পরিতাপের বিষয়।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুক্ত হতে হবে—তাৎক্ষণিক এক ভাবাবেগ, এতে নেই কোনো সুদূরপ্রসারী বাস্তব ও সৃজনশীল চিন্তা ও উদ্যোগ, নেই কোনো বিশ্ববাস্তবতার অনুধাবন চেষ্টা। বরং ওই যে বলেছিলাম তাৎক্ষণিক ভাবাবেগ, সেই ভাবাবেগে তাড়িত হয়েই আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম নতুন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার। এখানেও দুর্ভাগ্য আমাদের পিছু ছাড়েনি। আমাদের কর্তাব্যক্তিরা তখন ধারণা নিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের। উক্ত শিক্ষাবোর্ডের ধারণা, অভিজ্ঞতা, কার্যক্রম এবং সেই ধাঁচের জনবল নিয়ে দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কলেজসমূহ নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিষ্ঠান গড়ার যাত্রাও শুরু করলেন।

তিনটি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুক্ত হয়ে দেশের ৫ শতাধিক কলেজ ঢুকল বা তাদের ঢুকানো হল মাত্র একটি বহুতলবিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভেতর—যার শরীরে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি যুক্ত করা হলেও এর প্রশাসন, পর্ষদ পরিচালনা, কার্যক্রম, শিক্ষাক্রম, জনবল ইত্যাদির কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় ধারণার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি। নতুন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটি দিন দিনই আর-একটি কেরানিনির্ভর স্নাতক শিক্ষা বোর্ডে পরিণত হয়ে উঠল যে তা আমরা কেউ বিবেচনায় নিলাম না।

আমাদের দেশে সরকারি অর্থায়নে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-বিষয়টি কর্তাব্যক্তিদের মাথা ও ধ্যানে লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে বাছবিচার না করে, আইন-নিয়মনীতি না মেনে, প্রতিষ্ঠানটিকে ৫০ বা ১০০ বছর অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে রেখে চিন্তাভাবনা না করে যত পারা যায় নিজের আত্মীয়স্বজন, অঞ্চল, দলীয় অনুগত ইত্যাদি বিবেচনায় লোক নিয়োগ দেওয়া। প্রতিষ্ঠান গড়ার একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে যেন চাকরি দেওয়া, লোক নিয়োগ করা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের হীনচিন্তার কতবড় শিকার তা সকলেরই জানা কথা। প্রথম উপাচার্য এম এ বারী উত্তরাঞ্চলের আহলে হাদিস নামক একটি সম্প্রদায়ের লোকদের এ প্রতিষ্ঠানে যথেচ্ছভাবে চাকরি দিয়েছেন। যারা চাকরি লাভ করেছেন তারা ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত হয়েছেন, বারী সাহেব তাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কী লাভ-ক্ষতি হল তা কেউ দেখল না।

এরপর লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়মনীতি ভঙ্গের সকল রেকর্ড অতিক্রম করলেন এককালের বিপ্লবী ছাত্রনেতা, পরবর্তী জীবনে 'ইসলামি আদর্শ ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের' ধারক-বাহক বলে খ্যাত অধ্যাপক আফতাব আহমদ। তিনি প্রায় ১৪/১৫শ লোক এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একাই নিয়োগ দিয়ে গেছেন। তার আমলে 'দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকায় কথিত (ভুয়া) একটি বিজ্ঞাপন দেখিয়ে ৭০০'র অধিক লোক নিয়োগ প্রদানের অভিযোগপত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তিনিও লোক নিয়োগদানের ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করেননি, প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা জানার চেষ্টা করেননি। মূলত জামাত, তারপর বিএনপি, নোয়াখালী, মিলন (শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী), গাজীপুর (জামাত-বিএনপির কয়েকজন নেতার কর্মী) ইত্যাদি পরিচয়ে এসব লোকের নিয়োগ প্রদান করে

www.pathagar.com

গেছেন। যোগ্যতা, অযোগ্যতা, নিয়মনীতি, সিনিয়রিটি জুনিয়রিটি ইত্যাদি অনেককিছুরই তোয়াক্কা করেননি। কাউকে ৬/৭টি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দিয়েছেন। কারো শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ম অনুযায়ী দেখা হয়নি। যাদের যোগ্যতা ছিল তারা নানা বিবেচনায় দারুণভাবে বঞ্চিত হলেন। আবার অনেকে যা নন, তার চাইতেও বেশি প্রাপ্তি নিয়ে পদ-পদবি তথা চেয়ার লাভ করলেন।

এ ধরনের তোঘলকি কাণ্ডকীর্তির পরিণতি একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য কী হতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কার্যত এ ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতিতে জন্ম নেওয়া একটি প্রতিষ্ঠান কোনোকালেই আর এর পঙ্গুত্ব অতিক্রম করতে পারে না। নানা গ্রুপ, দল ও গোষ্ঠী উক্ত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে চর-দখলের মানসিকতা নিয়েই জন্ম নেয়, বিরাজ করে, টিকে থাকার চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি যদি হয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় তা হলে তো কথাই নেই, এর আর মাথা তুলে দাঁড়ানোর কোনো উপায় থাকে না। একটি বিশ্ববিদ্যালয় মাথা তুলে দাঁড়াবে এর শিক্ষা তথা অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম দিয়ে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কার্যক্রম তো দিনদিন গৌণ হতে হতে এখন এর সেশনজট, দুর্নীতি, অনিয়ম অতীতের সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনকালের অবস্থানকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে। এর অন্যতম কারণ, ভেতর থেকে এটি বিশ্ববিদ্যালয়-কনসেপ্টকে ধারণ না করে মাথাভারী নানা স্বার্থগত গ্রুপ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-পরিচয়ের কেরানিনির্ভর বোর্ড অফিসের চরিত্র নিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল। যারা এখানে উপাচার্য হয়ে এসেছেন, তারা ১৬ বছরের এতসব অনিয়ম-দুর্নীতির কূলকিনার করতে পারেননি; তারা পরিবেষ্টিত হয়ে থেকেছেন ওইসব দল-গোষ্ঠী পরিচয়ের ব্যক্তিদের। এসবকে অতিক্রম করা, এড়িয়ে চলার সাধ্য কোনো উপাচার্যেরই ছিল না। নানা জটিলতা, কূটিলতা, অনিয়ম, দুর্বলতা, স্বার্থপরতায় প্রতিষ্ঠানটি যে-পর্যায়ে চলে গেছে সেখান থেকে এটিকে উদ্ধার করা, উদ্ধার করতে গিয়ে যে অপশক্তির চাপ পড়ে তাতে টিকে থাকা কতখানি কঠিন তা কেবল ভেতরের মানুষই বলতে পারেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স এরমধ্যে ১৬ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। দেশের ১৩/১৪শো ডিগ্রি কলেজ এখন এর অধীনে রয়েছে। অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম রয়েছে এমন কলেজের সংখ্যা ৩ শতাধিক। পাসকোর্সের ভবিষ্যৎ কী বলা মুশকিল। ছাত্রছাত্রীরা ওইসব ডিগ্রি থেকে দ্রুতই সরে যাচ্ছে। যে তিন শতাধিক কলেজে অনার্স মাস্টাস প্রোগ্রাম রয়েছে সেগুলোর বেশির ভাগই এখন করুণ অবস্থায় নিপতিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে লেজে-গোবরে অবস্থায় আছে। অন্তত ২ বছর সেশনজটে পিছিয়ে আছে তাদের পরীক্ষাগুলো। কলেজগুলোতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক স্বল্পতার কথা সকলেরই জানা কথা। এটি নিয়ন্ত্রণ করে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্ষমতা নেই শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার। দ্বৈত ক্ষমতার হাতে পড়েছে দেশের সরকারি কলেজগুলো। বেসরকারি ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ ও শিক্ষক

www.pathagar.com

নিয়োগবিধিতে বাধা পড়েছে। বস্তুত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সরকারি বেসরকারি কলেজসমূহ দিনদিনই শিক্ষাবিমুখ হয়ে উঠেছে, এগুলোর লেখাপড়ার মান কতটা নিচে নেমে যাচ্ছে তা মাঠপর্যায়ে তদারক করলে বিস্ময়ের অন্ত থাকবে না।

অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে দেশের আনাচে-কানাচে অসংখ্য বিবিএ, এমবিএ, বিএড, এমএড, কম্পিউটারসহ নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান অনুমোদন নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে যেগুলোর বেশিরভাগই শিক্ষার নামে সার্টিফেকেট কেনাবেচায় বসেছে বললে সত্যের অধিকতর কাছাকাছি থাকা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও পরিচালনা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। দেশে দিনদিন স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে সমস্যা প্রকটতর হয়ে উঠছে। গোটা দেশে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী এসব কলেজ ও 'বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ' নামক প্রতিষ্ঠানে পড়তে যাচ্ছে। কিন্তু মানসম্মত, পঠনপাঠন ছাড়াই চলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো। সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার যোগ্যতা, সময়, সুযোগ কোনোটিই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। সে কারণেই কথা উঠেছে : দেশে এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব নেই। অনার্স ও মাস্টার্স কলেজকে যেহেতু কোনো-না-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকতে হয়, সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয় (তা না হলে বিশ্বের কোথাও ডিগ্রির স্বীকৃতি পাবে না) তাই এসব কলেজকে নিকটবর্তী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত হতে দেওয়াটিই এখন সমীচীন হবে। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স অনুযায়ী ঐসব অধিভুক্ত কলেজের ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। এর জন্য শুধু প্রয়োজন হচ্ছে কলেজগুলোর অটোনমি ও নিজস্বতায় চলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনায় বেড়ে ওঠার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। এ ছাড়া অধিভুক্ত কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণা, উচ্চতর প্রশিক্ষণসহ শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়গুলো নিয়ে নতুন করে গুরুত্বের সঙ্গে ভাবার সময় এখন এসে গেছে। তা করা হলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, গবেষণা ইত্যাদির একটি প্রতিযোগিতায় পড়বে, তেমন প্রতিযোগিতার ধারায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন উপাচার্য প্রফেসর এম মোফাখখারুল ইসলাম নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করতে পারলে জাতি কতখানি উপকৃত হবে—তা সহজেই অনুমেয়। আমরা প্রফেসর ইসলামের কাছ থেকে তেমন উদ্যোগ আশা করব, সঙ্গে সঙ্গে তার সহযোগীও হব।

ভোরের কাগজ, ২৩ জুলাই ২০০৮

www.pathagar.com

নতুন শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে পুরাতন কিছু কথা

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান পুনর্গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের পর তাঁকে শিক্ষা ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দুটোই জাতীয় জীবনের বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন ও জটিল ক্ষেত্র। এ বছরের বাকি যে কয়েক মাস এই পুনর্গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বে থাকবে সেই সময়ে মাত্র একজন উপদেষ্টা উক্ত দুটো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে আমূল কোনো পরিবর্তন এনে দিতে পারবেন তেমনটি আশা করা ঠিক হবে না। তবে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে মন্ত্রণালয় দুটোতে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করার নীতি, পরিকল্পনা ও গতিপথ নির্ধারণ করা যেতে পারে। সেটিই হয়তো হতে পারে যুগান্তকারী ঘটনা। শিক্ষাব্যবস্থার একজন সামান্য মানুষ হিসেবে আমি আশা করি নতুন উপদেষ্টা নিজের মেধার সঙ্গে দেশের সৎ, মেধাবী, যোগ্য ও সৃজনশীল মানুষগুলোর চিন্তা ও অংশগ্রহণের সমন্বয় সাধনের একটি উদ্যোগ নেবেন এবং জরাজীর্ণ, একবিংশ শতাব্দীর জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন যা পরবর্তী সরকারসমূহ যুগোপযোগী করে এগিয়ে নেবে—এটিই সাধারণভাবে কাম্য।

বাংলাদেশটি ছোট হলেও স্বাধীনতার আগে এবং পরবর্তী ৩৭ বছরে এদেশে নানা বৈধ-অবৈধ ডালপালা নিয়ে যে তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থাটি গজিয়ে উঠেছে, দাঁড়িয়ে গেছে, তাকে একটি জটিল মস্তবড় সাম্রাজ্যের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। এর অভ্যন্তরে যেসব সমস্যা বিরাজ করছে তার কূলকিনারা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এমনটি ঘটেছে দেশে কোনো বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি নেই বলে। অথচ এই দেশে এ পর্যন্ত ৬টি শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি হয়েছিল। ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষানীতি সবচাইতে মৌলিক চিন্তা ও পরিকল্পনা নিয়ে দেশে একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার চমৎকার সব প্রস্তাব ও করণীয় নির্ধারণ করে দেওয়ার পরও দেশটাতে দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় অপর ৫টি শিক্ষা কমিশন গঠন, প্রতিবেদন জমাদান, এমনকি একটি প্রতিবেদন সংসদ কর্তৃক পাস হওয়ার পরও কোনো শিক্ষানীতিই দেশে এ পর্যন্ত কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

www.pathagar.com

শিক্ষা নিয়ে স্থূল রাজনীতি, দলবাজি, শিক্ষক সংগঠনবাজি, সেমিনারবাজি, বক্তৃতাবাজি, লেখালেখি ইত্যাদি সহ্যের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন নিচের দিকে যখন তাকাই তখন দেখা যাচ্ছে শিক্ষার নামে বৈধ-অবৈধ নানা ধারা-উপধারার প্রতিষ্ঠানে দেশটা ভরে গেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য মুখ্য হয়ে উঠেছে; দুর্নীতি, সার্টিফিকেটের লেনদেন—তা দিয়ে পদ-পদবি লাভ মুখ্য হয়ে উঠেছে। কোনোপ্রকার মৌলিক শিক্ষা নেই, গবেষণা নেই, মান নেই। বস্তুত শিক্ষা বলতে যে সৃজনশীল চিন্তা, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, গবেষণা, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্মেষ ও উদ্ভাবন ঘটানো—এর কিছু আমি অন্তত দেশের কোনো স্তরের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটাকেই এতদিনে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিতে দারুণভাবে সফল হয়েছি। এখন বিদ্যমান যে-কোনো ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের যেখানেই হাত দিন, হতাশ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে করণীয় কী? উত্তর হচ্ছে—সকল স্তরের সবধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থাগুলো চিহ্নিত করে একটি মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসেবে সবকটি স্তরকেই ঢেলে সাজাতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, পাঠক্রম, শিক্ষক, অর্থায়ন, পরিচালনা এবং পরিবীক্ষণের দিকগুলো শক্ত আইনগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতেই হবে। এর কোনো বিকল্প আমি অন্তত খুঁজে পাই না।

আমাদের দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গত তিন দশকে যেভাবে গজিয়ে উঠেছে তা কিসের ভিত্তিতে কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে, কোন্ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে এবং কোন্ ধরনের শিক্ষাক্রমের আওতায় হয়েছে, হচ্ছে, তা কেউ বলতে পারবে না। অথচ দেশে অসংখ্য তথাকথিত কেজি স্কুল গড়ে উঠেছে যেখানে শুধু বিত্তবানের শিশুরা 'পড়তে' যাচ্ছে; দেশের বিত্তহীনদের শিশুদের জন্য কোনো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নেই। বইপুস্তকেও নেই কোনো শিশুতোষ চিন্তা। গোটা প্রাক-প্রাথমিক তথাকথিত শিক্ষাব্যবস্থাই চলছে উদ্যোক্তাদের মর্জি, আর্থিক ও রাজনৈতিক বিবেচনামতো। গোড়াতেই এতবড় গলদ, অন্যায়, বৈষম্য, যুক্তিহীন অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা দিয়ে আর যাই হোক শিক্ষা অন্তত অর্জিত হওয়ার নয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় কত ধরনের ধারা-উপধারা বিরাজ করছে-এর কোনো ইয়ত্তা নেই। সরকারি, বেসরকারি, মাদ্রাসা, এনজিও ইত্যাদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একইভাবে মাধ্যমিক স্তরেও এসব বিভিন্ন নামধারী স্কুল ও মাদ্রাসা বিরাজ করছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের তারতম্য এতটাই প্রকট যে এখন আর গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধান টানা যাচ্ছে না, টানতে হচ্ছে এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য প্রতিষ্ঠানের। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে এখন আর আগের মতো যথেষ্ট

www.pathagar.com

সংখ্যক মেধাবী ছেলেমেয়ে বের হয়ে আসতে পারছে না, শহরের স্কুলশিক্ষাও এখন ব্যাচ, কোচিং এবং পরীক্ষানির্ভর হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ এবং বিশ্লেষণাত্মক গুণাগুণ লুপ্ত হতে বসেছে।

উচ্চমাধ্যমিক তথা কলেজশিক্ষার ঠাঁই মাধ্যমিকেও নেই, উচ্চস্তরেও নেই। এটি এখন যাঁতাকলের নিচে চাপা পড়ে পিষ্ট হচ্ছে। এর শিক্ষাক্রমটি মাধ্যমিককে সমৃদ্ধ করছে না; নানা শাখাপ্রশাখা, উপশাখায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে উঠেছে। এটি উচ্চতর শিক্ষারও কোনো ভিত্তি তৈরি করছে না। এখানেও চলছে পাঠক্রম, পাঠদানের মারাত্মক সমস্যা। প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চলার জন্য কিছু কিছু সরকারি নিয়ম থাকলেও ঘুষ, দুর্নীতি, দলবাজি, এলাকার প্রভাব, ব্যক্তির প্রভাব, নিয়োগ বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদির কারণে মেধাবীরা এসব স্তরে শিক্ষক হতে সুযোগ খুব একটা পায় না। নীতিমালা, আইনকানুনগুলোও বেশ জটিল; শিক্ষাবান্ধব তো নয়ই, প্রতিবন্ধকই বটে।

পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু কখনো বেশ ভারী, কখনো যুক্তিহীন; বিজ্ঞানচিন্তা থেকে কয়েক শতাব্দী দূরের, সাম্প্রদায়িক; জাতি গঠন নয়, অনাবশ্যকভাবে ধর্মকে যত্রতত্র টেনে আনায় বিব্রতকর; ইতিহাসবিকৃতিতে দুষ্ট—এসব নানা সমস্যায় পীড়িত ও আক্রান্ত, যা কোনো শিক্ষার্থীর মধ্যেই প্রকৃত শিক্ষার আলো সঞ্চারিত করে না। নানা ধারা-উপধারার পাঠ্য, সহপাঠ্য, অপাঠ্য পুস্তকে আমাদের মাদ্রাসা, স্কুল ও উচ্চমাধ্যমিক কলেজ শিক্ষাভারাক্রান্ত, যা অনেকটাই শিক্ষার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এই পর্যায়ে শিক্ষক সংকট যে কতটা প্রকট তা পরিসরের অভাবে লেখা গেল না। তবে মেধাবীদের শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করা না গেলে নতুন করে মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী সৃষ্টি হবে না একথা কাউকে বলতে হবে না, বোঝাতেও হবে না। কিন্তু শিক্ষকদের যে বেতনকাঠামো, পদোন্নতির সমস্যা, স্বাধীনসত্তা বিরোধী বাস্তবতা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরাজ করছে তা দিয়ে মানসম্মত শিক্ষার কোনো আশাই করা যায় না।

উচ্চশিক্ষার সুযোগ কোনো দেশেই বেশি মানুষের জন্যে থাকে না। কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক তথা সর্বজনীন শিক্ষার সংজ্ঞায় যে স্তরগুলো থাকে সেখানে শিক্ষার সমস্যা বহুমাত্রিক, বেশির ভাগ মানুষই সেই শিক্ষা পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার রাখে। রাষ্ট্রও প্রচুর অর্থ প্রতিবছর ব্যয় করে থাকে। আমি বলছি না—এটি পর্যাপ্ত, মোটেও তা নয়। কিন্তু যত টাকা খরচ করা হচ্ছে তার কত অংশ শিক্ষাব্যবস্থার যথার্থ উন্নয়নে লাগছে তার একটি ধারণা থাকা দরকার। আমরা প্রতিবছর সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ শিক্ষাখাতে দিচ্ছি বলে গালভরে, তারস্বরে বলছি। এত অর্থই যদি খরচ করা হয়ে থাকে তাহলে শিক্ষাব্যবস্থার এমন বেহাল ও বিপর্যয়কর অবস্থা হল কেন? হ্যাঁ, পয়সা আমরা খরচ করছি এতে কোনো সন্দেহ

www.pathagar.com

নেই। কিন্তু সেটি শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের চাইতে ব্যক্তির আয়-উন্নতি, দালানবাড়ি নির্মাণ, অফিস-কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাতেই চলে যায়। যে অর্থ সরকার শিক্ষাখাতে খরচ করে, তার চাইতে ঢের বেশি অর্থ অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য খরচ করছে। সরকারি কোষাগারের অর্থের সঙ্গে ব্যক্তিপর্যায়ে ব্যয়িত অর্থের যোগফলের পর মোট যে-অর্থ শিক্ষাখাতে ব্যয় হচ্ছে তার ফলাফল কী? আমরা তো অধঃগতি ছাড়া ঊর্ধ্বমুখী কোনো প্রবণতা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

উচ্চশিক্ষার কথা আমরা বলি, দাবিও করি। কিন্তু সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি নামে যে শত শত প্রতিষ্ঠান দেশে গড়ে উঠেছে এগুলোর কটিকে উচ্চশিক্ষার মানদণ্ডে বিবেচনা করা যাবে? উচ্চশিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গবেষণা ও সৃজনশীলতা। আমাদের কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন গবেষণা করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা কয়েকটি রুটিন মাফিক ক্লাস করি, পরীক্ষা নিই, সনদপত্র তুলে দিই ছাত্রছাত্রীদের হাতে। দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমফিল, পিএইচডি গবেষণা চালু করে এগুলোর মান নামিয়ে দিয়েছি বাজারের তামাক-বিড়ি-সিগারেটেরও নিচে। অবিলম্বে এগুলো বন্ধ করে নতুনভাবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে চালু না করলে অচিরেই এদেশের সাধারণ মানুষ ঐসব ডিগ্রিধারীদের নিয়ে তিরস্কার করবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

দেশে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, অথচ যোগ্য শিক্ষক নেই কোথাও। যে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যদিয়ে আমাদের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বেড়ে ওঠে সেই শিক্ষাব্যবস্থাই তাদের মেধাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, তারা বেড়ে উঠছে গৎবাঁধা একজন শিক্ষার্থী হিসেবে। হ্যাঁ, তারা প্রথম শ্রেণী পাচ্ছে। কিন্তু ভূরিভূরি জিপিএ-৫, প্রথম শ্রেণী দেখে আমরা উল্লসিত হলেও বলতে দ্বিধা নেই একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষার মান, মূল্যবোধ, সমাজ, রাষ্ট্র, জগৎ ও বিশ্বচিন্তাকে ধারণ করার তেমন কৃতিত্ব, লক্ষণ ও প্রবণতা তাতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না। দেখার আশা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে।

দেশে আসলে আমরা কী সৃষ্টি করছি, প্রশ্ন করা হলে এর কোনো সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে কি? ১৫ কোটি মানুষের এই দেশে ১৫ জন আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বিজ্ঞানীর নাম গর্ব করে উচ্চারণ করার কথা ভাবতে পারি না, এমন বাস্তবতার পরও আমাদের বোধোদয়ের কোনো লক্ষণ দেখি না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত কূপমণ্ডূকতা, দলবাজি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা দুর্নীতি, মিথ্যার বেসাতি, নিয়োগ বাণিজ্য ইত্যাদিকেই পুষ্ট হতে দেখি।

www.pathagar.com

না, এদেশে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও মুক্তচিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা, উদার গণতান্ত্রিক চিন্তা ও মূল্যবোধে পরিচালিত হওয়ার শিক্ষা ও দীক্ষা নিয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আমার এ-ধরনের মন্তব্যে আমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু এই কষ্ট নিয়েই সত্যকে স্বীকার করছি একটি আশা বুকে নিয়ে, তা হল : আমাদের ঘুণে ধরা, অচল শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি কার্যকর করার উদ্যোগ আমাদের নিতে হবেই। তা না হলে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা থেকে নতুন প্রজন্ম আরো বেশি বঞ্চিত ও প্রতারিত হবে; জ্ঞান-বিজ্ঞানবিমুখ এবং বিরোধী হয়ে ওঠবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে আর সময় নষ্ট না করে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ এখনই নিতে অনুরোধ করব। কথাগুলো বেশ পুরোনো, তবুও নতুন উপদেষ্টার কাছে নতুনভাবে বলা।

ভোরের কাগজ, ১৬ জানুয়ারি ২০০৮

www.pathagar.com

সব কলেজ সেরা কবে হবে?

গত ২৬ আগস্ট (২০০৭) দেশের ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি, এক মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম. ফাজিল ও কামিল এবং এক কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসির পরীক্ষার ফল একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর ৭টি সাধারণ বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৬৪.২৭, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের শতকরা পাসের হার যথাক্রমে ৭৪.৩১ এবং ৬৮.১৩। মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা পাসের দৌড়ে অন্যদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে অর্থাৎ এইচএসসির চেয়ে ৪ শতাংশ বেশি। জানি না এর সঙ্গে লেখাপড়ার মান বা মেধা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ। তবে দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের দেশের মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা পাসের দৌড়ে বা প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে এভাবে বেশি বেশি লাভবান হয়ে আসছে। কিন্তু বাস্তব জীবন বা কর্মক্ষেত্রে এর প্রতিফলন আদৌ ঘটে কিনা, প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা, তা নিয়ে মিলিয়ন প্রশ্ন জমা হয়ে আছে। এটা কেউ পরখ করে দেখছে না, সেভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এভাবে লেখাপড়ার মান বৃদ্ধি বা শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ কখনও ঘটবে না—এই সত্য যতদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মহল উপলব্ধি না করবে, ব্যবস্থা গ্রহণ না করবে, ততদিন বোধহয় তেমন মহৎ কিছু অর্জিত হবে না।

এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বোর্ডগুলোর পক্ষ থেকে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একধাপ অগ্রগতি হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পত্রপত্রিকাগুলোতে নানা উদ্দীপনামূলক শিরোনামে অভিষিক্ত করা হয়েছে। কেউবা 'সাফল্যের বিস্ফোরণ', কেউবা 'মেধাবীদের সংখ্যা বেড়েছে' বলে লাল কালিতে শিরোনাম করেছে। সঙ্গে শহরের বিভিন্ন শীর্ষ কলেজের কৃতী উৎফুল্ল ছাত্রছাত্রীদের ছবি ছাপিয়েছে। বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো ঢাকা শহরের সেরা কলেজগুলোর ছাত্রছাত্রীদের আনন্দনৃত্য এবং বৃষ্টিভেজা উল্লাসের নানা ছবি প্রদর্শন করেছে; ছাত্রছাত্রী, অধ্যক্ষ, অভিভাবকদের কিছু অভিমত ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশের প্রচারমাধ্যমগুলো এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এভাবেই ভূমিকা রেখে আসছে। পত্রপত্রিকাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অনুসন্ধানী তথ্যভিত্তিক কিছু প্রতিবেদনও প্রকাশ

www.pathagar.com

করে থাকে। এসব প্রতিবেদন ওই স্তরের শিক্ষার অগ্রগতি, ব্যর্থতা ও সমস্যার সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপনের জন্য যথেষ্ট না হলেও পাঠকদের চিন্তার খোরাক জোগাতে বরাবরই কমবেশি ভূমিকা রেখে থাকে। এ বছরও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট স্তরের শিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে পরিকল্পিতভাবে কাজ করলে তবেই কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতি সাধন সম্ভব।

এ বছর ৭টি বোর্ডের অধীনে ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮৩৫ শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, এর মধ্যে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ জন পাস করেছে। এদের মধ্যে ১০,২০৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। মাদ্রাসা বোর্ডের শুধু আলিম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে ৫১ হাজার ৬২৩, উত্তীর্ণ হয়েছে ৩৮ হাজার ৬৮১, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৩০ জন। ফাজিল পরীক্ষায় ১৮ হাজার ৭০৩ জনের মধ্যে ১৪ হাজার ৬৫৫ জন পাস করেছে, এর মধ্যে ৭.১১১ জন প্রথম বিভাগে পাস করেছে। কামিল পরীক্ষায় ১০ হাজার ১৯৬ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯ হাজার ৯২৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ৫,১৬২ জন. পাসের হার ৯৭ দশমিক ৩৭। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ৪৯ হাজার ৭০০ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩ হাজার ৮৬৩ জন পাস করেছে। মাত্র ৫ পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে।

এ তথ্যগুলো অনেক দিক থেকেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন যে ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮৩৫ ছাত্রছাত্রী এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে তারা সবাই ২ বছর আগে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেছে। একটি বড় ধরনের পাবলিক পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সেখানে ১০ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্য থেকে তারা পাস করেছে। এরপর দুবছর কলেজে পড়েই তারা এইচএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। দেখা গেছে, ৪ লাখ ৩১ হাজার ৮৩৫ জনের মধ্যে ১,৫৪, ২৩২ পরীক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সংখ্যাটিকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। এত বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর বেশিরভাগই গ্রাম-গঞ্জে, ছোট-বড় শহরে, এমনকি ঢাকা শহরে অবস্থিত বিভিন্ন কলেজে পড়াশোনা করেছে।

দেশে এখন সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ২০০০-এর অধিক কলেজ রয়েছে। শহরে এর বাইরেও অসংখ্য 'স্কুল অ্যান্ড কলেজ' নামক উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে ব্যাপকসংখ্যক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। কিন্তু ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, ক্যাডেট কলেজগুলো, ঢাকা শহরের ১০-১৫টি বিশেষ কলেজ, স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকার বাইরে প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অনুরূপ ২/৩টি এবং জেলা শহরে ২/১টি কলেজের ফল আলোচনায় উঠে আসে। বেশিরভাগ মফস্বল এলাকার কলেজের ফল হতাশাজনক, সামান্যই মানুষজনকে আশাবাদী করে

www.pathagar.com

থাকে। অপরদিকে ঢাকায় যে কয়টি কলেজের নাম ঘুরেফিরে উঠে আসে সেসব কলেজ বা স্কুল অ্যান্ড কলেজ কী কারণে সেরা কলেজ হিসেবে বিবেচিত হয়?

কোনো দেশে হাজার হাজার কলেজের মধ্য থেকে ২-৩শত কলেজের মধ্যেই যত কৃতী ছাত্রছাত্রী সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, ভালো ফল যদি ওই ২-৩শত কলেজের মধ্যেই আটকে পড়ে, এর বাইরে আসার কোনো উদ্যোগ যদি না থাকে তাহলে শিক্ষাজীবনে মেধার বিকাশ ঘটানো বা সাফল্যকে ছড়িয়ে দেয়া মোটেও সম্ভব হবে না—এ কথাটি নীতিনির্ধারকদের গুরুত্বের সঙ্গে বুঝতে হবে। এরপরও কথা থেকে যাচ্ছে। যেসব স্কুল এবং কলেজ সেরা স্কুল বা কলেজ বলে প্রতিবছর খ্যাতি অর্জন করছে, তারাই বা কতটুকু প্রকৃত শিক্ষা দিচ্ছে বা দিতে পারছে—এসব প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ধরুন, আমরা ঢাকা শহরে যেসব স্কুল বা কলেজের নাম সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করছি তারা কী কারণে সেরা হতে পেরেছে তা একটু তলিয়ে দেখা উচিত।

আমি কোনো স্কুল বা কলেজের নাম উল্লেখ করছি না সঙ্গত কারণেই। তবে বলতে দ্বিধা নেই, ওইসব স্কুল বা কলেজের অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা এককথায় ভালো। এর জন্য যে-অর্থ তাদের প্রয়োজন ছিল তা তারা সরকার বা অন্য যে-কোনো সংস্থার কাছ থেকে লাভ করেছে, প্রভাবশালী মহলের কাছ থেকেও পেয়ে আসছে। তাছাড়া যে-পরিমাণ অর্থ ওইসব প্রতিষ্ঠান (দু-একটি বাদে) ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে তা অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে গোটা দেশের ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের দৃষ্টিটা নিবদ্ধ করার একটা বাস্তবতা তৈরি করা হয়েছে—যার ফলে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল এবং কৃতী ছাত্রছাত্রীরা ঢাকার ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হচ্ছে, লেখাপড়া করছে। তাদের লেখাপড়ার পেছনে অভিভাবকরা যে-পরিমাণ অর্থ ও মনোযোগ বিনিয়োগ করে থাকেন তা সারাদেশে সচরাচর দেখা যায় না। প্রতিষ্ঠানগুলোও এই সুযোগটাকে কাজে লাগাচ্ছে। হ্যাঁ, তারা ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পাঠদানের বাধ্যবাধকতায় আনতে পারছে। তাদের যথেষ্টসংখ্যক যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক রয়েছেন—শিক্ষকদের ভালো বেতন দেয়ার ক্ষমতাও তাদের রয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক স্কুল বা কলেজই যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বাড়তি সুযোগসুবিধা দিচ্ছে না। ফলে ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক শিক্ষকই শ্রেণী পাঠদানের চেয়ে গৃহশিক্ষকতায় অনেকটা ব্যস্ত। আমার অভিজ্ঞতা বলে, ব্যতিক্রম দু-একটি স্কুল বা কলেজ ব্যতীত বেশিরভাগ নামিদামি স্কুল ও কলেজই ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় তথাকথিত ভালো ফল করার জন্য যতখানি গাইড করা বা উপদেশ দেয়া প্রয়োজন ততখানিই করে থাকে; কিন্তু শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের

www.pathagar.com

গভীরে বিচার-বিশ্লেষণকে আত্মস্থ করার শিক্ষা আমাদের খুব কমসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকই দিয়ে থাকেন। এই ঘাটতি বা অভাবটা আমরা ধরতে পারি যখন ওইসব ছেলেমেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। খুব সামান্যসংখ্যক ছেলেমেয়েই বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণসহ জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা লাভ করে থাকে। এই ব্যর্থতা গোটা শিক্ষাব্যবস্থার। ওইসব প্রতিষ্ঠানকে আমি সেজন্য অভিযুক্ত করছি না। তবে একটি দেশে ২-৩ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে যখন গুটিকতক 'সেরা' প্রতিষ্ঠান বলে প্রচার পায়, খ্যাতি অর্জন করে, তখন গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটিই ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু প্রতিষ্ঠান নয়, মানসম্মত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করা হলে প্রতি বছর লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী এসএসসি, এইচএসসিসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় শুধু অকৃতকার্যই হবে না, যারা কৃতকার্য হবে তাদেরও বেশিরভাগ উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে সার্থক হবে না। দেশের মুষ্টিময় নয়, সব স্কুল বা কলেজই যেন শিক্ষাদীক্ষায় সেরা হয়ে উঠতে পারে, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের প্রতি সবাইকে যেন ঝুঁকে পড়তে না হয়, ঢাকায় ছুটে আসতে না হয়, বাসাবাড়ি ভাড়া করে থাকতে না হয়—সে কথা ভাবতে হবে, সেভাবেই দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।

প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আমি যখন মাত্র কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের উল্লাস প্রকাশ করতে দেখি, তখন আমার মনের পর্দায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদেব ছবিও ভেসে ওঠে। তারা যে ওইভাবে কৃতী ছাত্রছাত্রী হয়ে উঠতে পারছে না, আনন্দ প্রকাশ করতে পারছে না—এটি আমাকে বেশি কষ্ট দেয়, ভাবিয়ে তোলে। একই সঙ্গে উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের জানা-শেখা লেখাপড়ার সীমাবদ্ধতা দেখে অনেকটাই থিতু, মূঢ় এবং নির্বিকার হয়ে পড়ি। আমরা আমাদের সম্ভাবনাময় মেধাবী প্রজন্মকে কতভাবে বঞ্চিত করছি, বৈষম্যে বিভক্ত করছি, তাদের মেধার সম্ভাবনাকে নিচের শ্রেণীতেই নস্যাৎ করে দিচ্ছি—তা যদি এখনও ভাবা না হয়, উদ্যোগ নেয়া না হয়, তাহলে বাংলাদেশ শুধু শিক্ষাদীক্ষায় নয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবেও দক্ষ জনশক্তির দেশে পরিণত হবে না—এটি প্রায় নিশ্চিত বলে দেয়া যায়। এখন সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেই কীভাবে সরকার সেরা প্রতিষ্ঠানে গড়ে তুলবে।

যুগান্তর, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৭

www.pathagar.com

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিযুদ্ধ যখন মহাযুদ্ধ

১৯৯৩-৯৪ সালের দিকে স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ নিয়ে *ভোরের কাগজে* আমি বেশকিছু লেখা লিখি। এরপরেও অনুরূপ লেখা কয়েকবার লিখেছি। মূলত পত্রপত্রিকায় বছরের শুরুতে স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ নিয়ে তখন যেসব ছবি ও প্রতিবেদন ছাপা হত এবং আমার নিজের ও নিকটজনদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি-সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে ঐসব লেখার তাগিদ অনুভব করি। আমি অবশ্য তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতাম। শহর থেকে এবং ক্যাম্পাসের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন, ছবি দেখে এ সমস্যাটি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা তৈরি করতে যাচ্ছে—এ ধরনের অভিমত রেখে করণীয় কিছু উদ্যোগ নিতেই লেখাগুলো লিখেছিলাম। কিন্তু এদেশে লেখালেখিকে কর্তৃপক্ষ কতটা গুরুত্ব দেয় তা নিয়ে আমার সন্দেহ কখনোই দূরীভূত হয়নি। তারপরও বিবেকের তাড়নায় লিখি—যদি কর্তৃপক্ষ কখনো সাড়া দেয় সেই প্রত্যাশায়।

নব্বইয়ের দশকে ভর্তিযুদ্ধের বিষয়টি রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক এবং দু-চারটা বড় শহরে ভালো স্কুলে শিশুদের ভর্তি করানো নিয়ে অস্বাভাবিক ভিড়কে বোঝানো হত। একটু অবস্থাপন্ন অভিভাবকগণ তখন ঢাকা বা বড় বড় শহরের কিছু নামিদামি স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে ভিড় জমাতেন, এতে স্কুলগুলোর ওপর চাপ বেড়ে যেত, স্কুল-কর্তৃপক্ষ তখন ছাত্র ভর্তি করাতে গিয়ে মেধা-যাচাইয়ের নামে এক্‌ধরনের ভর্তিপরীক্ষার আয়োজন করে। ক্রমে বিষয়টি মওকায় পরিণত হয়। এর সঙ্গে ডোনেশন, শিক্ষকদের ব্যাচ পড়ানোর নামে বাড়তি আয়, কোচিং সেন্টার খোলা, গাইড বই প্রকাশ করা ইত্যাদির চাহিদা ও সরবরাহও বেড়ে যায়। বিষয়টির সঙ্গে শিক্ষার আদর্শ, নীতি-নৈতিকতার পদস্খলনও ঘটতে থাকে। একজন ৪/৫ বছরের শিশু ভর্তিপরীক্ষা দেবে, ভর্তিপরীক্ষা দিয়ে তাকে স্কুলে ভর্তি হতে হবে—একথা ভাবাই যায় না। পৃথিবীর কোনো সভ্যদেশের শিক্ষাবিভাগ তা কোনোমতেই সমর্থন করবে বলে আমি মনে করি না। তাদের বরং মাথায় বাজ পড়বে এমন সংবাদ শুনলে। কিন্তু তাদের মাথায় বাজ পড়ুক, হিমালয় ভেঙে পড়ুক, আমাদের তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। আমরা সোনার হরিণ খুঁজতে রোবটের হরিণ পেলেও মন্দ কী!

www.pathagar.com

গত দুই দশকে আমাদের দেশে অনেককিছুর সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তির যুদ্ধটি মহাযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। এখন শুধু ৪/৫ বছরের শিশুদের বেলাতেই নয়, ১৯/২০ বছরের ছেলেমেয়েদের মেডিকেল, প্রকৌশল, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়েও ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের নাকাল হতে হচ্ছে, প্রচণ্ড যুদ্ধে নামতে হচ্ছে, অর্থকড়ি খরচ করতে হচ্ছে। যে যুদ্ধটি তাদের শুরু হয়েছে কেজি ওয়ানে ভর্তি নিয়ে তা এখন ছড়িয়ে পড়ছে ভালো প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চমাধ্যমিক কলেজ এবং উচ্চতর শিক্ষার একটি সাধারণ মানসম্মত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েও। ভর্তির যুদ্ধটি যেন তাদের জীবন থেকে কিছুতেই অপসারিত হচ্ছে না, জীবনেও তাই স্বস্তি ফিরে আসছে না। ক্রমে এই যুদ্ধ এতটাই ছড়িয়ে পড়েছে যে, এটিকে এখন এর বিস্তার, গভীরতা ও জটিলতার দিক থেকে আমি একটি মহাযুদ্ধের সঙ্গেই তুলনা করতে পারি। এমনটি কোনো অবস্থাতেই কাম্য হতে পারে না। এ ধরনের ভর্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে মেধার উন্মেষ বা বিকাশ ঘটানো মোটের ওপর অসম্ভব। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু সেই প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে হলেই যাচাই-বাছাই সুষ্ঠু বা স্বাভাবিক হওয়ার নয়। এতে বঞ্চিত হয় প্রকৃত মেধাবীরাও। বিষয়টি বেশ দীর্ঘ আলোচনা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে। পরিসরের কারণে তা এখানে করা সম্ভব হবে না। তবুও সংক্ষেপে আমার ভাবনাগুলো তুলে ধরছি।

এই মুহূর্তে দেশে স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিপরীক্ষা চলছে। কতগুলো সাধারণ প্রপঞ্চ লক্ষ করার মতো। শহরগুলোতে হরেক রকমের অসংখ্য কেজি স্কুল, বেসরকারি, সরকারি স্কুল রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা শহরগুলোতে নানা নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখন মোটেও কম নয়। কিন্তু মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র। তা ছাড়া যতটা নামিদামি শোনা যায়, বাস্তবে লেখাপড়ার পরিবেশ, শিক্ষক সংকট, সীমাহীন অর্থকড়ি আদায়ের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ভয়ানক নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে, আস্থার সংকট চলছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবকগণ ভালো ফলাফল যে কটা প্রতিষ্ঠান করছে এমন স্কুলের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, ছুটছেন। ঝুঁকে পড়তে তারা বাধ্য হচ্ছেন। কেন হচ্ছেন? কারণ, তাদের পাশের যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে সেগুলোর প্রতি আস্থা স্থাপন করা যাচ্ছে না।

শহরাঞ্চলে যেসব কেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলোর বেশিরভাগই ভাড়াবাড়িতে অবিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত; সেগুলোর পাঠক্রম, শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে; অর্থকড়িরও কোনো বালাই নেই। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো চলছে মেইল ট্রেনের মতো, এতে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের কোনো বালাই নেই, পাঠদানের মান নেমে গেছে, তা ওঠানোর

www.pathagar.com

কোনো চেষ্টাই নেই। বেসরকারি স্কুলের নামে এখন এতসব বাহারি নামের স্কুল যত্রতত্র গড়ে উঠেছে সেগুলোর মধ্যে হাতেগোনা দু-চারটাকে পাওয়া যায় যাদের পাঠদান, শিক্ষাক্রম অন্যদের চাইতে কিছুটা স্বতন্ত্র। সেগুলোর দিকেই মানুষ ঝুঁকছে, ছুটছে। সে কারণেই ঐসব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের এবং শিশুদের যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে। যুদ্ধটাও হয় অনেকপ্রকারের। বছরখানেক আগে থেকেই কোচিং এবং ব্যাচে পড়ানোর জন্য শিক্ষক ধরা, অর্থ খরচ করা—মোটেও চারটেখানি কথা নয়। অথচ বাড়ির পাশেই স্কুল আছে যেগুলোতে ডেকে ডেকে ভর্তি করানো হচ্ছে।

আসলে ভর্তিযুদ্ধ হচ্ছে তথাকথিত গুটিকতক নামিদামি স্কুলকে কেন্দ্র করে। অন্য স্কুলগুলোতে ভর্তি নিয়ে উত্তাপ কোথায়? আমি বলছি না, এগুলোর মধ্যে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একেবারেই নেই। তা বলা যাবে না। কিছু কিছু স্কুল ভালো করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু শহরাঞ্চলে এখন একটি স্কুলের জায়গা পাওয়া, সরকারি শর্ত পূরণ করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। ফলে নানা সমস্যায় পড়ছে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠান। সরকারি অনুমোদনহীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দায়িত্বশীল, আবার দায়িত্বহীন প্রতিষ্ঠানও রয়েছে ভূরিভূরি।

আজকাল বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে মৌলবাদী রাজনৈতিক একটি দলের পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেগুলোতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে লাভবানের উদ্দেশ্য মুখ্য হয়ে উঠেছে। বস্তুত নগরবাসীরা সত্যিসত্যিই প্রকৃত পাঠদানের উপযোগী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অভাব প্রত্যক্ষ করছেন। উন্নত দুনিয়ায় নগরায়ন বলতে এলাকাভিত্তিক জনসংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও একটি আবশ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকে। সেভাবেই প্রতিটি লোকালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকে—যেগুলোর শিক্ষার পরিবেশ, অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা, শিক্ষাক্রম প্রায় অভিন্ন। এক লোকালয়ের শিশু-কিশোর-যুবকদের অন্য লোকালয়ে পড়তে যেতে হয় না, যাওয়ার বিধানও নেই। বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা বা পাঠদানে তেমন তারতম্য ঘটে না। অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকের মানও প্রায় অভিন্ন পর্যায়ে থাকে। ফলে কাউকে নিজস্ব আবাসিক এলাকা ছেড়ে অন্যত্র স্কুলের সন্ধান করতে হয় না। কিন্তু আমাদের এখানে এখন ছেলেমেয়েদের ভর্তির ওপর নির্ভর করে বাসাবাড়িও খোঁজা হয়ে থাকে, অভিভাবকদের থাকার কথা ভাবতে হয়। এটি পরিবারগুলোর উপর যেমন বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে, গোটা শহরের ওপরও নানা ধরনের চাপ বাড়িয়ে দেয়। অথচ সরকারি হোক, বেসরকারি হোক—সব ধরনের স্কুলের লেখাপড়ার মান যদি সমানভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেত তাহলে শহরের জীবনযাত্রার ওপরও একটা সুস্থ স্বাভাবিক প্রভাব পড়ত। একইভাবে উচ্চমাধ্যমিক কলেজ নিয়েও সমস্যা প্রকট

www.pathagar.com

হয়ে উঠেছে। অতীতের ঐতিহ্যবাহী সরকারি কলেজগুলোর মান হারিয়ে গেছে। নিজেদের আত্মীয়স্বজন, স্ত্রীদের যদি তদবির-প্রভাব খাটিয়ে এভাবে ঢাকা বা বড় বড় শহরকেন্দ্রিক কলেজগুলোতে পোস্টিং দেওয়া হয় তা হলে পড়াশোনার মান তলিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কী?

গ্রামের কথা বললে আলাদা গ্রন্থ রচনা করতে হবে। এখন প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ২/১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ৩/৪টি গ্রাম মিলে একটি হাইস্কুল আছে, উপজেলায় একাধিক কলেজ আছে, মাদ্রাসা আছে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই। তবে কোথাও মানসম্মত লেখাপড়া নেই। এর হাজার একটি কারণ রয়েছে। কোথাও ছাত্র বেশি তো শিক্ষক কম, কোথাও শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা খুবই কম, প্রশিক্ষণ ২/১টি থাকলেও প্রয়োগ বলতে কিছুই নেই। অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা নেই। মাধ্যমিকের অবস্থাও বেশ করুণ। সবকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই বেসরকারি। এগুলোতে পরিচালনা পরিষদ নিয়ে হাজারো সমস্যা, সরকারি কর্মকর্তা (বোর্ড অফিস, ডিজি, ইউএনও)—এদের খবরদারির কোনো শেষ নেই। অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা, বিজ্ঞান, ব্যবসায় বাণিজ্য শাখার যোগ্য শিক্ষক ঐসব স্কুলে থাকবেন কোন্ সুখের আশায়? ফলে গ্রামের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কলেজ ইত্যাদি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ভর্তিযুদ্ধ নেই, প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষাও নেই। বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই চলছে গতানুগতিকভাবে। ঐসব ছাত্রছাত্রী নিকটস্থ কোনো উচ্চমাধ্যমিক কলেজে ভর্তি হয়, সেখানেই তাদের পড়াশোনা করতে হয়। খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী সেসব কলেজ থেকে কৃতী ছাত্র হিসেবে বের হয়ে আসে। যারা আসে তাদের মধ্যে যাদের পিতামাতার আর্থিক সঙ্গতি আছে তারা ঢাকাসহ বড় শহরের কোনো মেসবাড়িতে ওঠে, কোচিং সেন্টারে অভিভাবকদের টাকাপয়সা খরচ করে আসা-যাওয়া করে। শহর এবং মফস্বল এলাকা থেকে উঠে আসা এই ৫০-৬০ হাজার ছাত্রছাত্রী মেডিকেল, প্রকৌশল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তিপরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, ভর্তিযুদ্ধে নামে। এসব ভর্তিপরীক্ষা কতটা মেধাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বস্তুনিষ্ঠভাবে নির্ণয় করতে পারে, বিচার করতে পারে, আমার তাতে দারুণ সন্দেহ আছে। আবার যেসব জিপিএ প্রাপ্ত ভালো ফলাফল করে ছাত্রছাত্রীরা আসে তারা প্রচলিত পাবলিক পরীক্ষার জন্য হয়তো ভালো ফল করে থাকে। কিন্তু তাদের ওইসব ফলাফল উচ্চশিক্ষায় তাদেরকে কতখানি প্রস্তুত করেছে, সে-ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

আসলে আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন শ্রেণী বা স্তর থেকে সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথাও ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত লেখাপড়া বা শিক্ষালাভের প্রতি সুবিচার করতে পারিনি, তেমন দায়িত্ব নেইনি, অথচ দিনে দিনে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ও বাড়ছে, কিন্তু মানসম্মত পাঠদানে খ্যাতি

www.pathagar.com

আছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে পারিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আসনের বিপরীতে এখন শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তিপরীক্ষা দিচ্ছে। যে বা যারা ভর্তি পরীক্ষায় টিকছে সে বা তারা কি তাদের পছন্দের অথবা তাদের পূর্বপ্রস্তুতি রয়েছে এমন বিষয়ে ভর্তি হতে পারছে? আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা হল, প্রায় প্রতিটি ছাত্রছাত্রীই বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ববর্তী শিক্ষাজীবনে একভাবে চিন্তাভাবনা বা প্রস্তুতি নিয়েছে, কিন্তু উচ্চশিক্ষাতে এসে সে বা তারা মস্তবড় ধাক্কা খাচ্ছে। হতে চেয়েছিল ডাক্তার, ভাগ্যগুণে দর্শনবিভাগের একটি ভর্তি-ফরম পেয়ে খুশি থাকতে হচ্ছে! চাওয়া-পাওয়া, প্রস্তুতি, লেখাপড়া—এর কোনোটার সঙ্গে কোনোটারই খুব একটা মিল নেই। হাতেগোনা খুব কমসংখ্যক ছাত্রছাত্রীই এইম ইন লাইফ নির্মাণে সফল হয়। বেশিরভাগই, সম্ভবত তা ৯৮-৯৯ শতাংশই, সফল হতে পাচ্ছে না। আমাদের সম্ভাবনাময় শিশু, কিশোর, তরুণ ছাত্রছাত্রীদের এমন বিপর্যয় জাতীয় জীবনের জন্যই বড় ধরনের বিপর্যয় বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। এই বিপর্যয় ছোটখাটো সমস্যা থেকেই উৎপত্তি ঘটে, অবশেষে সেইসব সমস্যাই মহাবিপর্যয়ের মতো বিষয় ডেকে আনে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যুগ যুগ ধরে অবহেলা করার ফলে জাতির সম্ভাবনাময় প্রজন্ম শিক্ষাদীক্ষা লাভে দক্ষ, যোগ্য, মেধাবী, সৃজনশীল জনশক্তি ও মানুষরূপে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর প্রতিকারে যত দেরি করা হচ্ছে ক্ষতির পরিমাণও তত বেশি বেড়ে যাচ্ছে। এর আশু প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভোরের কাগজ, ২৩ জানুয়ারি ২০০৮

www.pathagar.com

রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় : শুরুটা যেন মানসম্পন্ন হয়

গত ২ মার্চ অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় 'রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ২০০৮' অনুমোদন দেওয়া হয়। মাত্র কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভায় রংপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার পর রংপুরের শিক্ষা-সচেতন মানুষ খুশি হলেও চটে গিয়েছিল ইসলামী ছাত্রশিবির নামক একটি ছাত্রসংগঠন। তারা কারমাইকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল দীর্ঘদিন থেকে। বলা চলে কারমাইকেল কলেজ চত্বর, ছাত্রাবাস, আশপাশ দখল করে ওই ছাত্রসংগঠনটি বহুবছর থেকেই রংপুরে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি আটকে দিয়েছিল; ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও সুধীমহলে বিভক্তি সৃষ্টি করে রেখেছিল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় দখলে রাখার ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন ছাত্রশিবিরের হিসাব-নিকাশ, প্রস্তুতি সবই চলে তাদের মূল রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ মদদে। তাদের অনেক পরিকল্পনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং প্রস্তুতি এর পেছনে থাকে। বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার চাইতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখলে রাখা, দলীয় ক্যাডার সমর্থকদের চাকরি দেওয়া, 'ইসলামি বিপ্লবে'র ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা, প্রকৃত জ্ঞানচর্চা থেকে ছাত্র-শিক্ষকদের দূরে রাখা—এর বাইরে তাদের অন্য কোনো মহৎ চিন্তা আছে, একজন শিক্ষক হিসেবে খুব কাছে থেকে আমি অন্তত কখনো ঐ সংগঠনের ছাত্র-শিক্ষক, নেতাকর্মীদের মধ্যে দেখিনি। রংপুরেও কারমাইকেলকে কেন্দ্র করে তেমন পরিকল্পনাই তাদের ছিল। সেটি সফল না হওয়ায় তারা কতটা হিংস্র হয়ে উঠেছিল তা কলেজ অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের বাসভবনে হামলা এবং আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা থেকে কিছুটা হলেও অনুমান করা যায়। তবে তাই বলে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় দখলে নিতে ঐ ছাত্রসংগঠন, তাদের রাজনৈতিক মুরব্বি সংগঠন দেরি করবে, ভুল করবে, বসে থাকবে—তেমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই।

রংপুরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ঐ অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের। পূর্ববর্তী সরকারসমূহ তা প্রতিষ্ঠা করতে কয়েকবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল, কিন্তু তারা কেউ কথা রাখেনি বা রাখতে পারেনি। নানা সমস্যা, টানাপড়েন, বাধা, আন্দোলনের হুমকি, আর্থিক সংকটের অভিযোগ, রাজনৈতিক

www.pathagar.com

হিসাব-নিকাশ (ভোটের) ইত্যাদি কারণে রংপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বেশ দ্রুততার সঙ্গে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অধ্যাদেশ পাস করেছে—এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। বাংলাদেশের সম্ভবত ২৯তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে যাচ্ছে রংপুরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হিসেবে এতে আমার যথেষ্ট খুশি হওয়ার কথা। এক অর্থে অবশ্যই আমি বেশ খুশি। তবে বেশকিছু গুরুতর এবং বাস্তব সমস্যার কথা শুরুতেই সরকার, ইউজিসি এবং রংপুর অঞ্চলের সুধীসমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতেই লেখাটি লিখছি।

আমাদের দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অন্তত বিশের অধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেগুলোর অবস্থা মোটেও ভালো নয়। অথচ এক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা গোটা পূর্ববাংলার অবস্থাকে দারুণভাবে পরিবর্তিত করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই অঞ্চলে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত, শিক্ষিত শ্রেণী-পেশার মানুষ গড়ে তুলতে অভূতপূর্ব সাহায্য করেছিল। এর অন্যতম কারণ ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অত্যন্ত মেধাবী, স্বনামধন্য সব শিক্ষকদের এনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে শুরু থেকেই কলকাতার সমমানে সমান্তরালভাবে পরিচালিত করা হয়েছিল। এর ফলে পূর্ববাংলার মানুষের আর তেমন একটা কলকাতায় উচ্চশিক্ষার জন্য নদী-খাল ভেঙে দল বেঁধে যেতে হয়নি। অথচ এখন ঢাকার বাইরে এতসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও কোনোটিই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামান্য প্রতিযোগিতায় আসতে পারছে না বা পারে না। এখনো ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নেয়, তারপর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়। কেন এমনটি হচ্ছে? তা হলে দেশব্যাপী ১৫/২০টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা থাকে কোথায়?

আসলে এতগুলোর মধ্যে কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ই মোটামুটি মানসম্মতভাবে শুরু হয়নি, সেভাবে গড়ে তোলা হয়নি। দিন দিন অধঃপতনই সেগুলোতে লক্ষ করা গেছে বা যাচ্ছে। কোথায় সেইসব জ্ঞানী-গুণী মেধাবী শিক্ষক, কোথায় শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগসুবিধা থাকা, যাতায়াতের মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ব্যবস্থা? প্রায় সবকটি আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন আঞ্চলিকতা ও রাজনৈতিক অপশক্তির হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে, ছাত্রশিবিরের দখলে চলে গেছে, ছাত্রশিবিরের ক্যাডারগণ ঐসব তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বিঘ্নে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী পদে নিয়োগ পাচ্ছে। আমার এমন মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য সরকার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, তাদের রাজনৈতিক পরিচয়, অবস্থান এবং কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান করে দেখতে পারে।

www.pathagar.com

যেসব উপাচার্যকে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের বেশিরভাগই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্য ছিলেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। বেশির ভাগই দলীয় আনুগত্যের বদৌলতে ঐ পদটি লাভ করেছিলেন। একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে কীভাবে মেধাবী শিক্ষক, দক্ষ কর্মকতা, কর্মচারী, আইন, নিয়মকানুন পাঠক্রম-শিক্ষাক্রম দিয়ে গড়ে তুলতে হয় তার অনেক কিছুই দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্যদের মিশন-ভিশনে লক্ষ্য করা যায়নি। তাদের বেশিরভাগেরই লক্ষ্য ছিল দলীয় লোকজনকে বেশি বেশি চাকরি দেওয়া, একচেটিয়া সমর্থক বৃদ্ধি করা, আত্মীয়স্বজন ও নিকটজনকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান করে দেওয়া। দেশের স্বনামধন্য কোনো শিক্ষককে বিভাগ খোলার জন্য এ পর্যন্ত আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। ঢাকায় একটি বড় আকারের কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিভিন্ন স্তরের কলেজশিক্ষকদের দিয়ে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালাতে হচ্ছে, এমন বিশ্ববিদ্যালয় কি কোনোকালে একটি মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার আশা করতে পারে? আমি অন্তত তেমন বাস্তবতা খুঁজে পাই না। নোয়াখালী, কুমিল্লা, ত্রিশাল, টাঙ্গাইল, জগন্নাথ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় কোনোকালে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে তেমন ভরসা করতে পারছি না। নতুন রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা কী হবে—জানি না। তবে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে যদি সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসি না ভাবে; বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্বটা যদি উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে না পড়ে; তাহলে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ও রংপুর অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের তালিকায় একদিন হয়তো দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে চলে যাবে।

আসলে বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় এতসব মৌলিক সমস্যা রয়েছে যা অতিক্রম করার কোনো চেষ্টাই হয়নি। ফলে সমস্যা সকল স্তরে প্রকটতর হয়েছে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংকট প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে তা সংশ্লিষ্টরাই কেবল বলতে পারবে। গত ১৫/২০ বছরে হু হু করে ২০-এর অধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এগুলোতে মেধাবী, সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা মোটেও বাড়েনি, বরং ভীষণভাবে কমে গেছে। দেশের পুরাতন বা ঐতিহ্যবাহী ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবাজি, আত্মীয়প্রীতি, নিজস্ব প্রোডাক্টপ্রীতির নামে এমন সব স্বজনপ্রীতি চলে যার ফলে প্রকৃত মেধাবীদের ঠাঁই ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়েও খুব একটা হয় না।

দেশে এমফিল পিএইচডির নামে যা চলছে তা এককথায় ন্যক্কারজনক, লজ্জাজনক এবং ভয়াবহ। গবেষণাও তথৈবচ! শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত মেধাহীনদের দলবাজি চূড়ান্তরূপে বাসা বেঁধে আছে। এর ফলে দীর্ঘদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভরে উঠেছে ঐসব দলবাজ তথাকথিত

www.pathagar.com

শিক্ষকে—যাদের কারো কারো পারফরমেন্স কতটা খারাপ হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে—তা লিখতে সত্যিই আমার কষ্ট হয়।

আমার শিক্ষকতা জীবন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অন্তত ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার পূর্ণ বা খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করার সুযোগ হয়েছে। খুব কাছ থেকে এগুলোর ভেতরটা দেখে আমি এতটাই হতাশ যে, নিজেকে বিশ্ববিদ্যায়গুলোর অধ্যাপক হিসেবে পরিচয় দিতে এখন আর তেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। সে-কারণেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াবেন কারা, এমন প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে পাই না। যোগ্য বা ভালো শিক্ষকের সংখ্যা এখন সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই দারুণভাবে কমে আসছে। নীতি-নৈতিকতায় ঋদ্ধ শিক্ষকের সংখ্যা তো হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। একটি পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন, তাদের গড়ে তোলার কাজে মনোনিবেশ করেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা কতটা কমে গেছে তাও বলতে কষ্ট হচ্ছে।

সত্যি কথা বলতে কী, পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই প্রকৃত মেধাবী, সৎ, নিষ্ঠ এবং ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এমন শিক্ষকের দারুণ ঘাটতিতে আছে। আমাদের কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ই আন্তর্জাতিক মানে দাঁড়াতে পারছে না সে-কারণেই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিছু প্রথাগত পাঠদান করে সত্য, তবে সেই শিক্ষা কতটা জ্ঞান উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে সক্ষম তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা থেকে যেসব গুণী শিক্ষক এখানে এসেছিলেন তাঁরা পাঠদান ও গবেষণাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সম্পন্ন করেছিলেন, সে কারণেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম একসময় প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাতি লাভ করেছিল। কিন্তু ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর সেই অক্সফোর্ড-খ্যাতি ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ে যেতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বঐতিহ্য থেকে যৎসামান্য ধারা নিয়ে কিছুকাল টিকেছিল। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের মধ্যে অন্ধের যষ্ঠী হতে পারলেও বাইরে এর খ্যাতি বৃদ্ধির বাস্তব ভিত্তি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। এমতাবস্থায় দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা কোন্ পর্যায়ে নেমেছে তা বলাই বাহুল্য। সেক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে দালান-কোঠা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে তা আমি অন্তত ভেবে পাই না।

গত কয়েক বছরে দেশে ৫০টির অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলোরও বেশিরভাগই চলছে একেবারেই মানহীন, শ্রীহীন, জ্ঞানচর্চাবিহীনভাবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক একটি কিম্ভূতকিমাকার প্রতিষ্ঠানের অধীন প্রায় দুইশত কলেজ রয়েছে যেগুলোতে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স

www.pathagar.com

চালু রয়েছে। বেশিরভাগ কলেজেই পর্যাপ্ত, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও উচ্চতর গবেষণার সঙ্গে পরিচিত শিক্ষক নেই। অথচ হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর প্রধান ভরসা হচ্ছে ঐসব কলেজ। সেখান থেকেই তারা অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রি নিচ্ছে। ঐসব ডিগ্রি ঠিকই ছাত্রছাত্রীরা লাভ করছে, কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার মানসম্পন্ন জ্ঞানলাভের সামান্যতম সুযোগ কি ঐসব কলেজে আদৌ রয়েছে? তাহলে দেশের উচ্চশিক্ষা কোথায়, কোথায় গবেষণা—এসব ছোটখাটো মৌলিক প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পাওয়ার সুযোগ আছে কি? আমার জানা মতে : না, তেমনি কিছু নেই।

বাস্তবে উচ্চশিক্ষার হরেক রকমের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রকৃত উচ্চশিক্ষা বাংলাদেশ থেকে উঠে গেছে কয়েক বছর আগেই। আমরা যতই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি না কেন, প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশন-ভিশন না-থাকার ফলে এগুলোর বেশিরভাগই নানা অপশক্তির দখলে চলে যাচ্ছে বা গেছে। জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সত্য, কিন্তু উচ্চশিক্ষার ধারেকাছেও ঐসব বিশ্ববিদ্যালয় ভিড়তে পারছে না, ভেড়ার চেষ্টাও হচ্ছে না, সেদিকে কারো কোনো তাগিদ আছে বলেও মনে হয় না। বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ববাংলাকে একসময় একা যতটা আলোকিত করতে পেরেছিল, এখন বোধহয় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্মিলিতভাবে সেই জ্ঞানতাত্ত্বিক ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে না। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কেই মনে হয় নানা স্বার্থপর অপশক্তি গ্রাস করে ফেলেছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে আলোকিত করার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে তা মোটেও করে না। কারণ, এখন সবকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রকৃত লেখাপড়া ও গবেষণা বিদায় নিচ্ছে, নিয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আঁধারের গভীর প্রলেপে দিন দিন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, রংও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নতুন রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে এসব কথা বিবেচনা করা হচ্ছে কি?

ভোরের কাগজ, ৫ মার্চ ২০০৮

www.pathagar.com

ফলাফল সুপার-ডুপার, শিক্ষার মানও কি তাই?

গত ২৬ জুন ২০০৮ সালের এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৭২.১৮ ভাগ—এ হচ্ছে স্মরণকালের সেরা তথা এককথায় একে সুপার-ডুপার রেজাল্ট বলা যেতে পারে। একই সঙ্গে এ বছর জিপিএ-৫ পাওয়ার ক্ষেত্রেও নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে— সংখ্যাটি ৫২ হাজার ৫০০ জন। এ বছর ৭টি সাধারণ, ১টি মাদ্রাসা এবং ১টি কারিগরিসহ মোট ৯টি শিক্ষাবোর্ড থেকে ১০ লাখ, ৬ হাজার ৫৬৯ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। এর মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে মোট ৭ লাখ ২৬ হাজার ৫৬৩ জন, অকৃতকার্য হয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজার ৬ জন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, সাধারণভাবে পরীক্ষায় গড় পাস ৭২.১৮ শতাংশ হলেও মাদ্রাসার অধীন দাখিল পাসের হার ৮২.৬ শতাংশ, অথচ কারিগরি বোর্ডের পাসের হার ৬২.৮৮ শতাংশ। উল্লেখ করার বিষয় হচ্ছে, এবারই প্রথম সবচাইতে ভীতিকর বিষয় হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিবেচিত ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে পাসের হার গড়ে গত বছরের চেয়ে ১০ শতাংশ বেড়েছে, যা অভাবনীয়।

এবছর ২ হাজার ২৭২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে সকল পরীক্ষার্থীই উত্তীর্ণ হয়েছে, অপরদিকে একজনও উত্তীর্ণ হতে পারেনি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৯১টি যা অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। গত কয়েক বছরের এসএসসির ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৩ সাল ব্যতীত সকল বছরই পাসের হার বেড়েছে, তবে এ বছর সকল ক্ষেত্রের ইতিবাচক সূচকই উল্লম্ফন গতিতে বেড়েছে; নেতিবাচক তথা বহিষ্কার, অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রী, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দারুণভাবে কমেছে। আগের বছর (২০০৭) জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এ বছর ১৬ হাজারের বেশি বেড়েছে। এ ফলাফলে সরকার, শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, মিডিয়া—সকলেই ভীষণ খুশি, আমরাও যারপরনাই আনন্দিত। দেশে এখনো মিষ্টির দোকানে এর প্রভাব অব্যাহত আছে।

আমার একটি ভয় কিছুতেই কাটছে না, অতীতেও কাটেনি, এবারও না, জানি না ভবিষ্যতে কাটবে কিনা। তা হচ্ছে এই ছাত্রছাত্রীরা ২০১০ সালে যখন এইচএসসি পরীক্ষা দেবে তখন তাদের ফলাফলের ধারাবাহিকতা তারা রক্ষা

www.pathagar.com

করতে পারবে কিনা। যদি ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্য হয় তাহলে এই ফলাফলটাই বড় ধরনের প্রশ্নের মুখে পড়বে, বর্তমানের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়বে; অনেকের জন্যই তা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠবে। বিশেষত, এ বছর যে-ধরনের সুপার-ডুপার ফলাফল দেশব্যাপী দেখা গেছে সে-সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় যে-ধরনের মন্তব্য করেছেন (তিনি বলেছেন : এরকম ভালো ফল কোনো জাদুর বলে হয়নি) তাতে বোঝা যাচ্ছে না যে, সরকারের কী কী বাস্তব উদ্যোগের ফলে গত ২/১ বছরে পাবলিক পরীক্ষার ফল এতটা উন্নত হতে পেরেছে।

হ্যাঁ, আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ থেকে যে বিষয়টি আমি লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে গত দেড়বছর ধরে দেশে রাজনৈতিক শূন্যতা থাকলেও অস্থিরতা প্রকট না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পড়াশোনার ক্ষেত্রে কিছুটা অনুকূল পরিবেশ লাভ করেছিল। তাছাড়া ১/১১-এর পর দেশে সন্ত্রাসী, গডফাদার, দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের পলায়নপরতা উঠতি বয়সের ছাত্রছাত্রীদের ওপর কিছুটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সেখানে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে এখন আর পাড়ামহল্লার ওইসব তথাকথিত রাজনীতিবিদরা তাদেরকে আকৃষ্ট করে না, বরং এতদিনকার দৃশ্যমান বাস্তবতা থেকে সরে আসার তাগিদ কিশোরদের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে। এই একটি ঘটনার প্রভাব এত অল্পসময়ে ছাত্রছাত্রীদের পাবলিক পরীক্ষার ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে—এত সুপার-ডুপার ফলাফল করার অবস্থা তৈরি করে দিয়েছে তা বোধহয় বিশ্বাস করা যায় না।

হ্যাঁ, ১/১১-এর ইতিবাচক প্রভাব কতভাবে এ সমাজের ওপর পড়েছে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তা পড়েছে তা এখনই ১০০ ভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যাচ্ছে না। তবে অবশ্যই এর বেশকিছু ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে বা পড়বে—যা ভবিষ্যতেই কেবল নিরূপণ করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় যদি বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলতেন, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকার এই অল্পসময়ে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে যার ফলে ২/১ বছরেই দেশের এসএসসির মতো পাবলিক পরীক্ষা বা সমমানের অন্যান্য পরীক্ষায় এমন সুপার-ডুপার ফলাফল হাতেনাতে পাওয়া গেল। যদি তাই হয়, তাহলে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলও তো অনুরূপ হওয়ার কথা। যদি না হয়, তাহলে কি অন্য কোনো কারণ খোঁজা হবে?

আমার কেবলি মনে হয়, আমরা মন্তব্য করার ক্ষেত্রে প্রায়ই বাস্তব সমস্যার জটিলতাগুলোকে মাথায় রাখি না। অতীতেও যখন আশাতীত ফলাফল হয়েছে তখন কর্তাব্যক্তিরা গদগদ হয়ে অনেক কথা বলেছেন যা পরবর্তীকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। আবার ফলাফল খারাপ হলেই কিন্তু সরকারের ওপর দোষটা চাপানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আসলে বিশাল এই শিক্ষাব্যবস্থায় এতসব সমস্যা, বৈষম্য ও মানহীনতা রয়েছে যে, এগুলো রাতারাতি দূর করার ক্ষমতা

www.pathagar.com

কোনো সরকারেরই এখন নেই। তাই মানসম্পন্ন শিক্ষা দেওয়া, ফলাফল পাওয়া মোটের ওপর বেশ দুরূহ ব্যাপার। বছরে ৫ থেকে ১০ শতাংশ করে লম্ফঝম্প দিয়ে ভালো ফলাফল দেখাতে পারবে তেমন অবস্থানে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষকসমাজ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা নেই। এক এক ক্ষেত্রে সমস্যার ব্যাপকতা এক এক রকম। দিনদিন এসব সমস্যা জট পাকাচ্ছে, শিক্ষার মান ক্রমেই নেমে যাচ্ছে। উচ্চতর স্তরে আমরা যখন এসএসসি ও এইচএসসিতে 'ভালো' ফলাফল করা এসব ছাত্রছাত্রীদের পড়াই; তাদের লেখা, পড়া, বলা ও চিন্তার ক্ষমতার সম্মুখীন হই; তখন হাতেগোনা কয়েকজনকে নিয়ে আশ্বস্ত হলেও বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই আমাদেরকে হতাশ করে। এখন বুঝতে কষ্ট হচ্ছে এসব ছাত্রছাত্রীর সমস্যাগুলো কোথায়? কেন তারা ফলাফলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ লেখাপড়া নিয়ে আসতে পারছে না?

দিনদিন এই সমস্যা বাড়ছে, প্রকট হচ্ছে, যদিও দেশে কলেজ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হু হু করে বেড়ে চলছে, ছাত্রছাত্রীরা সামর্থ্য অনুযায়ী কোথাও-না-কোথাও ভর্তি হচ্ছে; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে উচ্চশিক্ষার জন্য এখন বিষয়, ভাষা, শিক্ষা সহায়ক জ্ঞান-অভিজ্ঞানের যে-স্তরের চাহিদা আশা করা হচ্ছে তা কিন্তু মোটেও বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তা হলে ঘাটতিটা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা উচিত, তা জরুরিভাবেই খোঁজা উচিত।

এ বছর পরীক্ষক ও স্কুলশিক্ষক মহলের সঙ্গে কথা বলে যে ধারণা আমরা পেয়েছি তাতে জানা গেছে যে, সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলো প্রশ্নপত্র প্রণয়নে বেশ উদার ছিল। উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং নম্বর প্রদানেও অধিকতর উদার থাকার জন্য মূল্যায়নকারী পরীক্ষকদের পরামর্শ দিয়েছে। আমরা বলছি না, পরীক্ষার জটিল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে ছাত্রছাত্রীদের বেকায়দায় ফেলতে হবে। সেটি মোটেও কাম্য নয়। তবে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান, ভাষাজ্ঞান, যুক্তি, তথ্য উপস্থাপনসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইত্যাদি দক্ষতার পরিমাপকে মোটেও পরিহার করা যায় না। বর্তমানে যে-ধরনের প্রশ্নপত্র তৈরি হচ্ছে তাতে সে-ধরনের বিচার বা মূল্যায়ন কতটা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এর ওপর অতি উদারভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়নের যে অভিযোগ উঠেছে তা যদি সত্যি হয়, তাহলে এই ছাত্রছাত্রীদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, গোটা জাতিরই ভবিষ্যৎ বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন জ্ঞান ও মেধার বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য।

কিন্তু তাই বলে রক্ষণশীল হতে হবে তেমনটিও আমি বলছি না। রক্ষণশীল বা অতিউদার কোনোটাই লেখাপড়ার মান নিরূপণের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। দেখতে হবে, ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষ অনুযায়ী দক্ষতা অর্জন করছে কিনা। যারা করছে না তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। তা না করে তাদের

www.pathagar.com

যদি উপরের শ্রেণী বা স্তরে তুলে দেওয়া হয়, অতিউদারভাবে মার্কিং করে পাস করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এসব ছাত্রছাত্রী উপরের শ্রেণী বা স্তরে চলে যাওয়ার সুযোগ পেলেও সেই শ্রেণী বা স্তরের প্রয়োজনীয় লেখাপড়া চালিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা কোনোভাবেই অর্জন করতে পারবে না। ছাত্রছাত্রীদের এই সংখ্যাটি যদি সত্যি সত্যিই বিপুল হয় তা হলে উচ্চশিক্ষায় যে ধস নামবে তাতে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা একবারের জন্য হলেও গভীরভাবে ভাবতে অনুরোধ করব।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমার মতো একজন সাধারণ শিক্ষকের অনুরোধ : আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নিচের ক্লাস থেকেই প্রস্তুত করার দায়িত্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকারসহ সবাইকে যথাযথভাবে নিতে হবে। বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, পরিবেশবিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন—যাই পড়াই না কেন তা যেন সকল ছাত্রছাত্রীই শিখতে পারে, সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে, বিষয়গুলোকে নিজেদের ব্যবহারিক ও চিন্তনের জন্য অপরিহার্য বলে ভাবতে পারে, বুঝতে পারে। তাহলে পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে এতসব কাণ্ডকীর্তি করতে হবে না; এতসব হিসাব-নিকাশ করতে হবে না। উন্নত দুনিয়া থেকে ওইসব পরীক্ষা অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা এখন বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পড়ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, নিজেদের সবলতা-দুর্বলতা যাচাই করছে, সংশোধন করছে এবং যেদিন বিদ্যালয় থেকে শেষ পরীক্ষা দিয়ে সনদ নিয়ে বের হয়ে আসছে সেদিন ছাত্রছাত্রীরা জানে তার সবলতা দুর্বলতা কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে : দুর্বলতা কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যাবে? প্রকৃত লেখাপড়া তথা জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের লেখাপড়ায় পরীক্ষা নিয়ে অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, তদবির, অতিউদারতা, রক্ষণশীলতা—এর কোনোটারই প্রয়োজন পড়ে না। আমরা প্রতিবছর পাবলিক পরীক্ষা নিয়েই মাতামাতি করছি, কিন্তু প্রকৃত মেধার বিচার ও বিকাশ কোনোটাই এতে হচ্ছে না। কবে এই সত্য আমরা জাতিগতভাবে উপলব্ধি করব?

ভোরের কাগজ, ২ জুলাই ২০০৮

www.pathagar.com

আগে মানসম্মত পাঠ দিন, পরে যেভাবে খুশি পরীক্ষা নিন

আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাদের মাথায় ক-বছর পরপরই নতুন নতুন ভূত চেপে বসে। কারো মাথায় ভূত চাপলে যা হওয়ার তাই হয়! সবকিছু তছনছ না-করা পর্যন্ত ভূত যেন শান্ত হয় না। আশপাশের গাছপালা, পশু-জীবজন্তু, টিনের চালা, মানুষ—কেউই ভূতের আছর যার ওপর হয়েছে তার আক্রমণ থেকে নিস্তার পায় না। একজন মানুষের বাঁচামরার কথা বিবেচনা করে প্রতিবেশী সকলেই চোখ বুজে সবকিছু সহ্য করে যায়, তবে মাঝে মধ্যে অতিষ্ঠ হয়ে কেউ কেউ পানিতে চুবিয়ে ভূত তাড়ানোর উদ্যোগও নিয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও গোটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর প্রায়ই ভূতে-ধরা মানুষের মতো আচরণ করে থাকে। তারা কখনো অন্য কোনো দেশে কী দেখে আসেন, কোনো বিদেশী দাতা সংস্থা তাদের শত শত কোটি টাকার প্রলোভন দেখান, সম্মুখে অর্থপ্রাপ্তির মূলা ঝুলিয়ে রাখেন আর অমনি তারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় (বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে) তা চালু করার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় এটিকে একদিকে বাস্তবায়নের নানা উদ্যোগ, অন্যদিকে তা প্রতিহত করার আন্দোলন। কখনো পুস্তক মালিক সমিতি, কখনো শিক্ষকসমাজ, অভিভাবক সমাজ, কখনো নাগরিক সমাজ ইত্যাদি নামে নানা ব্যক্তিগোষ্ঠী শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এনসিটিবি, শিক্ষাবোর্ড মুখোমুখি অবস্থান গ্রহণ করে। দেশে বেশ কিছুদিন উত্তপ্ত পরিস্থিতি চলতে থাকে, পরিস্থিতি বেশি জটিল হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ সাময়িক পশ্চাদপসরণ করেন, তারপর আবার নতুন নাম, নতুন পরিচয়ে একই এজেন্ডার আবির্ভাব ঘটে। এই অভিজ্ঞতা মোটেও নতুন কিছু নয়, বহু পুরাতন। এর পেছনে বিরাট অঙ্কের টাকার কিছু সুযোগসুবিধা নেওয়াই মহলবিশেষের উদ্দেশ্য থাকে, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন বা মনোন্নয়ন তাতে হওয়ার কিছু নেই। দেশে সম্প্রতি নতুন পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যা-কিছু হয়েছে তা সেই ভূতেরই আছর হওয়ার বেশি বলে আমি অন্তত মনে করি না।

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও পরীক্ষাপদ্ধতি চালু নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি মহল কয়েক বছর ধরে নানা কথা শুনিয়ে আসছিলেন। এর পেছনে ৭৯৩ কোটি টাকার বিদেশী একটি অনুদান জড়িত থাকার কাহিনীও শোনা গেছে।

www.pathagar.com

গোলটা বাধল যখন ২০১০ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষা থেকে তা অনুসৃত হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয় সেখানেই। শিক্ষার্থীদের পক্ষ হয়ে অভিভাবকদের একটি অংশ প্রতিবাদ জানাতে থাকল, কিছু সাংবাদিক বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের প্রতিবেদন লিখে জনমত তুলে ধরার চেষ্টা করলেন, কিছু লেখালেখি হল। এরপর কাঠামোবদ্ধ পরীক্ষাপদ্ধতির নাম পরিবর্তন করে রাখা হল 'সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি'। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ২০১০ শিক্ষা বছরেই শিক্ষার্থরা এসএসসি পরীক্ষায় বাংলা এবং ধর্মশিক্ষায় তথাকথিত সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে; পরের বছর অর্থাৎ ২০১১ সাল থেকে সকল বিষয়ে উক্ত পদ্ধতিতে পরীক্ষা দিতে শুরু করবে। কোনো কোনো শিক্ষাবিদ সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশংসা এতটাই করেছেন যে, তাতে মনে হচ্ছে পরীক্ষাটাই আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মুখ্য বিবেচ্য বিষয়—যা দীর্ঘদিন থেকে বলা হয়ে এসেছে—বারবার তাই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, নম্বর পদ্ধতি, ফল প্রকাশ ইত্যাদি পরিবর্তন করা হয়েছে। দেশের হাজার হাজার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা, ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের দায়দায়িত্ব নেওয়ার বিষয়টি কেউ তেমন শোনার মতো করে উচ্চারণ করছে না। কেন করছে না, তা কি বলে দিতে হবে? আসলে সেই দায়িত্ব নেওয়ার মুরোদ কারো নেই—যারা অর্থ দিচ্ছে তাদেরও নেই, যারা অর্থ নিচ্ছে তাদেরও নেই।

আমাদের দেশে বিগত বছরগুলোতে পরীক্ষাপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা কম হয়নি। ৩/৪ বছর পর পরই পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপদ্ধতি, নম্বর পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে। কখনো পরীক্ষায় নকলপ্রবণতা রোধ করা, কখনোবা বাজারের গাইড বই এবং কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এই সমস্যাগুলো আমাদের স্কুল-মাদ্রাসা, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিপরীক্ষাতেও নানা ডালপালা মেলে শক্তভাবে বিরাজ করছে—একথা আমরা কেউ অস্বীকার করছি না। সে-কারণেই নানা পরীক্ষানিরীক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু কেউ কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যে, যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এর ফলে বাজারের গাইড বই ও কোচিং-নির্ভরতা ছাত্রছাত্রীদের আদৌ কমেছে? সবচাইতে বড় প্রশ্ন : ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মানে কি তেমন উল্লেখ করার মতো কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়েছে? যদিও জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, পাসের হার বেড়েছে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা বইমুখী হয়েছে, শুদ্ধভাবে লেখা, বলা বা যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর নিজের মতো করে দেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে—এমন ধারণা কি আদৌ সৃষ্টি হয়েছে? এসএসসি, এইচএসসি বা সমমানের মাদ্রাসা থেকে যেসব ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে, ভর্তি হচ্ছে, তাদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আমার কখনো মনে হচ্ছে না যে আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতিতে, কিংবা পাঠ্যপুস্তকে এতসব পরিবর্তন সাধনের পরও

www.pathagar.com

মানের দিক থেকে তেমন কোনো পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটেছে—এমনটি মনে করার আদৌ কোনো বাস্তব প্রমাণ আমি অন্তত হাতের কাছে পাচ্ছি না। অনেক নামিদামি স্কুল ও কলেজ থেকে কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার মান, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতার স্তর দেখে কোনোভাবেই বলা যাচ্ছে না যে শুধুমাত্র পরীক্ষাপদ্ধতি, বইপুস্তকে পরিবর্তন এবং নামিদামি স্কুল-কলেজে ছেলেমেয়েদের পড়ানো, কিংবা প্রাইভেট ও কোচিঙের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করে ছাত্রছাত্রীদের খুব একটা মেধাবী করা যাচ্ছে। আমার শুধু দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, দেশব্যাপী অসংখ্য স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ গড়ে ওঠার পরও নীতিনির্ধারকগণ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত মান, শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে যুগের পর যুগ ধরে কেবল পরীক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তকে বারবার পরিবর্তন আনার কথাই বলেন, কোটি কোটি টাকা এর জন্য খরচ করিয়েই যাচ্ছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি ছাড়া মানের কোনো পরিবর্তনই ঘটেনি দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় (স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি) সহ সকল স্তরের শিক্ষাব্যবস্থায়— এটি নিশ্চিত করে বলা যায়।

আমাদের দেশে যেসব প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার সবকটিতে সমস্যার অন্ত নেই। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-অনুপাতে শিক্ষক নেই। ফলে শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন না। শিক্ষকদের মানও আশানুরূপ নয়। বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষাও নানা ধরনের হয়ে আছে। কেজি স্কুলগুলোতে ছাত্রবেতন বেশি, এগুলো মালিকনির্ভর। বেশির ভাগ মালিকই বাণিজ্যিক স্বার্থে বিদ্যালয়গুলো গড়ে তোলেন, সেভাবেই পরিচালনা করে থাকেন। গ্রামাঞ্চলে যেসব বেসরকারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে সেগুলোতে অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা নেই; প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষকও তেমন নেই; শিক্ষকদের বেতনও তেমন সম্মানজনক নয়। নানা কারণেই ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তি নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করে আসে। শহরের হাতেগোনা কিছু স্কুল ছাড়া বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা মোটেও সন্তোষজনক নয়। অঙ্ক, বাংলা, ইংরেজিসহ কোনো বিষয়জ্ঞানই তাদের নির্ভর করার মতো নয়। এই দুর্বলতা পরবর্তী শিক্ষাজীবনে কাটিয়ে ওঠা বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর পক্ষে সম্ভব হয় না। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভিত্তি তৈরি করার অবকাশ খুব একটা নেই। তাছাড়া দেশের বেশিরভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই বেসরকারি—এগুলো আর্থিক, শিক্ষক, ব্যবস্থাপনাসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকে। কোনো স্কুলে ক্লাসরুম আছে তো দক্ষ শিক্ষক নেই, আবার ভালো শিক্ষক আছেন তো ক্লাসরুম নেই, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত মানা হচ্ছে না। তাই শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দিতে পারেন না। মারাত্মক

www.pathagar.com

সমস্যা বিরাজ করছে ব্যবস্থাপনা নিয়েও। শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাচ পড়ানোর মানসিকতাও বেড়ে গেছে। আসলে ছাত্রছাত্রীরা নিচের ক্লাস থেকে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানে বা দক্ষতা অর্জনে পড়ে উঠতে পারছে না, তাদেরকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা, সেভাবে প্রস্তুত করার জন্য যেসব নিয়ম শিক্ষাদর্শনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে সেগুলো মোটেও অনুসৃত হচ্ছে না। সেই মানের পর্যাপ্ত শিক্ষক আমাদের স্কুল ও মাদ্রাসাগুলোতে নিয়োগ দেওয়া হয় না। হাতেগোনা দুচারজন দক্ষ শিক্ষক এসব ক্ষেত্রে নিয়োগ পেলেও পরিবেশ, বেতনভাতা ও ইনসেনটিভের অভাবের কারণে তারাও কোনো অবদান রাখতে পারেন না।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, নিচের ক্লাস থেকে পঠনপাঠনে মারাত্মক ত্রুটির কারণে আমাদের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই নিজের ভাব বাংলাতেও খুব একটা প্রকাশ করতে বা লিখতে পারে না। ইংরেজি ও অঙ্কভীতি কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তা সকলেরই অনুমেয়। এর জন্য দায়ী কে? ছাত্রছাত্রী? শিক্ষক? অভিভাবক? না, এককভাবে কেউই নয়।

ছাত্রছাত্রীরা দায়ী হবে কেন? কোনোভাবেই নয়। শিক্ষাব্যবস্থাই তাদেরকে নিচের ক্লাস থেকে গড়ে তুলছে না, ফলে তারা সেভাবে বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিয়ে উপরের শ্রেণীতে উঠতে পারছে না। অন্যদিকে শিক্ষকগণও এককভাবে এর জন্য দায়ী নন। যোগ্য, মেধাবী, দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে একথা সত্য। সেরকম শিক্ষক এই পেশায় আসার মতো পরিবেশ ও সুযোগসুবিধা তো থাকতে হবে। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণের অনুকূল পরিবেশ বা বাধ্যবাধকতা থাকলে কর্মরত শিক্ষকগণই সেভাবে পরিবর্তিত হতে পারেন, বা গড়ে উঠতে পারেন। কিন্তু সেরকম চিন্তাই নেই। অধিকন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সর্বত্র দুর্নীতি, লুটপাট যেমন বেড়েছে—শিক্ষা অধিদপ্তর, অফিসগুলোকে কেন্দ্র করে দুর্নীতিবাজ আমলাতন্ত্র এমনভাবে গড়ে উঠেছে যারা একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-উপযোগী মানসিকতার ধার মোটেও ধারেন না, অধিকন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদেরকে জিম্মি করে রেখেছেন। এসব কারণে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজসমূহের বেশিরভাগই চলছে গড্ডলিকায়—যেভাবে চলে এসেছে একইভাবে এখনো চলছে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো মহৎ পরিকল্পনা তাদের এখতিয়ারের বিষয় নয়—এমনটিই লক্ষ করা যাচ্ছে।

দেশের বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এভাবেই চলছে। ছাত্রছাত্রীরাও গড়পড়তা লেখাপড়া শিখছে। ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের মূল লক্ষ্য থাকে যেভাবে হোক পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া। গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের একটি অংশ নিচের শ্রেণী থেকেই অতিরিক্ত কোচিং, ব্যাপক

www.pathagar.com

পড়িয়ে ছেলেমেয়েদের পাবলিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্যে প্রস্তুত করান। এর জন্য তাদের প্রচুর বাড়তি পয়সা খরচ করতে হয়, নামিদামি স্কুল-কলেজের দ্বারস্থ হতে হয়। বলা চলে অভিভাবকরাই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন। এ ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করার কারণ হচ্ছে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মোটেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় আস্থাশীল বা সৃজনশীল করার দায়িত্ব গ্রহণ করে না। যুগ যুগ ধরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাব্যবস্থার দায়বদ্ধতার মধ্যে এর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি। আমাদের যত মনোযোগ তা হচ্ছে পাবলিক পরীক্ষা-কেন্দ্রিক। পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, নম্বর প্রদান ইত্যাদিতে যেসব রীতিনীতি নানা পরীক্ষানিরীক্ষার নামে প্রবর্তন করা হয়েছে তাতে ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা যাচাই করার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। সামগ্রিক পঠনপাঠনে সৃজনশীলতাকে বাদ দিয়ে শুধু পরীক্ষায় সৃজনশীলতার চেষ্টা করা, প্রচার করা মনে হয় বাংলাদেশেই কেবল সম্ভব।

যে পশ্চিমের দুনিয়া থেকে কাঠামোবদ্ধ বা সৃজনশীলতা পদ্ধতির ধার বা উদ্ধার করে আনা হয়েছে সেখানে পাবলিক পরীক্ষা বলে কোনোকিছু নেই। সেখানে সকল শ্রেণীতেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর প্রাণান্তকর চেষ্টা বিদ্যালয়ে করা হয়ে থাকে, বইপুস্তকগুলো সেভাবে বিশেষজ্ঞ দিয়ে লেখানো হয়, ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিনের পঠনপাঠনে সেভাবে প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশেরই শিশু, ছাত্রছাত্রী যারা সৌভাগ্যক্রমে উন্নত দুনিয়ায় থাকার কারণে স্কুলে ভর্তি হয় তারা কিন্তু সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতির কারণে সেইসব দেশের ছেলেমেয়েদের মতোই দক্ষতা অর্জন করে সাফল্য লাভ করছে। তারা যদি বাংলাদেশে পড়তে বাধ্য হত তাহলে তাদের নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকত না। তাহলে সহজেই অনুমেয় যে, উন্নত পদ্ধতির গুণে ছাত্রছাত্রীরা অনায়াসে সৃজনশীল চিন্তা ও জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে, অনুন্নত ব্যবস্থায় তা মোটেও সম্ভব নয়। সেটি জানা সত্ত্বেও আমরা গোটা শিক্ষাব্যবস্থায় পঠনপাঠনের দায়িত্ব নেওয়ার কথা গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি না। আমাদের আমলারা সময় সময় পরীক্ষাপদ্ধতিতে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালু করে যা অর্জন করতে চান তা দিয়ে জাতির মেধার উন্মেষ বা বিকাশ ঘটানো কোনোকালেই সম্ভব হবে না, অপচয় ছাড়া।

ভোরের কাগজ, ৩০ এপ্রিল ২০০৮

www.pathagar.com

লেখাপড়া থেকে দূরে আছে ছাত্রসংগঠনগুলো

দেশে এখন জরুরি অবস্থা চলছে। রাজনীতি ও মিছিল-সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মারামারি তো সবসময়ের জন্যই বেআইনি কাজ, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু একটি ব্যাপার সবাইকেই বেশ অবাক করে দিচ্ছে, তা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই (কিছু কিছু প্রসিদ্ধ কলেজেও) ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মারামারিতে রূপ নিয়েছে, এক সংগঠনের নেতাকর্মীরা অন্য সংগঠনের নেতাকর্মীদের পিটিয়ে হাড়গোড় ভেঙে দিচ্ছে, তাদের কক্ষ এবং বইপুস্তক, আসবাবপত্র ভাঙচুর ও জ্বালিয়ে দিচ্ছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং নাসিরাবাদ কারিগারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা উভয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও পিটিয়েছে, ছাত্রদের তো তারা পিটিয়ে হাসপাতালে পাঠিয়েছেই। এই না হলে তাদের ক্যাডার বলা যাবে কীভাবে! কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের এক ছাত্রীনেত্রীকে উক্ত সংগঠনেরই কিছুসংখ্যক নেতাকর্মী শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে, ছাত্রলীগ বনাম ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা একে অপরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও কদিন হল ছাত্রদলের ক্যাডাররা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের পিটিয়েছে, জগন্নাথেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে, সিলেট শাহজালালে একজন ছাত্রীকে পৈশাচিকভাবে নির্যাতন করা হয়েছে।

এ সবই মাত্র গত কয়েকদিনে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংগঠনের নামে সংগঠিত কিছুসংখ্যক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা, যেগুলো সম্পর্কে দেশের বেশির ভাগ পত্রিকাতেই সংবাদ ছাপা হয়েছে। সে কারণে ঘটনাগুলো নতুন করে এই লেখায় উদ্ধৃত করে কলেবর বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। পত্রিকার পাঠক মাত্রই এসব ঘটনার কথা জানেন। তাছাড়া বাংলাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রভাব বিস্তার, দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠাসহ নানা কারণে ছাত্রসংগঠনগুলোর ক্যাডারগণ হরহামেশাই মারামারি করে থাকে।

আমাদের জন্য এসব নতুন কোনো খবর নয়, দীর্ঘদিন থেকেই আমরা এভাবেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। সে কারণে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যে মারামারি, ছাত্রছাত্রীদের নির্যাতন করা; হলে, হোস্টেলে নানাভাবে হয়রানি, ভাঙচুর করা;

www.pathagar.com

শিক্ষকদেরও মাঝে মধ্যে মারধোর করা, তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়াসহ শক্তি প্রদর্শনের অপকর্মের অসংখ্য খবরে আমাদের কোনো মহলই এখন আর যেন আঁতকে ওঠে না, সবই যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে। ওইসব ছাত্রসংগঠনের গডফাদাররা সম্ভবত পর্দার আড়ালে বসে হাততালি দেন, ওইসব বীর (!) ক্যাডারদের জন্য সম্ভবত উপযুক্ত পুরস্কার, পদোন্নতি ও পদমর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়ে তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নিতে প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

শিক্ষাঙ্গনের এই পরিবর্তনশীল অবস্থা আমাদের সকলের চোখের সম্মুখেই মাত্র ক-বছরে ঘটে গেছে। এসব খুব বেশি পুরোনো ঘটনা নয়, ১৯৭৫ সাল-পরবর্তী সময়ে এর সূচনা। তারপর এর প্রতিষ্ঠা ও দাপট একচ্ছত্র হয়েছে। এখন ইতিবাচক ছাত্ররাজনীতি অতীত ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেছে। ছাত্রসংগঠনের ত্রাস, সন্ত্রাস, দখলদারিত্ব, মারামারি, ভাঙচুর, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও নষ্টভ্রষ্ট রূপ বর্তমানের এক রূঢ় বাস্তবতা।

ছাত্রসংগঠনগুলোর অবস্থা এমন হল কীভাবে—এ এক মস্তবড় প্রশ্ন, গবেষণার বিষয়ও। তবে ছাত্ররাজনীতি আপনাআপনি নষ্ট হয়ে যায়নি। এটিকে পরিকল্পিতভাবে নষ্ট করা হয়েছে। ছাত্ররাজনীতিতে মেধা, সততা, দেশপ্রেম ও বিদ্যাশিক্ষার গুরুত্ব স্বাধীনতার অব্যবহিত পরপরও অপরিহার্য ছিল। স্বাধীনতার পর আমরাই দেখেছি টগবগে তরুণরা ছুটে গিয়েছিল আদর্শবাদী ছাত্ররাজনীতির কাছে। লাল-সবুজ রঙের নানা বই, পাঠচক্র, সাংস্কৃতিক চর্চা, মেধাচর্চার সঙ্গে কমবেশি সবকটি ছাত্রসংগঠনই যুক্ত হয়েছিল। তখন সংগঠনে সংগঠনে প্রতিযোগিতা ছিল আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব চর্চার, মেধাবী ও আদর্শবান ছাত্রছাত্রীদের সংগঠনের পতাকাতলে স্থান করে দেওয়ার। কোনো ছাত্রসংগঠনই কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ছাড়া কাউকে কোনো পদে মনোনয়ন দিত বলে মনে পড়ে না। সংগঠনে যারা মাস্তানি করত, গণ্ডগোল করত, বোমাবাজি, অস্ত্রশস্ত্রের হুমকিধামকি দিত, তাদের অবস্থান সবসময়ই নড়বড়ে হত, বহিষ্কৃত হওয়ারও ঘটনা ঘটত। সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই ঘোষণা দিয়ে সংগঠন ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা একেবারে বিরল ছিল না। তৎকালীন পত্রপত্রিকায় ওই ধরনের বহু চিঠিপত্র ও ঘোষণার খবর খুঁজলে পাওয়া যাবে।

১৯৭৫-এর পর জাতীয় রাজনীতিতে সুবিধাবাদ, আদর্শচ্যুতি, প্রতিষ্ঠা পাওয়াসহ যেসব অপধারা চালু হয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় ছাত্ররাজনীতিও আদর্শের গভীর সংকটে পড়েছে। ছাত্রসংগঠনগুলো ক্রমেই রাজনৈতিক দলের হুকুম-পালনকারী ঠ্যাঙাড়ে, লেজুড়ে বাহিনীতে পরিণত হয়। ১৯৯০-এর পর নগদনারায়ণ হাতে নিয়ে একশ্রেণীর ছাত্রনেতা ফুলেফেঁপে ওঠে। তারা রাতারাতি বনে গেল বৃহৎ ব্যবসায়ী, বিত্তশালী, অর্থশালী, ক্ষমতাশালী, এমপি-মন্ত্রী।

www.pathagar.com

ততদিনে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে-যার মতো দখল করে নিল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, নিয়োগ বাণিজ্য, বদলি ইত্যাদি সবই দখলবাজ ছাত্রসংগঠনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয়ে পরিণত হল। দেশের প্রায় প্রতিটি কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনটি বড় ছাত্রসংগঠনের দখলে চলে যায়। ছাত্রশিবির বলতে গেলে সবকটি মাদ্রাসায় এককভাবে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, সেখানে অন্য কোনো ছাত্রসংগঠনের অস্তিত্ব অনেকটাই অকল্পনীয় বিষয় হয়ে গেল। দেশে যেহেতু সামরিক এবং বেসামরিক শাসন, বিএনপি এবং ৪ দলীয় জোট শাসন সবচাইতে বেশি সময় ছিল; তাই এই সময়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আনুকূল্য সবচাইতে বেশি পেয়েছিল ছাত্রশিবির এবং ছাত্রদল। আওয়ামী লীগ মাত্র ৫ বছর রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল। ১৯৯৬-২০০১ সাল সময়ে ছাত্রলীগ খুব কমসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। সর্বত্রই ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের প্রচণ্ড বাধার মুখে পড়েছিল ছাত্রলীগ। দেশের আদর্শবাদী ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রমৈত্রীসহ অপরাপর সংগঠনগুলো থেকে আদর্শের চর্চা, মেধার চর্চা, ও লেখাপড়ার বাধ্যবাধকতা এতদিনে তিরোহিত হয়ে পড়ে।

শিক্ষাঙ্গনে টিকে থাকার জন্য অর্থ এক নতুন বাস্তবতা। এই বাস্তবতা যারা বিনাপ্রশ্নে গ্রহণ করেছে তারা দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে, যারা পারেনি তারা প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এ ধরনের এক রূঢ়, আদর্শহীন, নীতিনৈতিকতাহীন, বিদ্যাশিক্ষাহীন অপধারায় বাংলাদেশের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি নামধারী কিছু ছাত্রসংগঠনের প্রবেশ ঘটে। এই সংগঠনগুলোর নেতাকর্মীদের হাত থেকে বিদায় নেয় বইপুস্তক; তাতে স্থান করে নেয় অস্ত্র, লাঠিসোঁটা। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের দৌরাত্ম্য এতটাই বেড়ে যায় যে, তারা ভুলে গেছে যে, এটি একটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; এখানে ছাত্রছাত্রীরা এসেছে মূলত লেখাপড়া করতে, শিখতে, জানতে এবং নিজেদেরকে প্রকৃত মেধাবীরূপে গড়ে তুলতে।

বস্তুত, আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাক্রমের দিক থেকে এতটাই দুর্বল যে, ওই পর্যায়ে কোনো ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া ও ক্লাস করার বাধ্যবাধকতায় না-থেকেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, সার্টিফিকেট লাভ করতে পারে। এমনটি পৃথিবীর কোনো উন্নত দেশে আদৌ সম্ভব নয়। নিয়মিত ক্লাস না করে, পাঠদান না করে কোনো ছাত্রছাত্রীই কোনো স্তরেই ডিগ্রি অর্জনের কথা ভাবতে পারে না। একজন ছাত্র সেই পর্যায়ে প্রতিদিন নিজেকে লেখাপড়ায় যুক্ত রাখার চাইতে বাইরে গলাবাজি, টেন্ডারবাজি, চায়ের দোকানে আড্ডাবাজি বা কোথাও অলস সময় কাটিয়ে উচ্চতর কোনো ডিগ্রি অর্জনের কথা

www.pathagar.com

চিন্তাই করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য আর দশজন ছাত্রছাত্রীর মতো ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদেরকেও সমানভাবে লেখাপড়া শিখে চলতে হয়, পরীক্ষায় পাস করতে হয়, কোনোভাবেই শৃঙ্খলাভঙ্গের কথা ভাবতে পারে না কেউ—সে যতবড় নেতাই হোক না কেন। অন্য কোনো ছাত্রছাত্রীর মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কথাও কেউ ভাবতে পারে না। অথচ আমাদের এখানে শুরুই হয় একটি ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অন্য ছাত্রছাত্রীর স্বাধীন মতামতকে দমন করা, জীবনযাপনে হস্তক্ষেপ, থাকা-খাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার মধ্যদিয়ে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক যুগ শিক্ষকতা ও হল প্রশাসনে ৫ বছর জড়িত থেকে দেখেছি ছাত্রশিবির ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, ক্যাম্পাস, প্রশাসন ও শিক্ষাভবন থেকে শুরু করে সবকিছুতেই কীভাবে নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারিত্ব করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে অচল করে দিতে হেন কোনো অপকর্ম নেই যা শিবিরের কর্মীরা করে না। অথচ এসবই করা হচ্ছে 'ইসলামি বিপ্লবের' নামে। কর্মীদের কেউ হল পাহারা দিচ্ছে, কেউবা ক্যাম্পাস পাহারা দিচ্ছে, কেউবা রাতদিন কোথায় কী হচ্ছে তা নজরদারিত্বের মধ্যে রাখছে। সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগকারী এসব ছাত্রকে দেখেছি ঈদ, পালা-পার্বণেও বাড়ি না গিয়ে স্রেফ হল পাহারা দিতে। বইপুস্তকের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে কিনা তা খুঁজতে যন্ত্র-প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। ছাত্রদল, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা যেসব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বিস্তার করে আছে তারা ততটা দলের প্রতি 'নিবেদিতপ্রাণ' নয় যতটা ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা। তবে তারাও লেখাপড়া থেকে নিজেদেরকে বিযুক্ত রেখেই এক 'স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গের' জীবনযাপন করে যা ছাত্রজীবনের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ছাত্রদল-ছাত্রলীগ অধ্যুষিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কিছুটা মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারে, শিবির-অধ্যুষিত বা দখলকৃত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যা আশা করা 'পাপ' বলে গণ্য হয়ে থাকে। কথা হচ্ছে : বাংলাদেশের কটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এই তিনটি ছাত্রসংগঠনের দখল বা প্রভাব থেকে মুক্ত আছে তা কি কেউ বলতে পারেন? আমার ধারণা, দুএকটি কলেজ মুক্ত থাকলেও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও এখন আর মুক্ত নয় উক্ত তিনটির মধ্যে যে-কোনো একটি ছাত্রসংগঠনের দৌরাত্ম্য, প্রভাব বা দখলদারিত্ব থেকে। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষার নামে কী হচ্ছে, কতটা হচ্ছে।

আসলে আমাদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা এতটাই সেকেলে, এতটাই পুরোনো, গতানুগতিক যে, এখান থেকে ডিগ্রি পেতে তেমন একটা লেখাপড়া করতে হয় না, লেখাপড়া ও নিয়ম-শৃঙ্খলার বাধ্যবাধকতায় ছাত্রছাত্রীদের খুব একটা থাকতে হয় না। অধিকন্তু আমাদের দেশে ছাত্রসংগঠন,

www.pathagar.com

সেটি যদি হয় ক্ষমতাসীনদের সমর্থনপুষ্ট, সেটির যদি থাকে সন্ত্রাসী ক্যাডার, তাহলে তো কথাই নেই। মেরুদণ্ডহীন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং এগুলোর প্রশাসন আত্মসমর্পণ করে থাকে সেইসব ছাত্রসংগঠনগুলোর কাছে; দেশের পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনও একইভাবে তাদেরকে শতবার নমস্কার আর সালাম দিয়ে চলে। তথাকথিত 'ছাত্রনেতা' বা ক্যাডারকে দিয়ে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ ও সিভিল প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, পদপ্রাপ্তির একটা সুযোগ তো রয়ে গেছে। কোনো ছাত্রনেতার পকেটে যখন একজন উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, অধ্যক্ষ, শিক্ষকের নিয়োগপত্র, বদলির আদেশ ইত্যাদি জমা থাকে তখন সেই ছাত্রনেতা বা কর্মী বইপুস্তক স্পর্শ করবে কোন্ দুঃখে? দলবাজির এমন মাহাত্ম্যে অন্ধ হয়েছে এ সমাজের বহু তরুণ-তরুণী, শিক্ষক—যারা নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসের ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের নানাভাবে সহযোগিতা দিয়ে থাকেন, প্রথম শ্রেণী দেওয়ার মতো গর্হিত অপরাধ করে থাকেন। এর চাইতেও বড় অপরাধ তারা করে থাকেন যখন যোগ্য ও প্রকৃত মেধাবীদের বঞ্চিত করে দলীয় ঐসব ক্যাডারদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করেন। এভাবে নিয়োগ পাওয়া গেলে, শিক্ষক হওয়া গেলে ছাত্রসংগঠনের ক্যাডার হতে অসুবিধা কোথায়?

না, মোটেও বাড়িয়ে বলিনি, নির্মম সত্য হচ্ছে যে, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্ষমতাসীনদল বা জোটের ছাত্রসংগঠনের ক্যাডার বা সন্ত্রাসীদের অনেকেই লেখাপড়া না করেও প্রথম শ্রেণী পেয়েছে, পাচ্ছে, শিক্ষকও হচ্ছে; অদূর ভবিষ্যতে তাদের হাতেই উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব শতভাগ সমর্পিত হতে যাচ্ছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে 'শিক্ষা' শব্দটি যুক্ত থাকলেও তা নামেই বিরাজমান; বাস্তবে এ শিক্ষা দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কোনো উপকার হবে, কোনো মেধাবী, জ্ঞানীগুণী বিজ্ঞানী তৈরি হবে—এমন সম্ভাবনা আমি অন্তত খুব একটা দেখি না। তবে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত, মেধাহীন, আদর্শহীন, দেশপ্রেমহীন, তালেবানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয়তো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে, তেমন সম্ভাবনাই ভেতর থেকে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে।

ভোরের কাগজ, ৭ মে ২০০৮

www.pathagar.com

সত্যি কি প্রাথমিক শিক্ষা ব্র্যাকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে?

বেশ কিছুদিন থেকেই দেশের বেশির ভাগ পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নানা সংবাদ, প্রতিবেদন ও কলামে বলা হচ্ছে যে, সরকার দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ব্র্যাকের হাতে তুলে দিচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিগুলোও এ নিয়ে বেশ সোচ্চার, প্রতিবাদমুখর এবং সংগঠিত হচ্ছে; কঠোর আন্দোলনের হুমকিও দিচ্ছে। পত্রপত্রিকার সাধারণ পাঠক, অভিভাবক মহল এবং দেশের সকল স্তরের মানুষজন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কেন এবং কীভাবে সরকার দেশের এতবড় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্র্যাকের মতো একটি এনজিওর হাতে তুলে দিতে চাচ্ছে! এ সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও ব্যাখ্যা কারো কাছ থেকেই তেমন একটা জানা যাচ্ছে না। কোনো পক্ষই সরকারি আদেশ-নির্দেশ বা চুক্তিনামা—এ ধরনের কোনো কাগজপত্র উপস্থাপন করছে না। এমনকি যেসব সাংবাদিক পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করেছেন, প্রতিবেদন লিখছেন, কলামলেখক কলাম লিখছেন, তাদের কেউ কিন্তু সেই দলিলকে উদ্ধৃত করে কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্কের অবতারণা করছেন না। দু-একজন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক বিষয়টি নিয়ে লিখতে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে ফোন করেছিলেন। আমি তাদেরকে সরকারি আদেশের একটি ফটোকপি সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্যে বলেছিলাম, কিন্তু এ-পর্যন্ত কেউ তা দেননি বা দিতে পারেননি। আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত কয়েকজন প্রাথমিক শিক্ষকের সঙ্গে আমি নিজ থেকে এ বিষয়ে জানার চেষ্টা করেছি, কথা বলেছি। কিন্তু তারাও সরকারি আদেশটিতে কী লেখা আছে সে-সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানালেন; তাদের সমিতির নেতৃবৃন্দের বলা কথাগুলো মাত্র আমাকে জানালেন। পুরো বিষয়টি আমার কাছে 'চিলে কান নেওয়া' বাংলা প্রবাদের কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

অবশেষে আমি নিজেই দু-এক জায়গায় যোগাযোগ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ইস্যুকৃত চিঠির একটি ফটোকপি সংগ্রহ করি। 'প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক প্রস্তাবিত প্রশিক্ষণ প্যাকেজ বাস্তবায়ন' শীর্ষক উক্ত চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. ওয়ালিউর রহমান। এর স্মারক নম্বর হচ্ছে প্রাশিঅ/ প্রশি মানপরিদর্শক/ ৬৯/

www.pathagar.com

২০০৫/১১৩৫৯/২০(২-৫), তারিখ ১০ বৈশাখ ১৪১৫, অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল ২০০৮। মাত্র ২ পৃষ্ঠার উক্ত চিঠিতে দেশে (নির্বাচিত) ২০টিসহ মোট ৩০টি উপজেলা থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত ৩১৪২টি বিদ্যালয় সার্ভে, বিদ্যালয়গুলোর সুবিধা-অসুবিধা, অর্জন, পর্যবেক্ষণ, শিক্ষকদের কার্যকর প্রশিক্ষণ, অভিভাবক, বিদ্যালয় পরিচালনা, পরিবীক্ষণ, নানা মেয়াদি রিপোর্টিং ইত্যাদি বিস্তর কর্মযজ্ঞের ধারণা দেওয়া আছে যা বাস্তবায়নে ব্র্যাক বড় ধরনের ভূমিকা রাখবে। প্রাথমিক শিক্ষা-কর্মকর্তাগণও এর সঙ্গে সর্বত্র যুক্ত থাকবেন। আমার ধারণা ২ পৃষ্ঠার এই করণীয় দিকনির্দেশিকা সম্পর্কীয় পত্রটি যদি পত্রিকাগুলো প্রকাশ করত, লেখক সাংবাদিকগণ এর ধারা-উপধারাগুলো নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা বা পর্যালোচনা করতেন; তা হলে শিক্ষক, অভিভাবক ও দেশের মানুষ এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করত। ব্র্যাকের হাতে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা তুলে দেওয়ার সরকারের কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা, দেশের প্রায় ৩৮,০০০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্র্যাকের মতো একটি এনজিওর হাতে তুলে দেওয়া আদৌ সম্ভব কিনা, এ ধরনের অভিযোগ ও কথাবার্তার কোনো ভিত্তি আছে কিনা; এ সব প্রশ্নের উত্তর নিজের পক্ষেই খুঁজে বের করা সহজ হত। তেমন কিছু করা হয়নি বলেই বিভ্রান্তি, সন্দেহ, আবেগ, অপপ্রচার ইত্যাদি বিষয় প্রাথমিক শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ মানুষের ওপর ভর করার সুযোগ পেয়েছে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে সমস্যার অন্ত নেই, অভিযোগের শেষ নেই। বাস্তবতা হচ্ছে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেই বললেই চলে। বিদ্যমান অবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষায় মানোন্নয়ন করা খুবই জটিল, দুরূহ এবং অনেকটাই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে প্রক্রিয়াটি শুরু করা খুবই জরুরি যে এতে কারো কোনো সন্দেহ নেই। প্রায়শই বলা হয়ে থাকে, শিক্ষকদের ঘন ঘন প্রশিক্ষণ নেওয়া আবশ্যক এবং কখনো কখনো স্কুলপ্রতি দু-একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ নিয়েও থাকেন। কিন্তু সেসব প্রশিক্ষণ খুব একটা সুশৃঙ্খল বা পরিকল্পিতভাবে হয় না, অনেকটাই দায়সারা গোছের হয়ে থাকে। ফলে ঐসব প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের তেমন একটা কাজে আসে না। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত কোনো প্রশিক্ষণ প্যাকেজের ধারণাই এ পর্যন্ত শোনা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে প্রচুর কথা ও উদ্যোগের কথা শোনা গেলেও বাস্তব চিত্র কিন্তু খুবই হতাশাজনক। অথচ আজকের দুনিয়ায় এসব ক্ষেত্রে ধারণা, অভিজ্ঞতা, অর্জন ও পথনির্দেশনা কত দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তা আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিক্ষকই জানতে পারেন না। সেইসব আধুনিক শিক্ষাচিন্তা, সেগুলোর গতিপ্রকৃতির সঙ্গেও যুক্ত হতে পারছেন না।

www.pathagar.com

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশকিছু উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণী প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন। তাদের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু করার জন্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষার জরাজীর্ণ অবস্থা ভেদ করা, আমলাতন্ত্রের শঠতা, দুর্নীতি ও প্রভাব অতিক্রম করা সম্ভব হচ্ছে না। অবশেষে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া তাদের করণীয় তেমন কিছু থাকে না। বস্তুত বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা এখন সংখ্যার বিচারে বেশ বড় হলেও এর মান কিন্তু দ্রুতই অবনতির দিকে ছুটে চলছে। এর লাগাম টেনে ধরা সত্যিই এখন কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ আদৌ সম্ভব হবে কিনা, তা নিয়েই যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাখাতে অর্থ, শিক্ষা পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, দক্ষ, আধুনিক প্রশিক্ষিত লোকবলের যেসব অভাব রয়েছে সেগুলোর একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা কল্পনা করা যাচ্ছে না। এসব গুরুতর সমস্যার সমাধান ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষায় কিছু অর্জন করাও সম্ভব নয়। প্রশিক্ষণের জন্য কোনোভাবে অর্থের সংস্থান করা গেলেও সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আবার দুটোরই সংস্থান করা গেলেও সেই মানের প্রশিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে? তা ছাড়া স্কুল ও শিক্ষকের সংখ্যাও তো একটি বিরাট ব্যাপার। নানা ধরনের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের নিয়ে কারো যেন মাথাব্যথা নেই। এর ওপর স্কুলের স্বাভাবিক পাঠদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রেও বিরাট সমস্যা রয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়নের বিষয়টি এখন মোটেও সহজসাধ্য বিষয় নয়।

কিন্তু তাই বলে বসেও থাকার আর কোনো সুযোগ নেই, আবার বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ নিয়েও কোনো সুফল অর্জিত হবে এমনটি আশা করা যায় না। যখন সত্যিই কোনো উদ্যোগ নেওয়ার প্রশ্ন আসে তখন তা যথাযথ, বাস্তাবায়নযোগ্য, ধাপে ধাপে হতে হবে; সকল শিক্ষকের জন্যেই সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা ও পরিকল্পনা থাকতে হবে। এর জন্যে সরকার ও শিক্ষকসমাজকে যৌথভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সেখানেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইতিবাচক মনমানসিকতা সকলের সমানভাবে থাকা প্রয়োজন। যাঁদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলাবোধ রয়েছে তাঁদের সহযোগিতা অন্যদের নেওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি থাকার কথা নয় বরং পারস্পরিক পরিচয় ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে উভয়েই সমৃদ্ধ হতে পারে। যে-কোনো উন্নতি ও অগ্রগতি এভাবেই হয়ে থাকে। অন্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও তা সঞ্চয় করার মাধ্যমেই আমরা আরো বেশি দক্ষ, অভিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল হতে পারি।

www.pathagar.com

আসা যাক মূল প্রসঙ্গে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চিঠির প্রথম প্যারাতেই বলা হয়েছে : "শিক্ষার মান উন্নয়ন তথা শিক্ষার্থীর হাজিরা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের হার বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতার গড় মান (Average standard competence) উন্নয়নসহ প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সহযোগিতায় ব্র্যাক কর্তৃক ২০টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় (ক) বেইসলাইন সার্ভে (Baseline Suvey); (খ) নির্ধারিত এলাকাভুক্ত সরকারি কর্মকর্তাগণ ও ব্র্যাক-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মধ্যে সহযোগিতা, সমন্বয়সাধন এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে ওয়ার্কশপ/ মতবিনিময় সভা আয়োজন; (গ) শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স কোর্স (বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, প্রাবেশিক, গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও বিজ্ঞান)) পরিচালনা; (ঘ) অভিভাবক ও এসএমসি সক্রিয়করণ; ও (ঙ) বিদ্যালয়ে শিখন উপযোগী পরিবেশ উন্নয়ন এবং যৌথ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও অগ্রগতি মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে।"

চিঠির পরবর্তী অংশে এসমস্ত কার্যক্রম কীভাবে সম্পন্ন করা হবে সে সম্পর্কে কর্মপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যেমন অনুচ্ছেদ (গ) এ শিক্ষকদের *প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স* সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

"নির্বাচিত উপজেলাসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (৬ দিন), সহকারী শিক্ষকদের জন্য গণিত, ইংরেজি (দুটি মডিউলে ৬ দিন করে মোট ১২ দিন), এছাড়া C-in-ed বিহীন শিক্ষকদের জন্যে ১২ দিনের প্রাবেশিক কোর্স পরিচালিত হবে। তবে প্রাথমিক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ ব্যাহত না করে উক্ত কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

এছাড়া প্রধানশিক্ষকদের জন্য প্রতিমাস অন্তর অন্তর সরকারি ছুটিকালীন সময়ে (শ্রেণীকার্যক্রম ব্যাহত না করে) অর্ধদিনের স্থানীয় পর্যায়ে ব্র্যাক অফিস/ইউ আর সি/ সুবিধাজনক স্থানে পর্যালোচনা সভা আয়োজন করা হবে। এছাড়াও প্রধানশিক্ষকদের জন্য বছরে ৩ দিনের রিফ্রেশার্সের আয়োজন করা হবে (শ্রেণীকার্যক্রম বিঘ্নিত না করে ছুটিকালীন সময়ে)।

সহকারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা দৃঢ়করণের নিমিত্তে প্রতি ২ মাস পর ১ দিন গণিত, ইংরেজি, বাংলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে রিফ্রেশার্স কোর্সের আয়োজন করা হবে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষক নির্বাচন করা হবে (শ্রেণী কার্যক্রম বিঘ্নিত না করে ছুটির দিনে)।"

www.pathagar.com

ক থেকে ট অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মোট ১১টি কর্মপরিকল্পনার গ অর্থাৎ তৃতীয় অনুচ্ছেদটি মাত্র আমরা উপরে তুলে ধরেছি। পত্রে প্রায় অনুরূপ আরো ১০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। সমগ্র পরিপত্রটি পাঠ করলে এ ধারণা পাঠকমাত্রই তৈরি হবে যে, প্রস্তাবনাটি বেশ সুপরিকল্পিত ও সুসমন্বিত। অনেকগুলো বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিচালনা কমিটি অভিভাবক শিক্ষা-কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একীভূত করা, দক্ষ ও অভিজ্ঞ করার আয়োজনসমৃদ্ধ।

প্রশ্ন উঠতে পারে : এই দায়িত্ব কেন ব্র্যাক পালন করবে, কেন সরকারি শিক্ষা-কর্মকর্তারা নয় ? এ নিয়ে নানাভাবে বিতর্ক হতে পারে, যুক্তিতর্কও করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব কোনো প্রশিক্ষক কর্মকর্তা বাহিনী নেই, যা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের রয়েছে। ব্র্যাক দেশব্যাপী তাদের নিজস্ব উদ্যোগে ব্যাপক প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে যা দেখভাল করার জন্যে প্রতিটি উপজেলায় তাদের ১০ থেকে ১৫ জন করে প্রশিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। যে-কোনো অবস্থাতেই ঐসব প্রশিক্ষককে এক উপজেলা থেকে অন্য উপজেলায় নিয়ে আসতে ব্র্যাকের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু সরকারি সংস্থার হলে এটি মোটেও সম্ভব হত না। সরকারি পর্যায়ে প্রতি উপজেলায় মাত্র ২/১ জন শিক্ষাকর্মকর্তা রয়েছেন যারা মূলতই প্রশাসনিক তদারকি করেন থাকেন। তাদেরকে প্রশিক্ষক হিসেবে কখনোই গড়ে তোলা হয়নি। ব্র্যাকের প্রশিক্ষকগণদের আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত হতে হয় না, অধিকন্তু মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় তারা আগাগোড়াই নিয়োজিত থাকেন, ব্যস্ত থাকেন। আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারে ব্র্যাকসহ বেশকিছু এনজিও সফল হওয়ার পেছনে এ ধরনের জনবল সৃষ্টি ও ব্যবহার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সরকারি উদ্যোগে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয় সত্য, কিন্তু সেগুলো আমলাতন্ত্রের বাঁধাধরা নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় বলে তা থেকে সাফল্য খুব বেশি অর্জিত হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমনটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই যে তা পত্রটি পড়ে ধারণা করা যাচ্ছে।

আমাদের হাজার হাজার প্রাথমিক শিক্ষক ব্র্যাকের প্রশিক্ষকদের নিজস্ব নিয়ম ও পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারেন। ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য চিন্তাভাবনাগুলো কেমন তা জানতে শিক্ষকদের আপত্তি থাকার কথা নয়। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ উন্নতমানের না হলে অবশ্যই অভিযোগ আনা যাবে, কিন্তু কার্যক্রমটা যেখানে এখনো শুরুই হতে পারেনি সেখানে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রমের কিছুই না-জেনে, না-বুঝে আগাম মন্তব্য করা, সমালোচনা করা শুভ নয়, বরং অশুভ ও গতানুগতিক নেতিবাচক চিন্তারই ইঙ্গিত বহন করে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশনসহ এ পর্যন্ত যে ৬টি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছিল তার একটি কমিশনকেও শিক্ষকদের একাংশ এবং আমলাতন্ত্র সহজে মেনে নেয়নি; নানা ধরনের সমালোচনা, অপপ্রচার ও বিরোধিতা করা হয়েছে, আন্দোলনও হয়েছে। আসলে শিক্ষকদের যত ক্ষুদ্র অংশই হোক না কেন তারা যখন এতবড় উদ্যোগ ও কাজের বিরোধিতা করেন, আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরেন, তখন জনমনে নানা প্রশ্ন ও বিভ্রান্তি শুরু হয়; পত্রপত্রিকায় নানা সংবাদ, লেখালেখি শুরু হয়; এতে সরকার শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশের সুযোগ পায়; আমলাতন্ত্র সে পথেই সরকারকে হাঁটতে উপদেশ দিয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক শিক্ষক বা শিক্ষক সমিতির বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণ করার সুযোগ পায় প্রবল ক্ষমতাধর আমলাতন্ত্র এবং শেষপর্যন্ত সরকারগুলো শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন থেকে পিছু হটে আসে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এভাবেই শিক্ষানীতি থেকে দূরে সরে গেছে। শিক্ষানীতিবিহীন শিক্ষাব্যবস্থা মানে কোনো শিক্ষাই নয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্যয়ের পেছনে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষানীতির আগাগোড়া অনুপস্থিতি বড় কারণ, এটি অনেকেই এখনো বুঝতে চান না বা পারেন না। আমাদের শিক্ষকসমাজের একটি অংশ এমন একটি অবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে জেনে না-জেনে, বুঝে না-বুঝে সহায়তা করছে, যা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ব্র্যাকের সঙ্গে সরকারের বর্তমান যৌথ উদ্যোগকে ভেতর থেকে না-দেখে না-বুঝে যারা শুধু আবেগঘন লেখালেখি করছেন, বিবৃতি দিচ্ছেন; শিক্ষক, অভিভাবক ও জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন; তাদের পেছনে আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরের কোনো অপশক্তি, রাজনীতির ভেতরের কোনো অপশক্তি জড়িত নেই তেমনটি বিশ্বাস করা যায় না। সকলকে তাই অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে—যা কিছু ভালো, শিক্ষা, দেশ ও জাতির জন্যে প্রয়োজন তা গ্রহণ ও শেখার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

শিক্ষাবার্তা ২০০৮, সম্পাদক এ. এন. রাশেদা

www.pathagar.com

ভুলে ভরা পাঠ্যবই

প্রথম আলো গত ৩০ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত তাদের শিক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধানী প্রতিবেদক শরিফুজ্জামান পিন্টুর 'ভুলে ভরা পাঠ্যবই' শীর্ষক ৫ কিস্তির একটি চমৎকার প্রতিবেদন ছাপিয়েছেন। এজন্য কর্তৃপক্ষ এবং সাংবাদিক পিন্টুকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। বিশেষভাবে ভালো লেগেছে যখন জানতে পেরেছি প্রথম প্রতিবেদনটি ছাপা হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ডেকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে এবং সেভাবে কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলেও *প্রথম আলো*তেই সংবাদ ছাপা হয়েছে। এজন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়। তবে এ ঘটনটি আমাদের একটি রূঢ় সত্য জানিয়ে দিচ্ছে, তা হচ্ছে এদেশে সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকে নির্দেশ না দিলে কোথাও কিছু হয় না।

দেশের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে নানা সমস্যা, ভুলত্রুটি, ইতিহাসবিকৃতির অভিযোগ বেশ পুরোনো; নতুন কিছু নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি অন্তত ১৯৮৫ সালে দেশে ফিরে আসার পর থেকে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাসবিকৃতিসহ পঠনপাঠনের নানা সমস্যা নিয়ে লেখালেখি করে আসছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হতে না-দেখে বারবার হতাশ হয়েছি। কোনোকিছু না-হওয়ার অন্যতম কারণ আমার বিবেচনায় একটিই, তা হচ্ছে অতীতে সরকারের উচ্চপদে বসা কেউ এমন করে নির্দেশ হয়তো দেননি। এখন সরকারপ্রধানের নির্দেশ পেয়ে শিক্ষামন্ত্রণালয় নড়েচড়ে উঠেছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডও (এনসিটিবি) কাজ শুরু করেছে। কথা হচ্ছে, ভবিষ্যতেও কি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এনসিটিবিকে এভাবে সরকারপ্রধান থেকে নির্দেশ দিতে হবে, নাকি তারা আগের অবস্থাতেই ফিরে যাবে; সরকারের দলীয় ইচ্ছা-অনিচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক বিকৃত তথ্যে ভরাট করতে আজ্ঞাবাহী হয়ে উঠবে? বস্তুত, এনসিটিবিকে প্রেষণে আনীত অবিশেষজ্ঞ, দলীয় অনুগত ক্যাডার-শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন, আমলাদের নিকটজনদের হাত থেকে মুক্ত করা না গেলে এখান থেকে পাঁচ পৃষ্ঠারও একটি মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক বের করা যাবে না—এ ধরনের মতামত রাখার জন্য আমি দুঃখিত, না রাখতে পারলে খুশি হতাম।

www.pathagar.com

মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। শরিফুজ্জামান পিন্টুর ৫ কিস্তির প্রতিবেদনের সর্বশেষটিতে আলোচিত বেশ কয়েকটি সমস্যার মধ্যে মাত্র দু-তিনটি বিষয় নিয়ে আমার মতামত রাখছি। জানি না কে কীভাবে তা গ্রহণ করবেন।

আমাদের এনসিটিবি যেসব পাঠ্যপুস্তক লিখিয়ে নেয়, তার সঙ্গে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কয়েকবার জড়িয়ে পড়েছিলাম। তাই অনেক তিক্ত, বিরক্তিকর, ক্ষোভ ও দুঃখের অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। সেসব লিখে লাভ নেই। তবে যে প্রক্রিয়ায় বইগুলো লেখানো হচ্ছে, তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। একটি পাঠ্যপুস্তক লেখার জন্য লেখকদের যে সময় দেওয়া হয়, তা মোটেও মেনে নেওয়া যায় না। বলে রাখি, তা ছয় থেকে আট বা নয় মাসের বেশি হয় না সাধারণত। কিছু চেনামুখ তাই ঘুরেফিরে পুস্তক লেখার টেন্ডারে সাড়া দেন, সুযোগ পান। মূল্যায়নকারীদের তালিকাও সম্মানজনক নয়, মূল্যায়নকারীদের প্রতিবেদনও খুব একটা আকর্ষণীয় নয়, পুস্তক সম্পর্কে যথেষ্ট মতামত পেতে সাহায্য করে না। ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞানের মতো বইগুলোর (স্পর্শকাতর বলে অভিহিত) বিশেষ কিছু অধ্যায়ে কী লেখা হবে, তা বিশেষ একটি জায়গা থেকে লাল কলমে লিখে দেওয়া হয় (আমার হাতে তেমন কপি রয়েছে)। সেভাবেই এনসিটিবির পাঠ্যপুস্তক লেখানো, পার্যালোচনা করা, অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতকাল সে-কারণেই মানসম্মত পাঠ্যবই ছাত্রছাত্রীরা পায়নি। নেপথ্যের এই প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ, দুর্নীতিগ্রস্ত, দায়সারা গোছের, অদক্ষ, শিক্ষার দর্শন থেকে দূরে থাকা আমলা-নিয়ন্ত্রিত উপায়ে চলেছে। এরই মাশুল তাই দিতে হচ্ছে দেশের ছাত্রছাত্রী তথা জনগণকে। অথচ উন্নত দুনিয়ায় একটি পাঠ্যপুস্তক লেখা, দেখা, মূল্যায়ন, সংশোধনসহ নানা প্রক্রিয়ায় অসংখ্য দক্ষ, অভিজ্ঞ বিষয়বিশেষজ্ঞ জড়িত থাকেন; প্রয়োজনে দু-তিন বছর সময় নিয়ে প্রতিটি বই গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নীত করে, তবেই তা ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমরা এ কাজে তেমন যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ লোকদের খুব একটা যুক্ত করার চেষ্টা করি না। যেসব নামি-দামি ব্যক্তির নাম বইয়ের ভেতরে লেখা থাকে, তাঁদের নামটা যতটা ব্যবহার করা হয়, তাঁদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরামর্শ কতটা ব্যবহার করা হয়, তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এখানেও নানা অনিয়ম, দুর্নীতি রয়েছে বলে প্রচুর অভিযোগ আছে। বইয়ের ভেতরে যাঁদের নাম থাকে তাঁদের দায়িত্ব নিতে হয়, ভুল-ভ্রান্তির জন্য তাঁদেরও জবাবদিহি করতে হয়—এমন ব্যবস্থা থাকতে হয়; দুঃখজনক সত্য হচ্ছে, তা দেখা যাচ্ছে না।

২০০৪ সালে দেশে একমুখী শিক্ষানীতি চালু করা নিয়ে অনেক অঘটনের জন্ম দেওয়া হয়েছিল। অনেক টাকাপয়সার লোপাট হয়েছে বলে পত্রপত্রিকায় প্রচুর লেখা হয়েছিল। স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তক মূল্যায়ন কমিটি (আইটিইসি) কর্তৃক সুপারিশকৃত এবং এনসিটিবি কর্তৃক ২০০৫ সালে নবম-দশম শ্রেণীর জন্য প্রতিটি

www.pathagar.com

বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়। তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলেন নামিদামি সব পুস্তকব্যবসায়ী। আমলাদের দুর্বুদ্ধির কাছে তাঁরা প্রায় সবাই ধরাশায়ী হন, মার খান। আসলে আমাদের আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত ছিল স্কুলপর্যায়ে আমরা একই বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তক দেব কি না, দেওয়ার উপকারিতা কী হবে, ক্ষতি কী হতে পারে—তা গভীরভাবে ভাবা।

হ্যাঁ, এনসিটিবির নিজস্ব পাঠ্যপুস্তক নিয়ে অভিযোগ আছে বিস্তর। এই অজুহাতে স্কুলপর্যায়ে একই বিষয়ে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তক বেসরকারি উদ্যোগে লিখিয়ে বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেওয়ার মতো পাগলামি, কাণ্ডকীর্তি একবিংশ শতাব্দীতে দ্বিতীয়টি আর হতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই যেখানে নির্ধারিত একটি করে পাঠ্যবই কিনতে পারে না, এমতাবস্থায় বাজারে যত খুশি তত বই ছাড়ার অনুমতি দিলে স্কুলপর্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করবে কে? তা ছাড়া এ নিয়ে পুস্তক মালিক-ব্যবসায়ী, শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষকসমাজের মধ্যে বই-পুস্তক দেওয়া-নেওয়ার নামে যে আর্থিক অবৈধ লেনদেন শুরু হবে, তাতে আসল উদ্দেশ্য মোটেও সফল হওয়ার নয়। সেক্ষেত্রে বইয়ের মানের চেয়ে প্রকাশকের দেওয়া অর্থের পরিমাণই তালিকায় বইয়ে নাম অন্তর্ভুক্তি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াবে—এ নিয়ে আমার মোটেও সন্দেহ নেই। স্কুলপর্যায়ে একই বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের পর্বে আমরা এখনো প্রবেশ করতে পারিনি। সেক্ষেত্রে মানসম্মত একটি বই ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করাটাই এনসিটিবির জন্য কম নয়। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বিষয়টি কিছুটা স্বতন্ত্র। সেখানেও মানসম্মত বইয়ের বিস্তর অভাব রয়েছে, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাছাড়া সেই পর্যায়ে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী এখন বাজারের গাইড বই, কোচিং এবং নানা ধরনের অনির্ভরযোগ্য নোটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় মানসম্মত পাঠ্যপুস্তক খুব একটা কেনাবেচা হচ্ছে না, ছাত্রছাত্রীরা পড়ছে না। পরীক্ষায় যদি এভাবে পাস করা যায়, তাহলে ছাত্রছাত্রীরা মানসম্মত পাঠ্যবই পড়বে কেন?

এনসিটিবির কথা বারবার আলোচিত হয়েছে, হচ্ছে। গুণগত মানে শিক্ষার এতবড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি আজও গড়ে উঠতে পারেনি, দাঁড়াতে পারেনি। কারণ যে সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে, তার অনুগত আমলা, মন্ত্রী, নেতা-নেত্রী, তাঁদের নিকট-আত্মীয়স্বজন এতে প্রেষণে আনীত হয়েছেন। তাঁরা এনসিটিবিতে সবাই চাকরি করেছেন বা করছেন, প্রতিষ্ঠানের কাজ করেননি; এনসিটিবির মতো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তাঁদের কাজ বা যোগ্যতা আছে কিনা তা মোটেও দেখা হয়নি। প্রতিষ্ঠানটি যদি এর নিজস্ব চরিত্রে না গড়ে ওঠে, না পরিচালিত হয়, এর জনবল যদি সেভাবে নিযুক্ত না হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠান অনন্তকাল ভেরেণ্ডাই ভাজাবে।

www.pathagar.com

এনসিটিবি একটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকবিষয়ক বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাবিজ্ঞানের লেখাপড়া এবং গবেষণার বাইরের লোকজনের সঙ্গে এর সম্পর্ক ততটা নিবিড় হওয়ার কোনো কারণ নেই। এখানকার প্রতিটি ডেস্কেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মৌলিক পড়াশোনা ও গবেষণা থাকতে হবে। পৃথিবীজুড়ে শিক্ষাবিজ্ঞান এখন উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণাক্ষেত্রে বিশেষভাবে ভূমিকা রাখছে; প্রতিটি দেশেই পাঠ্যপুস্তক রচনা, মূল্যায়ন, এ সংক্রান্ত গবেষণাসহ যাবতীয় কাজে বিশেষ এই জ্ঞান-শাখার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে এইসবের কোনো বালাই নেই। কোনো এক সরকারি কলেজে প্রভাবশালী কেউ থাকলে, তার দলীয় পরিচয় থাকলে তাকে ঢাকায় আনার জন্য এনসিটিবি এবং এ ধরনের নানা প্রতিষ্ঠানকে অপব্যবহার করতে আমাদের হর্তাকর্তাদের বিবেকে বাধে না। যুগ যুগ ধরে তা-ই করা হয়েছে, হচ্ছে। এবার আল্লাহর ওয়াস্তে জাতিকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্তি দিন; যার কাজ তাকে করতে দিন, অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে দিন। এনসিটিবিকেও সে-ধরনের একটি স্বাধীন একাডেমি হয়ে উঠতে দিন, তাহলেই একদিন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এমন অভিযোগ আর শুনতে হবে না।

প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০০৮

www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি

২০০১ সালের ১০ অক্টোবর জোট সরকার ক্ষমতায় আরোহণের পর যে ক'টি বিষয়ে সবচাইতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কালো হাত দেয়া হয়েছিল, তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধীত পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বিএনপি-জামায়াতের ডিজাইন মোতাবেক উপস্থাপন করা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ বছর ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশিত ১৮টি পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষকরূপে এককভাবে জিয়াউর রহমানকে প্রতিষ্ঠা করা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণকে গুরুত্বহীন করে দেখানো, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে ভাবার অবস্থান থেকে সরিয়ে দেয়া, জিয়াউর রহমানকে সেই আসনে প্রতিষ্ঠা করা, মুক্তিযুদ্ধে ১১টি সেক্টর কমান্ডকে মূল সামরিক শক্তি হিসাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে এটিকে মুক্তিযুদ্ধ নয় বরং সামরিক যুদ্ধে উপস্থাপন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের সামনে জামায়াত-ছাত্রসংঘের ভূমিকাকে আড়াল করা, বুদ্ধিজীবী হত্যার সঙ্গে আলবদর, আলশামসের জড়িত থাকার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়া ইত্যাদি লক্ষ্য নিয়েই মুক্তিযুদ্ধকে পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

অবশ্য সত্তর দশকের শেষ এবং নব্বইয়ের দশকের শুরুতে রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার সময়ও বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে হস্তক্ষেপ করেছিল। তখন তাদের লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের একজন ঘোষণাকারী, অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে জিয়াউর রহমানকে দেখানো। তখন বঙ্গবন্ধুকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়নি, কিংবা জিয়াউর রহমানের ঘোষণাকে ২৭ তারিখের পরিবর্তে ২৬ মার্চ দেখানো হয়নি। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পাঠ্যপুস্তকে লেখা ও লেখানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

সেই পরিকল্পনা এখনও শেষ হয়নি। এই পরিকল্পনার সঙ্গে বিএনপির ঘনিষ্ঠ কিছু সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক এবং আমলা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছেন—এটি পাঠ্যপুস্তকে লেখা রচনাবলি থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া এনসিটিবির চেয়ারম্যান কর্তৃক লিখিত পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা থেকেও স্পষ্ট হচ্ছে।

www.pathagar.com

লেখা হয়েছে : "প্রফেশনাল কমিটি কর্তৃক পরীক্ষানিরীক্ষার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের মাধ্যমে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর উক্ত কমিটি পুস্তকটির চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।" (ভূমিকা, *পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ*, পঞ্চম শ্রেণী, অক্টোবর ২০০৫)। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে বিকৃতভাবে লেখা এবং উপস্থাপনের বিষয়টি বর্তমান জোট সরকার কতখানি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে, কোথা থেকে বইগুলো সেভাবে পরীক্ষিত-নিরীক্ষিত হয়ে আসছে।

তবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিকৃতি নিয়ে বর্তমান জোট সরকার এখনও স্থির হতে পারেনি। তারা অব্যাহতভাবে তথ্যবিকৃতি ঘটিয়ে এ কাজটি করে যাচ্ছে। এর সর্বশেষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ২০০৬ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যবই *পরিবেশ পরিচিতি সমাজ* বইটিতে।

পঞ্চম শ্রেণীর 'পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ' বইটি এ বছর সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে। এর বিষয়বস্তুতেও আনা হয়েছে বড় ধরনের পরিবর্তন। পরিবর্তন আনতে গিয়ে 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' (১২৬-১৩৮ পৃ) নামে একটি অধ্যায় যুক্ত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যুক্ত হওয়া, বিশ্বাসী যে-কোনো মানুষের কাছেই এটি একটি 'শুভ উদ্যোগ' বলে বিবেচিত হওয়ার কথা। কিন্তু ১২ পৃষ্ঠার এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে বিএনপি-জামায়াতীকরণ এবং সামরিকীকরণ করার ফলে এতে মুক্তিযুদ্ধকে আর খুঁজে পাওয়ার কোনো সুযোগ থাকল না। লেখাটি দেখার পর মনে হবে যে, এমন অধ্যায়টি থাকার চাইতে না-থাকাই ভালো ছিল—অন্তত শিশুরা মুক্তিযুদ্ধের মিথ্যা, বিকৃত তথ্যসংবলিত 'ইতিহাস' পড়া থেকে তো মুক্তি পেত! কিন্তু জোট সরকার কর্তৃক পরিকল্পিতভাবেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বছর বছর পাঠ্যপস্তুকে নতুন নতুন মিথ্যা তথ্যে লেখানো হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের পড়তে বাধ্য করছে।

'আমাদের মুক্তিযুদ্ধ' (১২৬-১৩৮পৃ.) শীর্ষক অধ্যায়ের শুরুতেই পাকিস্তান আমলের ইতিহাস কত লঘুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার নমুনা একটু লক্ষ্য করুন। লেখা হয়েছে : "পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্ন কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হতে থাকে।" (পৃ.১২৬)। মনে হচ্ছে লেখক-সম্পাদকগণ খুবই লজ্জা পাচ্ছিলেন সত্যকথা লিখতে। আসলে মাথায় যাদের পাকিস্তানের ভূত বসে আছে, তাদের কলম থেকে পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি, নির্যাতন, শাসন-শোষণ সম্পর্কে সত্যকথা বের করা কত কষ্টের তা না-বোঝার কোনো উপায় নেই। এই পৃষ্ঠাতে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সম্পর্কে মাত্র একটি বাক্য স্থান পেয়েছে। লেখা হয়েছে : "১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

উদ্যানে) এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।" (প্র..১২৬)

ব্যস্! এখানেই শেষ! বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের এটিই কি একমাত্র বিষয় ছিল? ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাক দেয়া, স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান, তিনি যদি হুকুম দেবার নাও পারেন সেই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি নেবার আহ্বান সংবলিত বিষয়গুলোকে এই বইতে সচেতনভাবে আড়াল করা হয়েছে। কেন তা করা হয়েছে তা বোঝা যায় একটু পরেই।

২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনীর আক্রমণের ফলে সৃষ্ট অবস্থাটিকে এভাবে পাঠ্যবইটিতে উপস্থাপন করা হল, লেখা হল, "এ রাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। সুর্নিদিষ্ট দিকনির্দেশনা ও নেতৃত্বের অভাবে জনগণ প্রথমে কিছুটা দিশাহারা ও হতচকিত হয়ে পড়ে। এ সময় ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত ২.১৫ মিনিটে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তৎকালীন ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড ইন কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া ব্যাটালিয়ন কমান্ডার লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন এবং ব্যাটালিয়নের সমস্ত বাঙালি অফিসার, জেসিও ও জোয়ানদের একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাকে তা জানানো হয়।" (সূত্র : *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ-জুন/ ২০০৭, পৃ. ২) এরপর ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের কালুর ঘাটস্থ বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান দেশবাসীর উদ্দেশে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং সকলকে যুদ্ধে যোগ দেয়ার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে তাঁর এই ঘোষণা ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এ ঘোষণার মাধ্যমে সমগ্র দেশবাসী আশার আলো খুঁজে পায়। জাতির সেই অসহায় মুহূর্তে মেজর জিয়ার এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্যদিয়ে প্রথম দেশের মানুষ জানতে পারে বাঙালি সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। ফলে তাদের শক্তি, সাহস ও মনোবল অনেকগুণ বেড়ে যায়। দেশের সকল স্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবে ২৬শে মার্চ প্রতিরোধের সংগ্রামের মধ্যদিয়ে শুরু হয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। ২৬শে মার্চ তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস। "(পৃ-১২৭-১২৮)

পাঠকদের জানার সুবিধার্থে ২০০১ সাল পরবর্তী গত ৬ বছর *পরিবেশ পরিস্থিতি (সমাজ)* বইতে জোট সরকারের তস্যরা কী লিখেছিল তা উদ্ধৃত করছি। লেখা হয়েছিল, "২৫ মার্চ কোনো ঘোষণা না দিয়েই ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ফিরে যান পশ্চিম পাকিস্তানে। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে সেই রাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঐ রাতেই তারা

www.pathagar.com

শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেন। দিকনির্দেশের অভাবে দেশবাসী হতবুদ্ধি ও দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন এগিয়ে এলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তিনি ২৬ মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। (*পরিবেশ পরিচিতি, সমাজ,* ২০০১-২০০৪ সংস্করণ, পৃ.১৭)।

পাঠক এবার দেখুন একই সরকারের আমলে একই বিষয়ের ওপর একই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়েছে। আসলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জোট সরকার নিজেই কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। কারণ, বিশ্বাস করার মতো তথ্যের ওপর বিএনপি জোট সরকারের আস্থা নেই। আবার নিজেরা জিয়াউর রহমানকে যে আসনে বসাতে চায় সেই আসনের কোনো তথ্য কারও কাছেই নেই, স্বয়ং জিয়াউর রহমানের কাছেও ছিল না। এখন তাই মক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রে হাত দেয়া হল। কিন্তু মূর্খ তো জানে না সে কতটা মূর্খ, কতটা গর্দভ; সে হয়তো ভাবে সে নিজে খুবই চালাক মানুষ, তাই সে পণ্ডিতও(!)বটে, তাই সে দলিলপত্রের মধ্যে একটা কিছু লিখে দিয়ে এখন বোঝাতে চাচ্ছে যে, এটি তো দলিল(!) থেকে নেয়া কথা। যেহেতু দলিল থেকে নেয়া, তাই ইতিহাসবিকৃতির কোনো সম্ভাবনা নেই। দুনিয়ার মূর্খরা এভাবেই নিজেদের মহাজ্ঞানী ভাবে, কিন্তু জ্ঞানের রাজ্যে তাদের কোনো স্থান নেই, হতেও পারে না। জ্ঞানের রাজ্যে জ্ঞানের সাধনাই করতে হয়, জ্ঞানের সততার ওপর বিশ্বাসও রাখতে হয়। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, দল বা আদর্শকে কেউ চাইলেই বড়, মহাবড় বা অসীম করে লেখানো যায় না, হাত দেয়া যায় না, বানানোও যায় না, বানালে সেটি জাল দলিল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র, তৃতীয় খণ্ডে ২০০৪ সালের পুনর্মুদ্রিত খণ্ডে যে সূত্রের কথা পাঠ্যপুস্তকটিতে উল্লেখ করা হয়েছে সেটি কোনো দলিলের নয়, সেটি জিয়াউর রহমানের নামে ২০০৪ সালে বানানো একটি জাল দলিল মাত্র। ১৯৭১ সালে মেজর জিয়াউর রহমান ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে যে-ভাষণ দিয়েছিলেন সেই ভাষণটির লিখিত কাগজটি তখনই নিরাপত্তার জন্য নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। সেই ভাষণের মূল টেপও কোথাও নেই। এমনকি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত উক্ত দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ডেও জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের যে ভাষণটি মুদ্রিত হয়েছিল, তার নিচে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, "মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল (পৃ.২)।" সুতরাং প্রশ্ন ওঠে : উক্ত খণ্ডে জিয়াউর রহমানের নামে ইংরেজিতে যে বক্তব্যটি ছাপা হয়েছে তার উৎস কী, এটি কখন, কীভাবে লিখিত হয়েছিল। একথা

www.pathagar.com

সম্পাদনা পরিষদ কোথাও লেখেনি, উল্লেখও করেনি। সাধারণত যাঁরা ঐতিহাসিক দলিলপত্র সম্পাদনা করেন তাঁরা যে-কোনো দলিল নিয়ে কোনো সমস্যা বা বিভ্রান্তি থাকলে তা সম্পাদনা পরিষদের মতামত হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন। তা করা হলে পরবর্তীকালে যাঁরা দলিলটি ব্যবহার করেন তাঁরা স্পষ্ট একটি ধারণা নিয়েই তা করে থাকেন। আমাদের এখানে ইতিহাস বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত জ্ঞানকে কেউ কাজে লাগাতে চান না, খুব একটা গুরুত্ব দিতেও চান না। ফলে বিভ্রান্তি, বিকৃতি এবং বিতর্কগুলো অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকে। আসলে আমরা ঐতিহাসিক দলিল সংরক্ষণ, গ্রন্থনা এবং ব্যবহারের নিয়মকানুন সম্পর্কেই খুব একটা সচেতন নই; জানা এবং পড়াশোনাও খুব একটা নেই। তার ওপর দিন দিন বাড়ছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা কতখানি দুরূহ ব্যাপার তা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত সংস্করণে স্বাধীনতার ঘোষণার আগের দলিলপত্রকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে; যাঁরা করেছেন তাঁরা সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন বা কাজ করেছেন এমন কথাও স্পষ্ট নয়। কেননা বর্তমান সংস্করণে প্রথমেই ২৬ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর নামে স্বাধীনতা ঘোষণার ইংরেজি ভাষায় রচিত যে দলিলটি পূর্ববর্তী সংস্করণে ছিল তা বাদ দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে নতুন সংস্করণের ৪র্থ পৃষ্ঠায় প্রত্যয়ন কমিটির অভিমত বলে একটি বক্তব্য দেয়া হল—এ সম্পর্কে লেখার শেষদিকে আলোচনা করব। পুনর্মুদ্রিত খণ্ডের ১ পৃষ্ঠায় 'মেজর জিয়ার প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা' নামে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় একটি 'দলিল' (!) ছাপা হয়েছে। প্রথম মুদ্রণে জিয়াউর রহমানের নামে ২৭ মার্চ তারিখের দলিলটির সঙ্গে এর সামান্যতমও মিল নেই। তাহলে জিয়াউর রহমানের নামে এই দলিলটি এল কোত্থেকে? সূত্র হিসাবে লেখা হল 'বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র,চট্টগ্রাম'। এখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' কথাটি সংযোজিত যে ভাষণ বলে এটিকে দাবি করা হয়েছে—১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমানের ভাষণ যাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন তাঁরা কেউই এমন ভাষণ শুনেছেন বলে মনে পড়বে না। জিয়াউর রহমানের ঐ ভাষণের মূল কপি কোথাও নেই এটি যেমন সত্য, তেমনি ঐ ভাষণের মূল বক্তব্য ইতোপূর্বে বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, শামসুল হুদা চৌধুরীসহ আরও অনেকের লেখাতেই কমবেশি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁরা তাঁদের স্মরণশক্তির ওপর নির্ভর করে ২৫/৩০ বছর আগেই কিছু কথা লিখেছেন; তাঁরা কেউই বিপ্লবী বেতারের টেপ, কাগজপত্রের সন্ধানও পাননি, তাই হুবহু কোনো বক্তব্য কেউ উদ্ধারও করতে পারেনি।

তবে এখানে জিয়াউর রহমানের 'প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা' হিসাবে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্যতার সমান্যতম প্রমাণও রাখতে পারেনি। কথিত এই

www.pathagar.com

ঘোষণার নিচে একটি চিহ্ন দিয়ে লেখা হয়েছে : "২৬ মার্চ ১৯৭১ রাত্র ২.১৫ মিনিটে (২৫শে মার্চে মধ্যরাতে) তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান-এর নেতৃত্বে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং মেজর জিয়া ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেফতার করেন। এরপর তিনি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়ন অফিসার, জেসিও এবং জোয়ানদের একত্রিত করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সাথে সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের তা জানানো হয় (পৃ.১)।" বলে রাখি, এটি কোনো দলিলের বক্তব্য নয়, কারো-না-কারো লেখা বর্ণনা, যার কোনো সূত্র নেই, নামও নেই। এমন একটি বিষয়কে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ঘোষণা হিসাবে লেখা, সূত্র হিসাবে দলিলপত্রের উল্লেখ করা কতটা হাস্যকর তা বলাই বাহুল্য। তবে জোট সরকারের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়ন কমিটি রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েই কাজটি করেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। তারা জানে আমাদের দেশে মূল দলিলপত্র খুলে দেখার অভ্যাস খুব কম লোকেরই আছে। সুতরাং এরকম একটি সূত্রের কথা উল্লেখ করা হলে কেউ মূল বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক করতে সাহস পাবে না। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবসহ যাঁরা পাঠ্যপুস্তকে তথ্য যাচাই-বাছাই করেছেন তাঁরা এ-ধরনের বিবেচনা নিয়েই কথাগুলো পাঠ্যপুস্তকে লিখতে অনুমোদন দিয়েছেন।

দলিলে যে ভাষ্য লেখা হয়েছে তা আগাগোড়া কতটা মিথ্যা তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। মেজর জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে বা ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে যদি কোনো বিদ্রোহ করে থাকেন, সেরকম বিদ্রোহ চট্টগ্রামে ২৫ মার্চ রাত ১১টার পর ক্যাপ্টেন রফিকসহ আরও অনেকেই করেছিলেন। সারাদেশেও তেমন বিদ্রোহ অসংখ্য মানুষ করেছেন কিন্তু বিদ্রোহ করা আর স্বাধীনতা ঘোষণা করা মোটেও এক কথা নয়। তা ছাড়া মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর কমান্ডার জানজুয়ার নির্দেশ মোতাবেক সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাস করতে আগ্রাবাদ গিয়ে কীভাবে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেই ঘটনা মেজর রফিকের লেখা 'লক্ষপ্রাণের বিনিময়ে' (পৃ. ১০৮) বর্ণিত আছে। আবার তিনি রেজিমেন্টে ফিরে গিয়ে অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে পরামর্শক্রমে লে. কর্নেল জানজুয়াকে বন্দি করার সিদ্ধান্ত নিলেও ক্যান্টনমেন্টে নানাধরনের উত্তেজনা, আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণের খবরে মেজর জিয়া এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত হওয়া বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরা শেষরাতে পটিয়ার উদ্দেশে ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করেন। পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রে খুব কাঁচা হাতে লেখা হল : সাথে সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের, তা (স্বাধীনতার ঘোষণা) জানানো হয়।"

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে মেজর জিয়া একজন বাঙালি সামরিক অফিসার ছিলেন। তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের তেমন কোনো জানা পরিচয় বা যোগাযোগ ছিল না। বরং তৎকালীন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলামের সঙ্গে কারও কারও যোগাযোগ যে ছিল তা তাঁর লেখা বইতে প্রমাণ মেলে। তা ছাড়া এখানে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের যে-কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে সেটিও খুবই যুক্তি ও বাস্তবতাহীন বক্তব্য। সেই রাতে প্রশাসন বলতে কাদের বোঝাব, প্রশাসনের কর্মকর্তারাই বা কারা, তাদের তখন কী করণীয় ছিল! ২৫ মার্চের গভীর রাতের পর প্রশাসন বলতে কিছু ছিল বলে শিশুরাও বিশ্বাস করে না। আমাদের দলিল-জালকারী লেখকদের মেধার মান এতই কম যে, তাঁরা এমন একটি যুক্তি বাস্তবতাবর্জিত, হীন বক্তব্য লিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বানিয়েছেন যা ভাবাই কষ্টকর। পণ্ডিত আর কাকে বলে!

পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্রে মেজর জিয়ার ২৮ মার্চ তারিখে দেয়া স্বাধীন বাংলা বেতার ভাষণের যে দলিলটি ছাপা হয়েছে, তা আগের দলিলে ২৭ মার্চের দলিল বলে উল্লেখ আছে। তাতে 'on behalf of Sheikh Mujibur Rahman' কথাটি লেখা আছে। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কেউ স্বাধীনতার ঘোষণা করলে তাকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' কোন্ যুক্তিতে করা যায়? যাঁরা করেন তাঁরা আর যাই হোক যুক্তিবাদী মানুষ কিনা সন্দেহ হয়। তবে পাঠ্যবইতে এবার দুটো তারিখের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে জিয়াউর রহমান ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে (২.১৫ মিনিটে) সৈনিকদের নিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন, এবং ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতাযুদ্ধের ঘোষণা দেন। তবে ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসকে যেহেতু এখন অস্বীকার করা যাচ্ছে না, তাই জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরের একটি কেচ্ছা বানানো হল, নতুবা 'স্বাধীনতার ঘোষক' কথাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। সে কারণেই এত কসরত করা, এত দলিল জাল করা, এত কাগজপত্র ছুড়ে ফেলা, প্রত্যয়ন কমিটির অভিমত(!) বলে বিভিন্নজনের বক্তব্য দিয়ে জিয়াউর রহমানকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষক বলে উপস্থাপন করা।

এমনকি এই প্রত্যয়ন কমিটি মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণকেও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণে জিয়াউর রহমানের প্রসঙ্গে বলা একটি শব্দকে তুলে দিয়ে বর্তমান পুনর্মুদ্রিত কমিটি অন্য একটি শব্দ জুড়ে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন ১১ এপ্রিল তারিখে। যুদ্ধের সময় মানুষকে সাহস যোগাতে নেতৃবৃন্দ যে বক্তব্য দেন তা ব্যবহারে সাবধানতা

www.pathagar.com

অবলম্বন করতে হয়, তা সবসময় আক্ষরিক অর্থে ধরাও যায় না। তাজউদ্দিন আহমদের ঐ ভাষণে বঙ্গবন্ধু কীভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন তা তিনি শুরুতেই উল্লেখ করছিলেন। নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর গঠিত বিভিন্ন সেক্টরকে মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য কিছুটা বর্ণনা দিয়েছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ।

তাজউদ্দিন আহমদের নামকে উদ্ধৃত করে দলিলে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম দিয়েছেন যা সম্পর্ণ ভুল এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাজউদ্দিন আহমদের মূল ভাষণ বাদ দিয়ে পুনর্মুদ্রিত দলিলপত্র ভারত থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ ডকুমেন্টকে উদ্ধৃত করে যে-কথা লেখা হয়েছে তা তাজউদ্দিন আহমদের মূল ভাষণের সঙ্গে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্নভাবে অনূদিত হয়েছে। এছাড়া তাজউদ্দিন আমাদের মূল ভাষণের একটি শব্দ পরিবর্তন করে নিজেদের পছন্দের একটি শব্দ জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাজউদ্দিন আহমদের ভাষণে লেখা ছিল 'স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কণ্ঠস্বর' (*দলিলপত্র খণ্ড* তিন, পৃ. ১০)। বর্তমানে পুনর্মদ্রিত খণ্ডে তা পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা' (পৃ. ১০)। এই পরিবর্তন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। প্রত্যয়ন কমিটি তাজউদ্দিন আহমেদের ভাষণের মূল দলিল থেকে যে-শব্দটি বাদ দিলেন তার পরিবর্তে যে বক্তব্য সংযোজন করে দিল তার অর্থ এবং তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এভাবে মিথ্যা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে জোট সরকার জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক বানাতে শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু তারা যতবেশি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে এক্ষেত্রে টানাটানি করতে যাচ্ছে ততবেশি তারা মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে, ততবেশি জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ভূমিকাও চাপা পড়ে যাচ্ছে। পাঠ্যপুস্তকে ১১টি সেক্টরের পরিচয়, জিয়াউর রহমানের প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার যেসব বর্ণনা দেয়া হয়েছে, তা মুক্তিযুদ্ধকে একটি সামরিক যুদ্ধে পরিণত করারই পরিকল্পনা থেকে করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্ব দিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী সরকার, সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুক্তিবাহিনী, গেরিলা বাহিনী, সেক্টর কমান্ডারসহ সাধারণ মানুষ।

মুক্তিযুদ্ধের বিশাল ক্যানভাসকে বাদ দিয়ে পাঠ্যপুস্তক জিয়াউর রহমানকেন্দ্রিক করার চিন্তাটিই অদ্ভুত, হীন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পরিপন্থীও। আমাদের শিশুদের কাছে মুক্তিযুদ্ধকে এর প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা, রাজনৈতিক, গণযুদ্ধ এবং জনমানুষের সম্পৃক্ততায় গড়ে ওঠা এক অতুলনীয় ঐতিহাসিক গৌরবময় অর্জন হিসেবেই উপস্থাপন করতে হবে। তাহলেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

www.pathagar.com

পড়ে শিশুরা উজ্জীবিত বা উদ্দীপিত হবে। তা না করে যে মিথ্যা ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে এখন বারবার লেখা হচ্ছে তা বর্জ্যপদার্থের মতো ইতিহাসের নর্দমায় শিশুরাই নিক্ষেপ করছে, সেই নিক্ষেপের সঙ্গে জিয়াউর রহমানও নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন। এর জন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই পাঠ্যপুস্তকে যারা আদেশ-নির্দেশ দিয়ে জিয়াউর রহমানকে বড় করে, বঙ্গবন্ধুকে খাটো করে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস লেখাচ্ছেন তাঁরাই। কথা হচ্ছে জোট সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তেমন ইতিহাসজ্ঞান রাখে কিনা?

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০০৬

www.pathagar.com

বৈধ-অবৈধ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) নিজস্ব অর্থ খরচ করে পত্রপত্রিকায় 'অবৈধভাবে স্থাপিত ও পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি' প্রচার করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে দেশী-বিদেশী ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা তাদের আঞ্চলিক কেন্দ্রের একটি দীর্ঘ তালিকা ও ঠিকানা রয়েছে। এর বেশির ভাগের রয়েছে বাহারি নাম। এবং বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা-প্রশাখা হিসেবে এখানে গত কয়েক বছর ধরে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত ও সম্প্রসারিত করে চলেছিল। ভাবতেই অবাক হতে হয়, একটি দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড লাগিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান কীভাবে ছাত্র ভর্তি করাচ্ছিল, এখন আবার বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মতো এতবড় মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞপ্তি দিয়ে দেশবাসীকে জানাচ্ছে যে, ঐসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকেই অবৈধভাবে স্থাপিত এবং পরিচালিত হচ্ছিল। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এবং সংশোধিত আইন ১৯৯৮ থাকার পরও কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ৫৬টি দেশী-বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে গড়ে তোলা সম্ভব হল—এই কথাটি যদি কোনো সভ্য দেশের নাগরিক শোনে তাহলে তারা এটিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ বলেই সন্দেহ করবে; এ দেশে সরকার, গোয়েন্দা সংস্থা, আইনকানুন বলে কিছু আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলবে; সন্দেহ পোষণ করবে। অথচ প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের অতন্দ্র প্রহরী বলে দাবি করছি, বিদেশে আমাদের ভাবমূর্তি রক্ষা ও প্রচারে বেশ তৎপর থাকতে দেখি।

যেসব প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা প্রকাশিত হয়েছে তাদের বেশির ভাগই ঢাকার অভিজাত এলাকায়। চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী শহরের নামও তাতে রয়েছে। এসব শহরে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে অভিযুক্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করাচ্ছিল, পাঠদানও করাচ্ছিল। এ দেশের ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সরকারের আইন প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থা এতদিন মনে হয় কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমুচ্ছিল। এখন তাদের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর দেখতে পেল এই ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকাতে নানা বাহারি নামের সাইনবোর্ড ঝুলছে। সেখান

www.pathagar.com

থেকে ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আবিষ্কার করা গেল— যাদের কোনো অনুমোদন নেই, সরকারি অনুমোদনের খাতায় এদের কোনো নাম নেই। অথচ প্রচারমাধ্যমে এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যথেষ্ট বলা হচ্ছিল, লেখালেখি হচ্ছিল।

যেহেতু ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এতদিন টুঁ শব্দটি করা হয়নি, তাই দেশের বেশির ভাগ মানুষ মনে করেছিল যে, যে নামে যারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বসেছে তাদের নিশ্চয়ই সরকারি কোনো অনুমোদন আছে! এমনিতে সবাই জানতেন দেশে রাতারাতি ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকার অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড়ে কোন্‌টার অনুমোদন আছে, কোন্‌টার নেই—তা এদেশের 'পাবলিক' জানবে কী করে? মানুষ এতদিন দেখছিল, এদেশে যত্রতত্র কেজি স্কুল খোলা হচ্ছে, এটি খুলতে সরকারের কোনো অনুমোদন নিতে হয় কিনা তাও কেউ জানে না; একইভাবে নানা নামের কোচিং সেন্টার খোলা, পরিচালনা, প্রচার-প্রচারণার বিষয়টি যেভাবে অবাধে চলে আসছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও বোধহয় একইভাবে হচ্ছে বা চলছে, অনেকের পক্ষেই অন্যকিছু ভাবা বা চিন্তা করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তাছাড়া 'মুক্তবাজার' অর্থনীতির দেশে সবকিছু উন্মুক্তভাবে চলবে, সেখানে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নিয়মকানুনের বালাই আছে বা থাকতে হয় তেমনটি এদেশের উঠতি মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং সার্টিফিকেটপিপাসু মানুষরা জানবে, বুঝবে বা শিখবে কোত্থেকে, কার কাছ থেকে? তাছাড়া এদেশের মানুষের জানা ও বিশ্বাসের জগতে এখনো অন্যের বলা কথা, শোনা কথাই সবচাইতে নির্ভরযোগ্য; সরকারি আইনকানুন, বিধিবিধান, দলিলপত্রের বিষয়টি খুবই গৌণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

এর থেকে মুক্ত নন আমাদের উঠতি মধ্য ও উচ্চবিত্তের মানুষরাও, এমনকি তথাকথিত শিক্ষিতরাও। এক্ষেত্রেও তেমনটিই ঘটেছে। তাদের মধ্যে যাদের ছেলেমেয়েরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে না, কিংবা সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে যাদের কমবেশি অনীহা, তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বড় অংশকেই ঐসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে দিচ্ছে। তাদের ধারণা, একটি গ্র্যাজুয়েট সনদ হলেই তাদের যার যা মনোবাঞ্ছা আছে তা অনায়াসে পূরণ হয়ে যাবে। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের উচ্চতর শাখায় প্রবেশ করা, গবেষণায় যুক্ত হওয়া, দক্ষ, আধুনিক মানুষে পরিণত হওয়ার মতো বিষয়গুলো অর্জিত হল কি হল না—এটি আমাদের এই উঠতি শ্রেণীটি এখনো বুঝতে চায় না, বিবেচনায় খুব একটা নেয় না।

প্রকৃত শিক্ষার মর্ম বোঝার ঘাটতির এমন পর্যায়ে আছে বলেই দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে-না-হতে এমন হুমড়ি খেয়ে সবাই পড়তে

www.pathagar.com

লাগল। একটি তথাকথিত বাঁধভাঙা চাহিদা তৈরি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নানা নামে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাতারাতি এখানে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার নামে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করল, যোগান দিতে আসল যা কল্পনা করাই অসম্ভব ব্যাপার। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ঐসব প্রতিষ্ঠান ঢাকার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে গেল, দেশের বিভিন্ন শহরে শাখা অফিস খুলতে শুরু করল, এমনকি দূরশিক্ষণ, বিএড ইত্যাদি কোর্সও তারা হাতছাড়া করেনি। দেশের উপজেলা ও গ্রামাঞ্চলেও ছাত্রছাত্রীদের প্রলুব্ধ করার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছিল, খরচের পরিমাণও মোবাইল কোম্পানিগুলোর মতো প্রতিযোগিতা দিয়ে কমিয়ে দিচ্ছিল। আসলে যেখানে ক্যাম্পাস থাকতে হয় না, বিল্ডিং থাকতে হয় না, যেখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক ছিল না; সেখানে ভাড়া বাড়ি এবং সদ্য-পাস-করা কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে কম-বেতনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেওয়া গেলে, আবার এসব কিছুই যদি কেউ পরিবীক্ষণ করার না থাকে—তাহলে এদেশে সবই করা সম্ভব। একজন আলু-তরকারির ফড়িয়ার পক্ষেও 'বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়' নামা কোনো অসম্ভব ব্যাপার নয়, সমস্যাও নয়। বাস্তবে ঘটেছেও তেমন। 'বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায়' যুক্ত হয়েছেন অনেক ব্যবসায়ী, আমলা, শিক্ষাবিদ এমন তথ্যও অবিশ্বাস্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ এবং চেয়ার নিয়ে মালিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মারামারির খবরও পত্রপত্রিকায় ছবিসহ ছাপা হয়েছে।

এটি সম্ভব হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর দুর্বলতার কারণে। দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা ছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে ক্যাম্পাস, জায়গা, ভবন, ল্যাব, স্থায়ী শিক্ষক ছাড়া ভাড়াবাড়িতে, কম পুঁজিতে, পার্টটাইম শিক্ষক দিয়ে শুধুমাত্র বাজারে চাহিদা আছে এমন গোটা ৩/৪টি বিষয় নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় খোলা যায়—এ ধরনের দুর্বল নিয়মকানুন দিয়ে এতবড় একটি ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হলে তা যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে; রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক এবং ঘুষ-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হবে, অপশক্তির হাতে চলে যাবে—তা এ দেশের রাজনৈতিক সরকার, শিক্ষা-সংস্কৃতির মানুষরাও বুঝতে চায়নি। তারপরও ২০০১ সাল পর্যন্ত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েনি।

কিন্তু বিগত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও 'মহাবিস্ফোরণ' ঘটে গেল। কে কার কথা শোনে, মানে, তোয়াক্কা করে। একই বিল্ডিঙে ২/৩টি গার্মেন্টসের সাইনবোর্ড ঝুলছে, আবার পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো বা ভর্তি করার, আকৃষ্ট করার প্রতিযোগিতা চলছে। জনপ্রিয় পত্রপত্রিকাগুলোতে 'পাত্রপাত্রী'র বিজ্ঞপ্তির মতো

www.pathagar.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ঠাঁসা বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হতে দেখা যাচ্ছে। বিদেশী ক্যাম্পাস, ক্রেডিট, সেমিস্টার ইত্যাদি বাহারি শব্দের জাদুতে বুঁদ হয়ে গেছে আমাদের 'ফাস্টফুড জেনারেশনের' একটি অংশ, তাদের অভিভাবকরাও। কেমন লেখাপড়া হচ্ছে, কী পড়াচ্ছে, কারা পড়াচ্ছে, কী শেখা হচ্ছে ইত্যাদি প্রশ্নের ধারেকাছেও কেউ যাচ্ছে না, যেতে চায়নি। হুজুগ উঠেছে : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩/৪টি সেমিস্টারে দ্রুত বছর শেষ, কোর্স শেষ এবং দ্রুত সার্টিফিকেট পাওয়া নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে! ব্যস। আর কী চাই? পাসের নিশ্চয়তা আছে, এই তো চাই। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিতে কোনো টেস্ট নেই, বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, অথচ এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল-ফাজিল পরীক্ষায় পাস সার্টিফিকেট দেখিয়ে যে-কেউ ইংরেজি, আইন, বিবিএর মতো বিষয়ে ভর্তি হতে পারছে—এমন সুবর্ণ সুযোগ কে হারাতে চায়! এমন পরিস্থিতি মোটেও বাড়িয়ে বলা নয়, খোঁজ নিয়ে যে-কেউ আমার এই দাবির সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। আমি যাচাই করেই কথাগুলো বলছি।

কথা উঠেছে, যে ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখন অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে, তাতে প্রায় ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। এরা এখন যাবে কোথায়? খুবই খাঁটি কথা, খুবই মানবিক প্রশ্ন। কিন্তু কথা হচ্ছে, যে প্রক্রিয়ায় বেশির ভাগ (অনুমোদনপ্রাপ্ত, অনুমোদনহীন) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে, পড়াশোনা করছে, তাদেরকে এভাবে ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট প্রদান করে দেশে উচ্চশিক্ষার কোনো উন্নতি সাধিত হবে কি—এই প্রশ্নের গ্রহণযোগ্য উত্তর আমাদের আগে খুঁজতে হবে, গ্রহণের কথা ভাবতে হবে। আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, যে ৫৬টি প্রতিষ্ঠানকে ইউজিসি অবৈধ বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, অপর যে ৫৪টি বৈধ বলে প্রচারিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে হাতে-গোনা কয়েকটির মান অপেক্ষাকৃত ভালো হলেও বৈধ-অবৈধ বেশির ভাগ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মানই এখনো যা-তা পর্যায়ে রয়ে গেছে। সুতরাং যে ৫৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈধতা নেই, আবার যে কটির বৈধতা আছে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাড়পত্র নিয়ে গেলে ছাত্র ভর্তি করিয়ে আমরা 'মানবিকতার' বিরাট স্বাক্ষর রাখতে পারি, কৃতিত্ব দাবি করতে পারি; কিন্তু বাকি ৫৪টির মধ্যে ৪/৫টি ছাড়া অন্যগুলোর লেখাপড়ার মানের কী হবে, তাদের সার্টিফিকেটের সঙ্গে জ্ঞানার্জনের কোনো উন্নতি বিধান হবে কিনা তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তা না করা হলে অবৈধ ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছাড়পত্র নিয়ে বৈধ ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ভিড় করলে, এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটির বাণিজ্যে সুবাতাস বইয়ে দেওয়া ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় গুণগত পরিবর্তন খুব একটা আসবে না। কেননা, আমরা জানি যে, বেশ কিছুসংখ্যক

www.pathagar.com

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দলীয় প্রভাব খাটিয়ে অথবা অন্যকোনো উপায়ে অনুমোদন বাগিয়ে নিলেও তাদেরও নেই কোনো স্থায়ী ক্যাম্পাস, ভবন, শিক্ষক, মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষাপদ্ধতিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ, অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা। তাদের অনেকগুলোর অবস্থা বাতিল হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মতোই নড়বড়ে, নামকাওয়াস্তে।

আসলে বাংলাদেশে একশ্রেণীর মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানকে নিয়েও তামাশায় নেমেছে, এটিকে নিয়েও ব্যবসা-বাণিজ্যে মেতে উঠেছে। উচ্চশিক্ষার ধারণাকে ধারণ না করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আনন্দে মেতে উঠেছে কেউ কেউ। এখানে উচ্চতর শিক্ষার বিষয়গুলোকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও সংস্কৃতির মধ্যদিয়ে অর্জন করতে হয়; ছাত্রছাত্রীদের সেভাবে, সেই পরিবেশে, সুযোগসুবিধা ও বাধ্যবাধকতায় গড়ে তুলতে হয়; সার্টিফিকেট প্রাপ্তি নয় বরং জ্ঞানার্জন ও দক্ষ মানবসম্পদ, সৃজনশীল আধুনিক মানুষ ও বিশেষজ্ঞরূপে গড়ে ওঠার অপার ব্যবস্থার যজ্ঞটি সম্পাদন করতে হয়—এর বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যকিছু নয়। এটি ভাড়াবাড়ির অপরিসর কক্ষে পাঠদান, নামমাত্র পরীক্ষা নেওয়ার মধ্যে আটকে রেখে অর্জন করা যায় না—এই বোধটি যে-কোনো ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষ, সরকার, ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানতে হবে, বুঝতে হবে।

আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দাঁড়াতে পারছে না অন্য কতগুলো সমস্যার কারণে। বেসরকারিগুলো ১৫ বছরেই যে-ধরনের ধাক্কা খেল, আর দিল—তা থেকে তাদের উত্তরণ কীভাবে হবে, এখন তাদেরকেই তা ঠিক করতে হবে। তবে পাবলিক এবং প্রাইভেট যে নামেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত হোক না কেন, তাদের শিক্ষাক্রম, পাঠদান, পরিবেশ ও গুণগত মানে খুব একটা পার্থক্যে চলা মোটেও ঠিক হবে না। কেননা, তাদের উভয়েরই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও কর্মের জগৎ বলতে গেলে এক ও অভিন্ন। সেখানে তাদেরকে টিকে থাকতে হলে মানে ও গুণাগুণে তাদের এক বা কাছাকাছি হতেই হবে—এর ব্যত্যয় ঘটতে দেওয়ার আর কোনো সুযোগ আমাদের নেই।

ভোরের কাগজ, ১৬ মে ২০০৭

www.pathagar.com

উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে উচ্চশিক্ষা নেই

গত ২৮ অক্টোবরের পর থেকে দেশের বেশিরভাগ কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল ছিল। কোনোটি ছাত্রদল, ছাত্রশিবির দখল করেছিল; কোনোটিতে ছাত্রলীগসহ অন্যান্য ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা অবরোধ বা ধর্মঘট ডেকে বন্ধ করে রেখেছিল। জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর শিক্ষাঙ্গনের দৃশ্যে বাহ্যত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে, বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এখন খুলে গেছে, ছাত্রছাত্রীদের পদচারণায় ক্যাম্পাস আবার ভরে উঠছে বলে পত্রপত্রিকাসমূহ লিখছে। বেসরকারি চ্যানেলসমূহ মধুর ক্যান্টিনে বসা বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের আড্ডার ছবি সম্প্রচার করেছে, দু-একটি চ্যানেল দুএকটি শ্রেণীকক্ষের দৃশ্য প্রদর্শন করেছে। সবকিছু মিলিয়ে দেশের বন্ধপ্রায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দীর্ঘদিন পর আবারো কিছুটা সচল হয়ে উঠেছে—এতেই আমাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে।

বেশির ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হয় অনুষ্ঠিত হতে পারেনি, নতুবা অনুষ্ঠিত হলেও ফল প্রকাশ করতে পারেনি, ফলে আগস্ট মাসে এইচএসসি পাস করা ছাত্রছাত্রীরা এখনো স্নাতক সম্মানে ভর্তি হতে পারেনি। এখন পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় আশা করা যাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে থেমে থাকা ভর্তিপরীক্ষার কাজ সহসাই শুরু হতে যাচ্ছে। অন্যান্য বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস, টিউটরিয়াল, পরীক্ষাসহ সবকিছুই তথৈবচ।

এমনটি যে এবারই হয়েছে তেমন নয়, প্রতিবছরই কোনো-না-কোনো কারণে দেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ছাত্রধর্মঘটে বন্ধ থাকে, লেখাপড়া বন্ধ থাকে। ৫ বছর পর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পূর্ববর্তী ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়, অথবা বিরোধী ছাত্রসংগঠনসমূহ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ছাত্রাবাসে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এ নিয়ে ৩ মাস দেশের বেশির ভাগ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রসংগঠনগুলোর হানাহানি, দখল-বেদখলে প্রায় বন্ধ থাকে। সব মিলিয়ে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট এভাবে এতটাই প্রলম্বিত হয়েছে যে, ৪ বছরের কোর্স সমাপ্ত করতে এখন ৭/৮ বছর লেগে যাচ্ছে। এমনকি যে বুয়েট একসময়

www.pathagar.com

সেশনজটমুক্ত ছিল বলে অহংকার ছিল, সেটিতেও ছাত্রছাত্রীদের ৪ বছরের শিক্ষাজীবন ৬/৭ বছরে ঠেকেছে। তাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট হচ্ছে, অভিভাবকদের পক্ষে ছাত্রছাত্রীদের ব্যয়ভার বহন করা খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তাতে যেন কারো কিছু যায়-আসে না। যেসব ছাত্রসংগঠন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সক্রিয় আছে, যাদের মধ্যে কোনো-কোনোটির মুখে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে মাঝে মধ্যে কথা শোনা যায়। তাতে দায়বোধ, আন্তরিকতা সততা কতটা রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

বস্তুত যে ছাত্রসংগঠনটি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা হোস্টেল, হল দখল করে রাখে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া সম্পর্কে তাদের মুখে বেশ দরদ ফুটে ওঠে, তাদের দৃশ্যত লেখাপড়ায় আগ্রহী বলে মনে হয়। যারা হল-ছাত্রাবাসে ঠাঁই পায় না, কলেজসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে শক্তিতে এঁটে উঠতে পারে না, বিতাড়িত হয়; তাদের অবস্থা ও ভাষ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি এ মুহূর্তে দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংগঠনসমূহকে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সমস্যা নিয়ে ভাবতে, চিন্তা করতে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে দেখি না। তাদের বেশিরভাগকেই কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের ওপর চাপ প্রয়োগ, ঠিকাদারি, চাঁদাবাজি, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নানাভাবে হয়রানি, নির্যাতন ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক-একটি সংগঠিত শক্তি হিসেবে কাজ করতে দেখি।

অবশ্য দেশের কলেজসমূহে একধরনের সমস্যা বিরাজ করছে। সেখানে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন প্রশাসনসহ সর্বত্র একধরনের সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকে, বিরোধীদলের সমর্থক ছাত্রছাত্রীদের হলে থাকার অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্নরকম হয়। ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের বেশির ভাগই ভর্তিবাণিজ্য, পরীক্ষাবাণিজ্যসহ নানা ধরনের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। কলেজের আশপাশে এমনকি শহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এদের মূল রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতারা ছাত্রসংগঠনের এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত থাকার পরও তাদেরকে লেখাপড়ামুখী করার কোনো উদ্যোগ নেই। বেশির ভাগ ছাত্রনেতাই লেখাপড়ার প্রাত্যহিক চর্চার বাইরে 'রাজনীতির' নামে সময় ব্যয় করে, কলেজ ও ছাত্রাবাসে দলীয় প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকে। ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের শীর্ষনেতারা প্রায় সবাই এক একজন 'ঈশ্বরে' পরিণত হয়, যাদের কৃপা বা দয়ার ওপর ঐ কলেজ এবং কলেজ ছাত্রাবাসের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন, ব্যক্তিগত জীবন চলে। তাদের অঙ্গুলি হেলনে অনেক কিছুই ঘটে যা বাইরে থেকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রসংগঠনসমূহের অবস্থা কিছুটা ভিন্নতর হলেও তেমন লেখাপড়ামুখী নয়। এখানেও ছাত্রাবাসমূহে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সিট বণ্টন, দখল, খাওয়া-দাওয়াসহ সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয় একচ্ছত্র দখল প্রতিষ্ঠাকারী ছাত্রসংগঠনের নেতাদের দ্বারা। ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের দাপট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রাবাস, ক্যাফেটরিয়া, আশপাশের দোকান, লোকালয়সহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো রয়েছেই। এভাবেই দখলদার ছাত্রসংগঠনের শীর্ষনেতারা এক-একজন 'ঈশ্বর' রূপে আবির্ভূত হন। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন চলে, ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবনযাপন চলে। ছাত্রাবাসে সহপাঠীদের হাতে নির্যাতন একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে ছাত্রসংগঠন এবং তাদের শীর্ষনেতাদের এককভাবে দোষ দিলে হবে না। একহাতে নিশ্চয়ই তালি বাজে না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ দলীয় পরিচয়ে শত শত শিক্ষক নিয়োগ লাভ করেছে; যাদের শিক্ষক পরিচয়ের চাইতে দলীয় পরিচয়ই বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় হয়ে ওঠে, যারা কালক্রমে এক একজন 'ঈশ্বরে' পরিণত হন, যারা রাতকে দিন, দিনকে রাত বানাতে সচেষ্ট থাকেন; যাদের পাণ্ডিত্য পরিচয় খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু 'শিক্ষক নেতা' বলে তাদেরকে পত্রপত্রিকা, চ্যানেল অনুষ্ঠান, আলোচনা অনুষ্ঠানে ডাকা হয়, পরিচয় করে দেওয়া হয়। একসময়ে ঐসব 'শিক্ষক নেতা' দলীয় রাজনীতির এক একজন 'শিক্ষক নেতা' হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে আবির্ভূত হন। একসময় উপাচার্য পদও লাভ করেন। উপাচার্য পদলাভ করে তাদের প্রধান কাজ হয় দলীয় সরকারের স্বার্থ রক্ষা করা, অপকর্মকে সমর্থন দেওয়া, দলীয় অনুগত শিক্ষক-কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ দান করে বিশ্ববিদ্যালয়কে দলীয় শক্তিতে পরিপূর্ণ করা। এসব উপাচার্য এক একজন 'ঈশ্বরে' পরিণত হন, অর্থকড়িতে কারো কারো 'পারদর্শিতা' পত্রপত্রিকার কল্যাণে জানা যাচ্ছে।

দেশে ২৮টির মতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০০-এর মতো বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ থাকলেও একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও যথার্থ অর্থে শিক্ষাঙ্গন হিসেবে গড়ে ওঠেনি। সেখানে পাঠদানের দায়বোধ করেন তেমন মেধাবী, প্রতিশ্রুতিশীল, একনিষ্ঠ শিক্ষকের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস নেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ভালো পড়ান এমন শিক্ষকের সংখ্যা আরো কমে গেছে। গবেষণা ও পাঠদানে খ্যাতি অর্জন করছেন, এমন শিক্ষক খুব বেশি একটা পাওয়া যাচ্ছে না। এর জন্য শিক্ষকরা এককভাবে দায়ী তা আমি বলছি না। উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগদান শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণার সুযোগদান, শিক্ষাক্রম উন্নতকরণ, মেধার চর্চায় ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়োজিত

www.pathagar.com

থাকা—এর কোনোটিই দেশের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখন আর রাখা হয়নি। বেশির ভাগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ই অদক্ষ, অযোগ্য জনশক্তিতে ভরে উঠেছে, এগুলোকে এক একটি রুগ্‌ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

সুতরাং এখানে সুস্থ চিন্তাভাবনা, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা, লেখাপড়ার স্বাভাবিক, এমনকি ন্যূনতম কার্যক্রম বজায় রাখার প্রতি কারো কোনো দায়বদ্ধতা আছে বলে আমার মনে হয় না। দিন দিন উচ্চতর শিক্ষাঙ্গন হিসেবে প্রতিটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এক একটি রুগ্‌ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে, যেখান থেকে দক্ষ জনশক্তি, মেধাবী প্রজন্ম এবং ভবিষ্যতের জ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও নেতৃত্ব তৈরি করার চাইতে নামেমাত্র সার্টিফিকেট প্রদানের আয়োজনটাই মুখ্য বলে মনে হচ্ছে। দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ বছরের মতো শিক্ষকতা করার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তাতে আমার মূল্যায়ন বরাবরই হতাশাজনক, আত্মসমালোচনামূলক। জীবনে শিক্ষকতার বাইরে অন্য কোনো চাকরিতে যাওয়ার স্বপ্ন একবারের জন্যও দেখিনি, এখনো দেখছি না। এখনো আমি বিশ্বাস করি লেখাপড়া করা, ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো, লেখালেখি ও গবেষণা করার চাইতে আর কোনো পেশায় এত আনন্দ নেই। কিন্তু সেই সুযোগ ও পরিবেশ আমাদের উচ্চতর শিক্ষাঙ্গনে পাওয়ার আশা অনেক আগেই ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি। যেসব ছাত্রছাত্রী এসব প্রতিষ্ঠানে পড়তে আসে তাদের এমন বৈরী, শিক্ষাবিমুখ পরিবেশে কী এমন পড়াশোনা হয়, পড়ানো হয়, শেখা হয়!

আমার শিক্ষকতা জীবন প্রায় শেষ হতে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে বাংলাদেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা থেকে বহুদূরে চলে গেছে। এখানে সবাই আমরা জীবনের বেশকিছু সময় অতিবাহিত করি সত্য, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা পায় না কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা, একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী জ্ঞানচর্চার সামান্যতম সুযোগ, তেমন চেষ্টা এবং চিন্তাই কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয় ধারণ করেনি। ধারণ করেনি বলেই আমাদের কাছে মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রছাত্রীদের আড্ডার দৃশ্য, ছাত্রসংগঠনগুলোর মিছিল, সমাবেশ, হইচই করা, আড্ডা দেওয়ার দৃশ্যই প্রধান হয়ে ওঠে। লাইব্রেরিতে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় জমানো ক্লাস, ছাত্রাবাসে তাদের গভীরভাবে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করার কথা খুব একটা জানা যায় না; জানা যায় না বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের কোনো গবেষণার খবর। 'আবিষ্কার' নামক শব্দটি আমাদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অনেক আগেই হারিয়ে গেছে, আমরা আদৌ সেই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত কি না আমি জানি না। অথচ মানুষ আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক হিসেবে বেশ সম্মান করেন। এটি তাদের সরল বিশ্বাস।

www.pathagar.com

তবে আমাদের অ্যাকাডেমিক সৃষ্টিশীলতা বা মর্যাদা কতটুকু তা তারা হয়তো জানেন না। সেখানেই আমাদের রক্ষা! ছাত্রছাত্রীরাও জানে না তাদের কত বেশি শিখে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। তবে তারা যখন উন্নত কোনো দেশে উচ্চতর ডিগ্রি বা গবেষণা করতে যায় তখন বুঝতে পারে যে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সার্টিফিকেট দিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে প্রতিযোগিতা করা বেশ কঠিন ব্যাপার। অথচ দেশে 'ছাত্রনেতা', 'শিক্ষক নেতা' ইত্যাদি শব্দের প্রতি সবার বেশ দুর্বলতা, সম্মানও। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে 'নেতা' শব্দটি অত্যন্ত বেমানান। এই বেমানান শব্দটি যেসব কারণে ত্যাগ করা উচিত, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি আমরা সেই বোধ, বিবেচনা ও চিন্তা থেকে ঢেলে সাজাই তাহলেই দেশের উচ্চতর শিক্ষাঙ্গন যথার্থ অর্থে তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে। সেই ভাবনা ও উদ্যোগের প্রতীক্ষায় থাকব।

ভোরের কাগজ, ১৭ জানুয়ারি ২০০৭

www.pathagar.com

শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কার আনতে হবে

২০০৫ সালে দেশব্যাপী বোমাবাজি, গ্রেনেড হামলা, কয়েকজন শীর্ষ জঙ্গিনেতাকে ধরপাকড় এবং সর্বশেষ ৬ শীর্ষ জঙ্গিনেতার ফাঁসির পর দেশের জঙ্গিবাদের অবসান বা নির্মূল নিয়ে কোনো কোনো মহল বেশ সহজ সমীকরণ করলেও বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই মনে করেন যে, কয়েকজন জঙ্গিকে ধরা, জেলে বন্দি রাখা বা ফাঁসি দেওয়ার মধ্যে তাদের তৎপরতা সীমিত রাখলে দেশ থেকে জঙ্গিবাদ উচ্ছেদ হয়ে যাবে না। কেননা, জঙ্গিবাদ একটি ধর্মীয় বিশ্বাসকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক মতবাদ যার ভিত্তি আমাদের মতো মুসলিমপ্রধান এবং অনুন্নত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার দেশে বেশ দ্রুত প্রসার লাভ করেছে।

যে-কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ যখন ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, তখন তার থেকে নেতা, কর্মী, সমর্থক, এমনকি সাধারণ মানুষকেও মুক্ত করা বেশ কঠিন এবং জটিল কাজ। এ ধরনের অন্ধবিশ্বাস থেকে সবাইকে বের করে আনা শুধুমাত্র কিছু অভিযান, গ্রেপ্তার, ভয়ভীতি, জেল, ফাঁসি দিয়ে সমাপ্ত হওয়ার নয়। আসল ব্যাপারটা নির্ভর করছে মানুষের মনোজগৎ, বোধ, বিশ্বাস জানা-অজানার বিষয়গুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত তথ্য ও ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করা না হচ্ছে; যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্র, রাজনীতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি মানসম্মত ধারণা লাভ না করছে; ততক্ষণ পর্যন্ত এই মানুষগুলো কোনো-না-কোনো পথের সন্ধান করবেই। সেই পথ ভুল কি ঠিক তা জানা ও বোঝা তাদের অনেকের পক্ষেই হয়তো সম্ভব হবে না, কিন্তু যখন একবার কেউ বিশ্বাস নিয়ে কোনো একটি পথে পা বাড়ায় তখন তার কাছে সেটিই রাজনীতির একমাত্র সঠিক পথ বলে মনে হয়, এবং তখন সেই মানুষটি সেই রাজনীতিকে পবিত্র জ্ঞান করে জীবন উৎসর্গ করতে সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়। এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে যে রাজনৈতিক বিশ্বাস গড়ে ওঠে সেটিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রশাসনে অনেকেই বিষয়টিকে হালকাভাবে নিয়ে থাকেন, দেখেন, বোঝেন এবং বোঝাতে চেষ্টা করেন।

গত ২/৩ বছর দেশে জঙ্গিবাদ নিয়ে প্রচুর টকশো, সেমিনার অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি, বক্তব্যও শুনেছি; টিভিতে মন্ত্রী, রাজনীতিবিদ, আলোচকদের অনেকেরই

www.pathagar.com

কথা শুনেছি। তাতে সমস্যাটিকে গভীরভাবে দেখা ও বোঝার চাইতেও আপাতত দেখার প্রবণতাই লক্ষ করা গেছে। এমনটি সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, জঙ্গিবাদের উত্থান, বিকাশ এবং কর্মকাণ্ডের মধ্যে মানুষের গভীর বিশ্বাস, অন্ধত্ব, অজ্ঞানতা, স্বপ্নচারিতা, উল্লম্ফতা, সমাজবাস্তবতা বিবর্জিত ধারণাসহ অনেক জটিল ও কঠিন কঠিন বিষয়ই জড়িত হয়েছে— যা সহজে দূর হওয়ার নয়।

আমাদের দেশে ২০০৬ সালের আগে জঙ্গিবাদের উত্থানকে সরকার ও প্রশাসন থেকে অস্বীকার করার চেষ্টা প্রবলভাবে করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল এটি মিডিয়ার সৃষ্টি; বাংলাদেশের বিরুদ্ধে, আন্তর্জাতিক মহলের গভীর ষড়যন্ত্র এবং আওয়ামী লীগ ও দেশের বাম বুদ্ধিজীবীদের 'আবিষ্কার' ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে যারা বলতেন তাদের বলাকে তখন অনেকেই হালকাভাবে নিয়েছিল। ৪ দলীয় জোটের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা—জোট থেকে বোমাবাজির ঘটনাগুলো সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছিল সেভাবেই বুঝতে ও বলতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু জোটের মধ্যে অবস্থানকারী একটি অংশ যারা বাংলাদেশকে 'তালেবান রাষ্ট্র' করার স্লোগান দিয়েছিল একসময়; যারা বাংলাদেশকে একটি 'ইসলামি রাষ্ট্র' করার রাজনীতি ত্যাগ করেনি; যাদের নেতাকর্মীরা ইসলামি বিপ্লব করার কথা প্রকাশ্যে বলে আসছে; ৪ দলীয় জোটকে অটুট রেখে একদিন বাংলাদেশে তাদের আরাধ্য সাধন করার কথা প্রকাশেই বলে বেড়াত—তারাই মূলত জঙ্গিবাদের উত্থানকে অস্বীকার করে এটিকে মিডিয়ার সৃষ্টিসহ অন্যান্য বক্তব্য দিয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু ২০০৫ সালে একের-পর-এক বোমা ও গ্রেনেড হামলার পর আন্তর্জাতিক মহলের চাপে সরকার বাধ্য হয়েছিল কিছু জঙ্গিকে আটক করতে, বিচারের প্রক্রিয়ায় আনতে। তবে ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির তথাকথিত নির্বাচন পার করতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের স্বরূপ নতুনভাবে আবির্ভূত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। সেক্ষেত্রে বিএনপির অবস্থা শেষ পর্যন্ত কী হত তা এ মুহূর্তে বলা মুশকিল। তবে আমার ধারণা বাংলাদেশে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে এরই মধ্যে রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে পিষিয়ে মারার চেষ্টা করা হত; শেষপর্যন্ত বিএনপিকে জিম্মি করে অচিরেই জঙ্গিবাদের আসল রাজনৈতিক শক্তিই বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আবির্ভূত হত যা শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে না পারলেও দেশটা আফগানিস্তান, ইরাকের মতো এক দীর্ঘমেয়াদি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে জর্জরিত হয়ে পড়ত—এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, বাংলাদেশে কোনো তালেবানি শক্তি ক্ষমতায় যাক বা থাক সেটি আন্তর্জাতিক কোনো শক্তির পক্ষেই মেনে নেওয়া সম্ভব হত না; অপরদিকে রাষ্ট্রক্ষমতায় মৌলবাদী সকল ক্যাডার ও প্রশাসনকে ব্যবহার করে একটি যুদ্ধ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করত, যা বাংলাদেশের মতো দেশের পক্ষে বেশিদিন ধরে রাখা বা সহ্য করা সম্ভব

www.pathagar.com

হত না। বাংলাদেশ সত্যিই মধ্যপ্রাচ্যের অপর একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

আমাদের জাতীয় জীবনে এমন খারাপ সম্ভাবনার হাত থেকে ১১ জানুয়ারি আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছে। তাতে আমাদের সেনাবাহিনী, আন্তর্জাতিক বন্ধুমহল, দেশের সিভিল সমাজ ও অন্যান্য মহলের ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ একটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তি পেলেও অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে জঙ্গিবাদের মতো দেশী এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার ছোবল থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি।

আমি বলব, আমরা শুধু মুক্ত হতে পারিনি বললে কম বলা হবে। জঙ্গিবাদের শেকড় ও সমাজের গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। ওরা সাময়িকভাবে চুপ করে আছে, রং বদলিয়েছে, দল ও সংগঠনের নাম পরিবর্তন করছে, কৌশল পরিবর্তন করেছে, হয়তো কথাবার্তাও তাদের পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জঙ্গিবাদ পবিত্র ইসলামকে যেভাবে ব্যবহার করে থাকে তাতে সাধারণ শিক্ষিত মানুষও নানাভাবে তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। তা ছাড়া ১৯৯০-৯১ সালের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পতনের পর আমাদের দেশের ইসলাম নামধারী রাজনৈতিক দলগুলো, তাদের ছাত্রসংগঠনগুলো সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পতনকে এককালে মার্কসবাদীদের মতো যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলে, মুসলিম তরুণদের একাংশ এতে বিশ্বাস স্থাপনও করে বসে। এরা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের পতনের পর অনিবার্যভাবে ইসলামের উত্থান, ইসলামি রাষ্টব্যবস্থার বিজয়ের কথাই প্রচার করত—যা আমাদের মতো তত্ত্বজ্ঞানশূন্য বিদ্যাশিক্ষার দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীদের একাংশের কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হত। তাছাড়া কথাগুলো বলার জন্য যখন হাজির হন বিশ্ববিদ্যালয়েই কোনো শিক্ষক তখন ব্যাপারটা তাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও চমকপ্রদই মনে হয়। গত ১৫/১৬ বছর দেশে এমন একটি অবাধ সুযোগ মৌলবাদী একটি গোষ্ঠী গ্রহণ করেছিল—যার ফলে বিপুলসংখ্যক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সমাজ পরিবর্তন, রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতে শামিল হয়।

দেখুন, অনেকেই বলে থাকেন যে, দেশে জঙ্গিবাদের মূলক্ষেত্র মাদ্রাসাগুলোতে সৃষ্টি হয়েছে। মাদ্রাসাশিক্ষার মধ্যেই জঙ্গিবাদের দীক্ষা রয়েছে। এই সত্যই শেষ নয় বা একমাত্র নয়। তবে যেসব জঙ্গি ধরা পড়েছে তাদের বেশিরভাগই মাদ্রাসাশিক্ষা ও শিক্ষকতার সঙ্গে জড়িত বলেই এমন সিদ্ধান্ত টানা হচ্ছে। মাদ্রাসাশিক্ষাকে যুগোপযোগী না করার ফলে এর পঠনপাঠনে বিশ্বাসী হয়ে ছাত্র-শিক্ষকদের বেশির ভাগই ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমাদের তথাকথিত সাধারণ শিক্ষা কি এর থেকে মুক্ত

www.pathagar.com

আছে? আমরা কি কখনো আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পঠনপাঠন ইত্যাদিকে তুলনা করে দেখেছি?

সম্প্রতি আমি বাংলাদেশের প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য বইয়ের গদ্য-পদ্যসমূহ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র রচনা করে ভীষণভাবে বিস্মিত হয়েছি। যে বিষয়গুলো আমাদের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ধর্মশিক্ষা বইতে পড়ানো যেত সেগুলোর বেশকিছুই বাংলাসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা অন্য ধর্মাবলম্বী ছেলেমেয়েদের জন্য বেশ বিব্রতকর ও বাধ্য করার পরিস্থিতি। সাধারণ শিক্ষা হবে সর্বজনীন—যা শিশু-কিশোর ছাত্রছাত্রীদের উদার করবে, নিজেদের এই দেশ ও জাতির এক-একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার শিক্ষা দেবে। কিন্তু তা যখন ধর্মভিত্তিক হয়ে পড়ে, ইসলামিকরণ হয়ে যায়, তাতে অন্য ধর্মাবলম্বী শিশুরা বিপন্ন বোধ করে। আমরা স্কুলপর্যায়েই সাধারণ শিক্ষার মধ্যে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে এমনভাবে চাপিয়ে দিচ্ছি যা সাধারণ শিক্ষার সংজ্ঞার সঙ্গে অনেকটাই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

শুধু তাই নয়, আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্বেও আমরা রাষ্ট্র ও ধর্ম নিয়ে মুক্ত আলোচনা ও গবেষণার কোনো সুযোগ রাখিনি, চিন্তা করিনি। আমাদের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বিজ্ঞানসহ নানা নামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম কতখানি জ্ঞানতাত্ত্বিক তা নিয়ে আমার গভীর সন্দেহ রয়েছে। এগুলোর কারিকুলাম থেকে যেসব প্রোডাক্ট বের হচ্ছে তাদের বেশির ভাগই সমাজ, প্রকৃতি ও মানুষের চেতনা বিকাশের কারণ এবং নিয়মগুলো সম্পর্কে মৌলিক কোনো ধারণা পায় বলে মনে হয় না। এসব উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পঠনপাঠনগুলো একেবারেই সেকেলে, জ্ঞানতত্ত্ববিহীন, জীবন ও সমাজদর্শনবিহীন একধরনের উচ্চতর সনদের বাইরে ব্যাপক কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

এ মুহূর্তে বাংলাদেশে অসংখ্য স্কুল, কলেজ ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে যেগুলোতে পঠনপাঠনে, চিন্তাভাবনায়, এমনকি নামেও ইসলামকে যত্রতত্রভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে; বাণিজ্য করা হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ার পরিবর্তে পশ্চাৎপদ চিন্তাচেতনায় রেখে দেওয়া হচ্ছে; দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার চাইতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে; এমনকি ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার পাঠক্রমেও সাম্প্রদায়িকতার ভেদাভেদ মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের এক-তৃতীয়াংশই একসময় ইসলামি ছাত্রশিবিরের ক্যাডার ছিল, তাদের বেশির ভাগই মেধার গুণে নয়, বরং দলীয় প্রভাবে প্রথমশ্রেণী প্রাপ্ত হয়েছে, তারা দলীয় প্রভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন। ঐসব শিক্ষক দেশের বেশির ভাগ

www.pathagar.com

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী দিনে ইসলামি বিপ্লবের সূতিকাগার হিসেবে গড়তে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে, সেই বাসনাই পোষণ করছে। তাদের শিক্ষক বানানোর পেছনে জামাতে ইসলামী দলের সেই পরিকল্পনাই ছিল এবং আছে। সুতরাং, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই পঠনপাঠন, লোক নিয়োগসহ যা-কিছু হচ্ছে তা বহুলাংশে এখন যে-শক্তির হাতে চলে গেছে তারা আধুনিক গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে এমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই। তারা যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কব্জা করেছে, সেই রাজনৈতিক শক্তির কাছেই তারা দায়বদ্ধ বেশি। আলোকিত মানুষ হওয়া এবং একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানচর্চায় নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার কোনো চিন্তাভাবনা তাদের নেই; তেমন জ্ঞানের ভিত্তিও তাদের নেই। আমি দেশের বিশাল মাদ্রাসা এবং সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই না।

মাদ্রাসাগুলোতে একসময় শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়াদি পড়ানো হত, এখন সেগুলোতে স্কুল-কলেজের বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ককটেল কারিকলাম অন্তর্ভুক্ত করে ডিগ্রির মানের সমতা দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু সেই কারিকুলাম ও বইপুস্তকে না আছে মান,পাঠদানেও কোনো মেধা ও দক্ষতার ছাপ নেই। শিক্ষকদের বেশির ভাগই রাজনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার ধারকবাহক। অপরদিকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ গোটা সাধারণ শিক্ষাতেই এখন সাম্প্রদায়িকতা, ইসলামিকরণের প্রভাব এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে প্রকৃত জ্ঞানচর্চা, গবেষণা বলতে গেলে তিরোহিত। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার পেছনে রাষ্ট্র প্রতিবছর তার বাজেটের সিংহভাগ খরচ করছে, জনগণ তাদের পরিবারের বিরাট অংশ ব্যয় করছে; কিন্তু আলোকিত মানুষ, জ্ঞানবিজ্ঞান, আধুনিকতা, বিশ্ববাস্তবতা, ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশলসহ দক্ষ, চিন্তাশীল আধুনিক মানুষরূপে গড়ে ওঠার বিষয়টিই আমাদের দিন দিন গুটিয়ে যাচ্ছে। সে কারণেই অনেক সম্ভাবনাময় তরুণকে দেখা যাচ্ছে ইসলামি বিপ্লবের নানা স্লোগানে আকৃষ্ট হতে, তাদের অন্তর্দৃষ্টিতে জ্ঞানচর্চার আলো সেভাবে পৌছাচ্ছে না যেভাবে পৌছালে তারা বিশ্বের তরুণ-তরুণীদের মতো জ্ঞানবিজ্ঞানে মত্ত থাকত, নিজেদের চিন্তা ও মেধামননের জগৎ খুঁজে পেত। না, আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থাতেই সেই জ্ঞান, সেই আলো নেই। না-থাকার কারণেই কূপমণ্ডূক, ভণ্ড, অর্ধশিক্ষিত, প্রতারকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জায়গাগুলো সব দখল করে নিয়েছে। ফলে বিভ্রান্ত ও ফাঁদে পড়ছে সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীরা যারা তাদের মেধাচর্চার মধ্যদিয়ে জ্ঞানের জগৎ খুঁজে পেতে পারত। কিন্তু তারা পাচ্ছে না, এটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয় বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

www.pathagar.com

সুতরাং এখন দেশটাকে দুর্নীতিমুক্ত করার যে অভিযান চলছে, জঙ্গিদের ধরা ও বিচারের যে প্রক্রিয়া চলছে তাকে সর্বাঙ্গীণভাবে সফল করতে হলে আমাদের একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে যেখানে ধর্মের নামে বিভেদ নয়, ধর্মের প্রকৃত মর্মবাণী তথা মানবতাবাদ, সত্য ও ন্যায়কে সম্বল করে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা—এটির নাম যাই দেওয়া হোক না কেন, কিন্তু সেই রাষ্ট্রে সকলের স্বাধীন মতামত, ধর্ম ও কর্ম করার অধিকার থাকবে; থাকবে না কোনো জোরজবরদস্তি, ঘুষ, দুর্নীতি, ঠগবাজি, বোমাবাজি ইত্যাদি। এর জন্য গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে আগে ঢেলে সাজাতে হবে। এর শিক্ষাক্রম, পাঠনপাঠন, শিক্ষক, প্রতিষ্ঠান—সর্বত্রই থাকতে হবে জ্ঞানের ছাপ ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। তবেই বাংলাদেশে ভয়ংকর জঙ্গিবাদের বিশ্বাস ক্রমেই দুর্বল এবং অকার্যকর হবে। ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং এই সরকারকে পেছনে থেকে সমর্থনদানকারী সেনাবাহিনী, সুশীল সমাজ, আন্তর্জাতিক বন্ধুমহলকে বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করব।

ভোরের কাগজ, ১২ এপ্রিল ২০০৭

www.pathagar.com

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা চলছে দলবাজি ও দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়ায়

যখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে তখন তারা বোঝাতে চেষ্টা করেন, এর ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দারুণ উন্নতি হয়ে গেছে বা হতে যাচ্ছে। একইভাবে যখন বলা হয়ে থাকে, পাবলিক পরীক্ষা নকলমুক্ত হয়ে গেছে, জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে— অতএব বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আর কোনো চিন্তা নেই, অভিযোগও নেই এবং এর কৃতিত্ব আর কারো নয়, সরকারেরই। যারা শিক্ষা নিয়ে এমন চাপাবাজিতে রত আছেন তাদের বিদ্যাবুদ্ধিতে দলীয় রাজনীতি একচ্ছত্রভাবে কার্যকর থাকলেও প্রকৃত শিক্ষার প্রভাব পড়েনি একটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

প্রতিবেশী দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপালসহ বাইরের উন্নত দুনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যারা খোঁজখবর রাখেন তারা ভালো করেই জানেন আমাদের কারিকুলাম, পাঠ্যবই, পাঠদান এবং শিক্ষার অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা ও মান এখন কোথায় নেমে গেছে; প্রকৃত লেখাপড়া ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, গবেষণা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কতখানি উবে গেছে বা যাচ্ছে তা সহজেই দেখা যাচ্ছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে শুধু টাকা ঢেলে, নকলমুক্ত পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করিয়ে উন্নত করা যাবে না—এটি বোঝার মতো জ্ঞানবুদ্ধি থাকতে হবে। এখানে শিক্ষার বিস্তর আয়োজনের সমাহার থাকতে হবে, শিক্ষার বিবেচনাই প্রাধান্য পেতে হবে। সভ্য দুনিয়ায় এমনটিই হচ্ছে।

আমাদের দেশে কেজি স্কুল থেকে সর্বোচ্চ বিশ্বদ্যিালয় পর্যন্ত এখন দুর্বৃত্তদের দখল, আস্ফালন, প্রভাব, দখলদারিত্ব কায়েমের তোড়জোড় প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাব্যবস্থায় দলবাজির প্রেরণাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, অভিভাবক সংগঠনও দলীয় বিবেচনায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সরকার সেভাবেই এদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের বিরাজমান সমস্যার গভীরে যাওয়া হচ্ছে না; দলীয় বিবেচনা থেকে ঐসব সমস্যার যে সমাধান দেওয়া হচ্ছে তা শেষপর্যন্ত নতুন নতুন সমস্যার জন্ম দিচ্ছে, গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই অবশেষে মারাত্মক সংকটে নিপতিত হচ্ছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এই সময়ে আলোচিত বা চলমান কয়েকটি ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে বিষয়টিকে আমি স্পষ্ট করতে চাচ্ছি।

www.pathagar.com

এক. বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক সংগঠন তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে গত কয়েক মাস যাবৎ আন্দোলন করে যাচ্ছেন। বর্তমান জোট সরকার গত নির্বাচনের প্রাক্কালে তাদের দলীয় ইশতেহারে এসব শিক্ষক সংগঠনকে এমন সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যা বিচ্ছিন্নভাবে পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অথচ ক্ষমতায় আসার জন্য এইসব শিক্ষক সংগঠনের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। ক্ষমতার ৫ বছরে এসব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়নি। এখন সবকটি স্তরের শিক্ষকসংগঠন একসঙ্গে আন্দোলনে নেমেছে। সরকারও বাজেটের সঙ্গে কোনো হিসাব মেলাতে পারছে না। তাই কারো সঙ্গে কথা, কারো সঙ্গে মৌনতা, কারো সঙ্গে পুলিশবেড়ি, কারো সঙ্গে আড়াআড়ি, কারো সঙ্গে প্রতিশ্রুতি, যৎসামান্য ঘোষণা—এ নিয়েই হিমশিম খেতে হচ্ছে সরকারকে। শিক্ষকরাও নাছোড়বান্দা! একসময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট নিয়েছিস তো এখন এ টাকা না দিয়ে যাবি কোথায়?

দেশের ৫/৬ লাখ শিক্ষককে এ পর্যায়ে নামানোর ফলে এক মাসের অধিক সময় স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে তালা ঝুলছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া লাটে উঠেছে। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের অবশেষে শর্তযুক্তভাবে বেতনাংশ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করার ঘোষণা দিতে হল সরকারকে। এখানেও দলীয় অনুগত এবং বিরোধীদলের প্রতি সমর্থনপুষ্ট শিক্ষকসংগঠনের কর্মকাণ্ড লক্ষ করা গেল। সরকার-সমর্থকদের একটি অংশ শর্তযুক্ত বর্ধিত বেতনভাতা নিয়ে বাড়ি গেল, অন্য অংশ বিরোধীদলের সমর্থনপুষ্টদের সঙ্গে থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করে। শেষপর্যন্ত সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত বেতন সরকারি কোষাগারে জমাদানের শর্ত আপাতত স্থগিত করেছে।

কথা হচ্ছে—দেশের বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এতসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া, বাস্তবায়ন না-করার ছলচাতুরীর পথে সরকার যাবে কেন? সরকারকে বিষয়টি ভাবতে হবে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে। কিন্তু সরকার অতীতে বা এখনো সেভাবে বিষয়টি নিয়ে ভাবছে না। ফলে বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা জায়গা ও ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পাঠদানের বিবেচনা থেকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না; হচ্ছে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। অথচ একটি জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে সরকারের অনুমোদন ও দায়ভার গ্রহণ করার বিষয়টি আপনাআপনি এসে যেত। সেক্ষেত্রে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই কারো খেয়ালখুশিমতো প্রতিষ্ঠিত হত না। শিক্ষক নিয়োগেও দুর্নীতি, অনিয়ম, দলবাজি সেভাবে স্থান পেত না। এখন পুরো বিষয়টি চলছে নানা দলীয়, স্থানিক, ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীভিত্তিক প্রভাব এবং ছলচাতুরীতে; এতে প্রকৃত শিক্ষার আবেদন ও অবস্থান তেমন একটা সবল নয়।

www.pathagar.com

আর দলবাজিটা সরকার এবং শিক্ষকদের উভয় দিক থেকেই হচ্ছে। সরকারের আনুগত্য দেখানোর প্রবণতাও শিক্ষকদের মধ্যে থেকে যাচ্ছে।

সরকার এবং শিক্ষকদের সম্পর্কের এই ধারা অব্যাহত থাকলে দেশের স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসা শিক্ষায় বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন সাধিত হবে না। প্রতিবছরই শিক্ষকরা ঢাকা শহরে এসে মহাসমাবেশ করবেন, আত্মাহুতির জন্য কাফনের কাপড় পরবেন, সরকার আশ্বাস দেবে, কাজের কাজ কিছুই হবে না, পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যাবে একই বিষয়ের। সুতরাং এটি সমাধানের কোনো পথ নয়। পথ হচ্ছে একটি জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে পুরো বিষয়টিকে দেখা, বোঝা ও পরিচালিত হতে দেওয়া। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত করুণা বা দাক্ষিণ্যে দেশের এতবড় একটি শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষকদের উন্নতি হবে, সেইসঙ্গে শিক্ষার মান বাড়বে, শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হবে—তেমনটি ভাবার কোনো কারণ নেই, সুযোগও নেই। অথচ দেশে কমিউনিটি প্রাথমিক থেকে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে চলছে বিবেকহীন দলবাজি, লুটপাট, দুর্নীতির ছড়াছড়ি। হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে আর এভাবে নয়, মানসম্মত শিক্ষার দীক্ষা নিয়েই চলতে দিতে হবে, পরিচালিত করতে হবে। এখানে আর নয় দয়া-দাক্ষিণ্য ও প্রতিশ্রুতির ছড়াছড়ি। এই দলবাজি ও দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতেই হবে।

দুই. এ বছর হঠাৎ করেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক আদেশ জারি করেছে—যা সকল অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীকে বিস্মিত করেছে। উচ্চমাধ্যমিক কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে একই গ্রেডপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বয়স যাদের বেশি তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছে। এই নিয়মটি দূরাশিক্ষণে কার্যকর আছে বলে আমরা জানি। কিন্তু আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বছর এই নিয়মটি সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থাতেও চালু করেছে। এর ফলে মাদ্রাসা থেকে আগত শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যারা এমনিতেই জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকেও বেশি—তারা নামীদামি কলেজগুলোতে এসএসসি পাস করে আসা ছাত্রছাত্রীদের থেকে বেশি সুযোগ পেতে যাচ্ছে। এটি বিশেষ একটি রাজনৈতিক মহলের ইচ্ছাকে পূরণ করতে সরকার করেছে—তা বুঝতে কারো বাকি নেই। সমমানের বা সমগ্রেডের ছাত্রছাত্রীর ভর্তিতে লিখিত বা মৌখিক পরীক্ষা আয়োজনকে বাদ দিয়ে বয়স বেশিকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়টি কোনো যুক্তির কথা হতে পারে না। কিন্তু সরকার বিষয়টি নিয়েছে দলীয় ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি বা সুযোগ দেওয়ার বিবেচনা থেকে—যার ফলে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে। এর ফলাফল শেষ বিবেচনায় ভালো হবে বলে মনে হয় না। এর ফলে উচ্চমাধ্যমিক কলেজগুলোতে ছাত্ররাজনীতির বিষয়টি সরকারিভাবেই প্রণোদনা পেল, যা কলুষিত ছাত্ররাজনীতির এই পর্বে নতুন সংযোজন ছাড়া আর কিছু নয়।

www.pathagar.com

তিন. পত্রপত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে যে, সরকার অচিরেই মাদ্রাসার ফাজিল এবং কামিল ডিগ্রিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং মাস্টার্স ডিগ্রির সমমানের মর্যাদা প্রদান করতে যাচ্ছে। এটি করা হলে মাদ্রাসার সকল ডিগ্রিই সাধারণ শিক্ষার ডিগ্রির সমমানের সরকারি ঘোষণা লাভ করবে। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার যেটুকু মান রয়েছে তা কি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অর্জন করছে? আসলে ধর্মীয় শিক্ষার নামে পরিচালিত মাদ্রাসা শিক্ষাটিকে বারবারই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে উপরে তোলা হচ্ছে। এভাবে তো একটি শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় না, মানসম্পন্নও করা যায় না। সার্টিফিকেটের মানের সঙ্গে যদি জ্ঞানের সামঞ্জস্য রক্ষিত না হয় তা হলে সেই সার্টিফিকেটপ্রাপ্তরা প্রতারিত হতে বাধ্য, তাদের মধ্যে নানাধরনের শিক্ষাবহির্ভূত অপশক্তি ও প্রবণতা কাজ করতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে, দেশের ফাজিল এবং কামিল মাদ্রাসাগুলো মাদ্রাসা বোর্ডের অধীন যে ডিগ্রির মান এসএসসি বা এইচএসসি পর্যায়ের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম, পঠনপাঠন পরীক্ষাপদ্ধতি একান্তভাবে জড়িত। ফাজিল ও কামিল ডিগ্রিকে দেশের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান প্রদান করা হলে ঐসব মাদ্রাসা আপনাআপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দাবি করবে। দেশের মাদ্রাসাসমূহের ফাজিল এবং কামিল শিক্ষার শিক্ষাক্রম, শিক্ষক ও পরীক্ষাব্যবস্থা কি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের ধারেকাছে অবস্থান করছে? বিষয়গুলো শুধু ধর্মীয় অনুভূতি বা রাজনৈতিক বিবেচনায় নয়, দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং দেশ ও জাতীয় উন্নয়নের চিন্তা থেকেও দেখার বিষয়।

বস্তুত মাদ্রাসাশিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার মানে উন্নীত করার প্রাণান্তকর চেষ্টা থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায় যে, মাদ্রাসাশিক্ষার ডিগ্রি অর্জন করে ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই জীবন ও জীবিকার প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে মানের সমতা বিধান করে ছাত্রছাত্রীদের চাকরি লাভের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে—বিষয়টি অবশ্যই গুরুত্ব পাওয়ার মতো। তবে মনে রাখতে হবে, পৃথিবী এখন যেভাবে ব্যক্তিমানুষের দক্ষতানির্ভর হয়ে উঠছে তাতে শুধু সার্টিফিকেটের মান দেওয়ার মধ্যে আটকে থাকলে হবে না, মাদ্রাসাশিক্ষাকেই বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঢেলে সাজাতে হবে; তাহলে তাদের ডিগ্রির সমতা আদায়ের কথা আলাদাভাবে ভাবতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসাশিক্ষাকে যেভাবে আধুনিক করা হয়েছে তাতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা (হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে) স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে তেমন তফাৎ খুঁজতে যায় না। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাশিক্ষার মান এমন পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কারণেই পাকিস্তান আগ্রহ দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসাশিক্ষা সংস্কার থেকে অভিজ্ঞতা লাভের। আমরাও তো বিষয়টি ভেবে দেখতে পারি, শিক্ষালাভ করতে পারি। আমরা ইউরোপ-

www.pathagar.com

আমেরিকায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করি। কিন্তু কী লাভ হয় তাতে আমাদের? প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে অল্পখরচে মাদ্রাসাশিক্ষার হালচাল ও অভিজ্ঞতা যদি আমাদের সামান্যও কাজে লাগে তাতে উপকার আমাদেরই হবে। বিষয়টি নিয়ে অপব্যাখ্যার চেষ্টা না করে জ্ঞানবিজ্ঞানের সুস্থ চিন্তাভাবনা থেকে সরকারকে অগ্রসর হতে বলব।

মনে রাখতে হবে একবিংশ শতাব্দী হচ্ছে জ্ঞানের যুগ, জ্ঞানহীন সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য এখন নেই। সুতরাং মানসম্মত শিক্ষালাভে আগাগোড়া দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে হবে, দুর্বৃত্তপনাও পরিহার করতে হবে। দেশের মাদ্রাসা-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন দুর্বৃত্ত ছাত্র-শিক্ষকে কীভাবে ভরে গেছে তা যদি এখনো আমরা উপলব্ধি করতে না চাই তা হলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সন্ত্রাসী ও গডফাদারই সৃষ্টি হবে; মহৎ কোনো জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, আলেম-কালেম, দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হবে না। ভাবতে হবে শিক্ষার এ প্রান্ত থেকে; দলবাজি বা আমলাতান্ত্রিক অবস্থান থেকে নয়।

ভোরের কাগজ, ১৩ আগস্ট ২০০৬

www.pathagar.com

পাঠপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ : যার যা প্রাপ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যানকে উদ্ধৃত করে ২০ জুলাই ২০০৭ দেশের জাতীয় পত্রপত্রিকাগুলো জানিয়েছে, এনসিটিবি আগামী শিক্ষাবছরের জন্য স্কুলপর্যায়ের যেসব পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করতে যাচ্ছে তাতে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস আর থাকছে না, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনক' হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, একই সঙ্গে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী ('বিপ্লবী' নামেই এটির যাত্রা শুরু হয়েছিল) বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে যে ঘোষণা প্রদান করেছিলেন তাও উল্লেখ থাকছে। মুক্তিযুদ্ধে যার যা অবদান ছিল তা তুলে ধরা হচ্ছে। এমন একটি খবর পত্রপত্রিকায় পড়তে গিয়ে দেশের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবক, নাগরিক সমাজসহ বেশিরভাগ মানুষেরই খুশি হওয়ার কথা, স্বস্তি প্রকাশ করার কথা। কেননা, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত, ক্লান্ত; শিক্ষকসমাজ বিব্রত, অভিভাবক সমাজ অসহায়; দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ, ত্যক্ত, বিরক্ত, ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে পড়েছে।

সেই ১৯৭৮-৭৯ সাল থেকে রাষ্ট্রশক্তির নির্দেশে বা ইঙ্গিতে আমাদের দেশে গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তকে যেভাবে কর্দমাক্ত করা হয়েছে তা থেকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে পাঠ্যপুস্তকে উদ্ভাসিত করা, গ্রহণ করা, বোঝা খুব সহজ কাজ নয়। বিশেষত ২০০১ সাল থেকে সাবেক জোট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে ও নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে যেভাবে বিকৃত করা হয়েছিল তা সব সভ্যতা-ভব্যতার নর্মসকে ছাড়িয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি আমরা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের প্রতিফলন পাঠ্যপুস্তকে দেখতে পাব তেমনটি প্রায় আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ধন্যবাদ বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং সেনাবাহিনীকে—যারা ক্ষমতা গ্রহণের পর এমন গ্লানিকর অবস্থা থেকে জাতিকে মুক্ত করার বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত তথ্য ও ইতিহাস সংশোধিত না হয়ে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত এর ওপর চূড়ান্ত মতামত দেওয়া ঠিক হবে না। আমরা আশা করব

www.pathagar.com

২০০৮ সালের পাঠ্যপুস্তকগুলো যখন মুদ্রিত হয়ে আসবে তখন যেন তা নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি, বিতর্ক বা অভিযোগ না ওঠে—সেভাবেই এনসিটিবি কাজটি সম্পন্ন করবে। আমরা এখানেই এই যুক্তিহীন বিতর্কের অবসান দেখতে চাই।

পত্রপত্রিকায় এনসিটিবির চেয়ারম্যানকে উদ্ধৃত করে যেসব বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তা পড়ে পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারিনি। বলা হয়েছে, এনসিটিবির একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি অতীতের সংশোধন এবং মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের ওপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুকে যথাযথ মর্যাদাসহকারে পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপন করেছে, একই সঙ্গে জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ঘোষণাকেও তুলে ধরেছে। আমি আবারও বলছি, পূর্ণ টেক্সটি না দেখে চূড়ান্ত মতামত দেয়া ঠিক হবে না, তাই দিচ্ছি না। তবে পত্রপত্রিকায় যেসব কথা বলা হয়েছে, যেভাবে উদ্ধৃত হয়েছে, তা যদি সত্য হয়, সেভাবেই যদি পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়, তাহলে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা তাতে কতখানি প্রতিফলিত হবে তা নিয়ে আমার সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। কেননা, পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধকে উপস্থাপন করা কোনো রাজনৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি জাতীয় দায়িত্ব। যেহেতু বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপনের, তাই কাজটি করতে হবে অ্যাকাডেমিকভাবে; রাজনীতি, দল ও ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পছন্দ-অপছন্দের ঊর্ধ্বে উঠে।

কিন্তু আমরা ১৯৭৮-পরবর্তী সময় থেকে যেসব পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবি কর্তৃক মুদ্রিত হতে দেখেছি তাতে ক্রমাগতভাবে দলীয় প্রভাব, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ধীরে ধীরে গ্রাস করতে দেখেছি। ১৯৯৬ সালে সে-কারণেই ইতিহাসবিদ-রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সাহিত্যের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত বিষয়-বিশেষজ্ঞ কমিটি বিকৃত তথ্য ও বক্তব্য সংশোধন করে মোটামুটি পাঠ্যপুস্তকে একটি বক্তব্য দাঁড় করিয়েছিল যাকে আর ইতিহাসবিকৃতি বলে অভিযুক্ত করা যায়নি। কিন্তু ২০০১ সালে জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কোনোপ্রকার বিষয়-বিশেষজ্ঞ ছাড়াই দলীয় ক'জন সাংবাদিক, শিক্ষক এবং আমলাকে দিয়ে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে একমাত্র জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধ বলে দেখিয়েছেন। এর জন্য ২০০৪ সালে স্বাধীনতা ঘোষণার একটি নকল দলিলও দলিলপত্রে সংযোজন করে সেটিকে উদ্ধৃত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং নেতৃত্ব প্রদানসহ সবকিছুকে দলীয়করণ করেছেন। 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি শেখ মুজিবের নাম থেকে তুলে দেয়া হয়েছে, তাঁকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে একজন পলায়নবাদী, বিতর্কিত এবং ব্যর্থ ও স্বৈরশাসক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সেটি এক দীর্ঘ ইতিহাস—যে আলোচনা এই নিবন্ধে সম্ভব নয়।

একটি বিষয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, ১৯৭৮ সালের আগে মুদ্রিত স্কুল পাঠ্যপুস্তকগুলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস খুব বিস্তারিতভাবে নয়, বরং অনেকটা সংক্ষিপ্ত আকারেই উপস্থাপন করা হয়েছে। সেসব পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ঘোষণা

www.pathagar.com

নিয়ে বিতর্ক করার মতো বক্তব্যও ছিল না। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এম এ হান্নান বা জিয়াউর রহমানের আহ্বানের কথাও উল্লেখ নেই। ১৯৭৮-৭৯ সালের পর থেকে পাঠ্যপুস্তকে প্রথমে তাদের দুজনের নাম, পরে শধু জিয়াউর রহমানের নাম লেখা হতে থাকে।

২০০১ সালের পরবর্তী সংস্করণগুলো স্বাধীনতার ঘোষণার সঙ্গে জিয়াউর রহমানের নাম একক বা একমাত্র হয়ে এসেছে। সত্যিকার ইতিহাসজ্ঞান ও গবেষণা দিয়ে বিষয়গুলো বিচার করা হলে এমনটি হত না। এখন আমাদের মনোজগতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মানেই বঙ্গবন্ধু এবং জিয়ার মধ্যে ভাগবাটোয়ারার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—যা ১৯৭১-এর বাস্তবতার প্রতিফলনে রচিত ইতিহাস মোটেও নয়।

১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আমরা যখন এ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস রচনা করেছি, তখন আমরা আসলে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতার খুব নিকটবর্তী বা কাছাকাছি সময়, বাস্তবতা, মন ও মানসিকতায় ছিলাম, তাই ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনের মতো ঘটনা, ব্যক্তিত্বের অবদানকে ছুড়ে ফেলে দেয়া, কাউকে জুড়ে দেয়া, মেনে নেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৯৭৮-এর পর থেকে নতুন দল, বিকল্প নেতার আবির্ভাব, রাষ্ট্রক্ষমতার ব্যবহার-অপব্যবহার ইত্যাদি থেকে ধীরে ধীরে দ্বিদলীয়, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী (যদিও বঙ্গবন্ধু তখন জীবিত ছিলেন না) দুই দলকে সমান্তরাল করার বিবেচনা থেকে বঙ্গবন্ধুর বিপরীতে জিয়াউর রহমানকে দাঁড় করানোর হীন চেষ্টা শুরু হয়। সেক্ষেত্রে অতীত ইতিহাসকে নিয়েও টানাটানি শুরু হয়। এখানেও পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস রচনায়, ইতিহাস পঠনপাঠনে বিশেষজ্ঞ, গবেষক, ইতিহাসবিদ নয়, বরং সাধারণ ডিগ্রিধারী শিক্ষক, আমলা ব্যক্তিরাই প্রাধান্য পাচ্ছেন, বিবেচিত হচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধের অধ্যায়গুলোর রচনায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গবেষণা ও গঠনপাঠনে বিশেষজ্ঞ নয়, ইতিহাস বিষয়ের যে-কোনো ডিগ্রিধারী যে-কেউই রচনা, সম্পাদনা ও রিভ্যু করার দায়িত্ব পাচ্ছেন, নিচ্ছেন। সে-কারণে তথ্যগত ভুল-বিভ্রান্তি, বিকৃতি আমাদের ছাড়ছে না। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে এ নিয়ে অভিযোগ করার মতো সুযোগ বারবার থেকেই যাচ্ছে। অথচ যে-কোনো দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যপুস্তককে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে; এর রচনা, সম্পাদনা, রিভ্যুসহ সব কাজই নিখুঁতভাবে করা হয়ে থাকে; তাতে তথ্যগত ভুল, বিকৃত ইতিহাস, বাক্যগঠন, বানানসহ সবকিছুই পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে থাকে। কোন্ শ্রেণীর কোন্ বইতে কী থাকবে, কত বাক্যে বিষয়বস্তু লেখা হবে তাও শিক্ষা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞ দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে তেমন চিন্তার প্রভাব এবং আয়োজন খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না।

www.pathagar.com

ফিরে আসি মূল প্রসঙ্গে। পাঠ্যপুস্তকে স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে যেসব কথা এ পর্যন্ত লেখা হয়েছে তা কি ১৯৭১ সালের বাস্তবতাকে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত করে থাকে? আমার কাছে প্রাপ্ত তথ্যে এবং ১৯৭১ সালে একজন কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র হিসেবে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে, একই সঙ্গে এ বিষয়ে দুই যুগের বেশি সময় ধরে গবেষণা ও লেখালেখি করার কিছু অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, আমাদের মানসজগতে ১৯৭৮-পরবর্তী রাজনৈতিক ও দলীয় চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে, বাসা বেঁধে আছে; ইতিহাসের জ্ঞান নয় কোনোমতেই। বলা হয়ে থাকে, ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছেন। এ ধরনের বক্তব্য থেকে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রথমত, বঙ্গবন্ধু নিজে কি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া বা এ সম্পর্কে কিছুই করেননি, সম্পৃক্ত ছিলেন না? দ্বিতীয়ত, বঙ্গবন্ধু কি মেজর জিয়াউর রহমানকে সেই দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন?

প্রশ্নগুলোর উত্তরে বলা যায়, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার আগে দেশবাসীকে স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতে আহ্বান জানিয়ে একটি বার্তা চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন—এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। ২৬ মার্চ সকালে চট্টগ্রাম শহরে সাইক্লো কপি করে সেই ঘোষণাপত্র প্রচার করা হয়েছে, দুপুরে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র সন্ধ্যায় সবেমাত্র চালু হওয়া 'বিপ্লবী' বেতার কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান তা পাঠ করেন। সেসব বার্তার প্রচার চট্টগ্রামসহ অন্যত্র ২৬ মার্চ ঘটেছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেই সময়ের বিদেশী প্রচারমাধ্যমেও স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে, বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত বার্তার খবর প্রচারিত হয়েছে। লন্ডনের *The Times* পত্রিকা ২৭ মার্চ সংখ্যায় ঢাকার খবর জানাতে গিয়ে লিখেছে : 'Civil war raged in the eastern region of Pakistan last night after the provincial leader Sheikh Mujibur Rahman had proclaimed the region as an independent republic'। শেখ মুজিব পূর্ববর্তী অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাতে কোনো ঘোষণা প্রদান না করলে টাইমস পত্রিকা এমন খবর ২৭ তারিখের সংখ্যায় ছাপাল কীভাবে?

কেউ কেউ বলে থাকেন, জীবিত অবস্থায় নাকি শেখ মুজিব ওই রাতে তার দেয়া ঘোষণা সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তারা নিজেরা এ সম্পর্কে তথ্য কতটা সংগ্রহ করেন আমি জানি না। তবে ১৯৭২ সালের ৭ জুন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত শ্রমিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু এ সম্পর্কে কী বলেছেন তা একবার পড়ে দেখুন। তিনি বলেছেন : '... রাত্রি ১১ টার সময় আমার সমস্ত সহকর্মীকে, আওয়ামী লীগের নেতাদের হুকুম দিলাম, বের হয়ে যাও। যেখানে পারো, এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। খবরদার, স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেয়ো।

www.pathagar.com

রাত্রে আমি চট্টগ্রাম নির্দেশ পাঠালাম। যাকে ইপিআর বলা হতো, তাদের সদর দফতর ছিল চট্টগ্রাম। পিলখানা হেডকোয়ার্টার তখন শত্রুরা দখল করে নিয়েছে। ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। আমি যখন পিলখানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলাম না তখন আমি চট্টগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ করে বললাম, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। তোমরা বাংলার সব জায়গায় ওয়ারলেসে এ খবর দিয়ে দাও। পুলিশ হোক, সৈন্যবাহিনী হোক, আওয়ামী লীগ হোক, ছাত্র হোক, যে যেখানে আছে পশ্চিমাদের বাংলা থেকে খতম না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বাংলাদেশ স্বাধীন।' তারা আমার কথামতো খবর পৌঁছিয়েছিল। (তথ্য প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭২, জুলাই, পৃষ্ঠা-৩)

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতার প্রেরিত বার্তাই দেশবাসী এবং বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হিসেবে ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে গৃহীত হয়, প্রচারিত হয়, এর প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু হয়। ২৬ মার্চ এবং ২৭ মার্চ নানা দুর্বিষহ ঘটনার পরও দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন— সেকথা কমবেশি জেনে যায়। চট্টগ্রামে যেহেতু বেতারকর্মীরা কালুরঘাট সাবস্টেশনটি চালু করে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, নানা খবর দেয়ার কাজ করছিল সেই সুযোগ ২৬ তারিখ প্রথম গ্রহণ করেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান। ২৭ তারিখ পটিয়ায় অবস্থানরত অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের বাঙালি সেনা অফিসার মেজর জিয়াউর রহমান ওই বেতারকেন্দ্রের নিরাপত্তা বিধান করতে এসে বেতারকর্মী বেলাল মোহাম্মদের অনুরোধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারকেন্দ্র থেকে পাঠ করেন। তার ওই আবেদনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই আছে। এতে স্বাধীনতার জন্য সূচিত যুদ্ধে বাঙালি সামরিক অফিসার এবং সৈন্যরা রয়েছেন, এমন বার্তা রাজনীতিবিদ এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—এর গুরুত্বকে কোনোভাবেই খাটো করা যাবে না। তবে যখন বলা হয়, তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা ২৭ মার্চ ওই বেতারকেন্দ্র থেকে প্রদান করেন তখন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নিজের দেয়া বার্তা ও ঘোষণা, দেশব্যাপী তা প্রচারিত হওয়া বিদেশী প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হওয়াকে অস্বীকার করা হচ্ছে। বিষয়টি মোটেও তেমন ছিল না। ওই দুদিনের ঘটনাবলিকে অবশ্যই দেখতে হবে। তাছাড়া স্বাধীনতার ডাকটি তখন সবাই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে জানতে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁর সম্মতি ছাড়া স্বাধীনতার ঘোষণা জনগণের সমর্থন পেত না। হ্যাঁ, তখন যোগাযোগব্যবস্থা আজকের মতো উন্নত ছিল না, তাই সবকিছু দ্রুত সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি তো গ্রেফতারের প্রাক্কালে যে-কোনোভাবেই হোক স্বাধীনতা ঘোষণার একটি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। এটিকে অস্বীকার করা হলে ১৯৭১ সালের ২৬ এবং ২৭ মার্চের অনেক কিছুকেই অস্বীকার করা হয়—যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনায় মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়।

www.pathagar.com

১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত সে-কারণেই বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কোনো বিতর্ক ছিল না। হাসান হাফিজুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' খণ্ড-৩ এর প্রথম দলিল হিসেবে বঙ্গবন্ধুর সেই বার্তাটিকেই 'Declaration of Independence' শিরোনাম দিয়ে ছাপা হয়েছে। আশা করি পাঠ্যপুস্তকে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ এবং স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য সংবলিত ইতিহাসকেই যথাযথভাবে তুলে ধরা হবে। কাউকে বড় করা বা ছোট করার প্রশ্ন এক্ষেত্রে অবান্তর। স্বয়ং জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন, 'এই পবিত্র মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের কথা, যেদিন চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আমার বলার সুযোগ হয়েছিল।' জিয়াউর রহমান একজন বড় মাপের মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধে একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন, এর আগে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে একাধিকবার জনগণকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়ে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার প্রতিটিই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তবে ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা বলার অর্থ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর পূর্ববর্তী ঘোষণাগুলোকে অস্বীকার করা, সেগুলো সম্পর্কে উহ্য থাকা, সেগুলোকে খাটো করে দেখা—তেমন প্রতিযোগিতামূলক বিতর্কটাই অনাকাঙ্ক্ষিত।

যুগান্তর, ২৮ জুলাই ২০০৭

www.pathagar.com

পাঠ্যপুস্তকেই নয়, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থাকতে হবে সর্বত্র

আগামী ২০০৮ শিক্ষাবর্ষের স্কুল পাঠ্যপুস্তকসমূহে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস আর থাকছে না বলে কয়েকটি জাতীয় পত্রিকা প্রতিবেদন ছাপিয়ে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছে, জানিয়েছে। পত্রিকাগুলো প্রকাশিতব্য পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বিকৃত ইতিহাস কোথায়, কতটুকু সংশোধন করা হয়েছে সেসব তথ্য উপস্থাপনও করেছে। একই সঙ্গে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ঐসব পাঠ্যপুস্তকে পূর্ববর্তী জোট সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং জিয়াউর রহমানের ভূমিকা কীভাবে বিকৃত করা হয়েছিল তাও যথাসম্ভব তুলে ধরেছে পত্রিকাগুলো। ফলে পত্রিকার পাঠকরা তুলনামূলক বিচার করার একটা সুযোগ পেয়েছেন। তাতে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, আগামী বছর থেকে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের যে বর্ণনা পড়বে, বঙ্গবন্ধু বা জিয়াউর রহমান সম্পর্কে যা পড়বে, তা নিয়ে আর কোনো বিতর্ক থাকবে না, অর্থাৎ দীর্ঘদিনের বিতর্কের একটা অবসান হবে।

তবে পত্রপত্রিকায় এ পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে যেসব সংশোধনী ছাপা হয়েছে তা পড়ে ইতিহাসের একজন ছাত্র হিসেবে আমি কিন্তু বলতে পারব না যে, যা লেখা হয়েছে তাই ইতিহাসসম্মত হয়েছে, এর আর কোনো পরিমার্জনের প্রয়োজন পড়বে না। উপস্থাপিত তথ্য ও বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে, দেশের বর্তমান পরস্পবিরোধী দ্বন্দ্ব দলীয় ধারায় দুজন নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু এবং জিয়াউর রহমানকে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের প্রধান এবং দ্বিতীয় নেতা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, একটি ভারসাম্যের নীতি পাঠ্যপুস্তকে নেওয়া হয়েছে, বর্তমানের পরস্পরবিরোধী এই দুই ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাসীদের আশ্বস্ত এবং সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইতিহাস কিন্তু এভাবে কখনো বস্তুনিষ্ঠতা পায় না, তুলে ধরা যায় না। কেননা, ইতিহাসে কাল বা সময় একটি গুরুত্বপর্ণ বিষয়। কালকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করা না গেলে ইতিহাস কখনো বস্তুনিষ্ঠতা পায় না। আগামী বছরের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অনেকটা অবিকৃতভাবে উপস্থাপিত হলেও সবটা

www.pathagar.com

হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। কেননা আমার মধ্যে যে সন্দেহ রয়েছে তা সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরছি।

১ ডিসেম্বর তারিখ *প্রথম আলোর* শীর্ষ প্রতিবেদনের শিরোনাম : 'শেখ মুজিব জাতির জনক, জিয়া স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।' প্রতিবেদনটিতে প্রকাশিত উদ্ধৃতিকে তথ্যসূত্র হিসেবে আমি ধরে নিচ্ছি—যেহেতু এখনো পাঠ্যপুস্তকগুলো মুদ্রণশেষে বাজারে আসেনি। বলেই রাখি, অতীতে দুইবার বিএনপি সরকার এবং বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের আমলে শুরুতে মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অংশগ্রহণকে উপস্থাপন করা, ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের মূল নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিল। এরও কারণ হচ্ছে, জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় সামরিক শাসক এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবির্ভূত হলেন, একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে দেশের রাজনীতিতে একটি ভিন্নধারা সৃষ্টি করে গেছেন। তাই দেশের পাঠ্যপুস্তকে তার জীবন ও রাজনীতি স্থান করে নিয়েছে। এমনকি এরশাদও (১৯৮২-৯০) যখন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিলেন তখন পাঠ্যপুস্তকে তার জীবন ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড স্থান পেয়েছিল। ১৯৭৮-পরবর্তী সময়ে যেসব পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাতে ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের একটি বাক্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। তখন অবশ্য পূর্ববর্তী বাক্যে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম এ হান্নান কর্তৃক ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার খবর দেওয়ার কথাও বলা ছিল। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের ঘোষণাটিকে রেখে এম এ হান্নানের বক্তব্য তুলে দেওয়া হয়েছিল, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে জিয়াউর রহমানের ঘোষণাই স্বাধীনতার মূলমন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। মুজিবনগর সরকার ও রণাঙ্গনের ইতিহাস খুব একটা উপস্থাপিত হয়নি। তখন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক পড়ে ছাত্রছাত্রীরা ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের ঘোষণাকে মুক্তিযুদ্ধের সবকিছু এবং এরপর জনগণ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে—এমন ধারণাই লাভ করেছিল।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠিত হওয়ার পর ৭ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকে যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠভাবে সংযোজন করেছিল। কমিটি জিয়াউর রহমানের ঘোষণার কথা বাদ দেয়নি, তবে এম এ হান্নানের দেওয়া বক্তব্যের কথাও পাঠ্যপুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু ২০০১ সালের পর পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, কাহিনী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জীবনীসহ যা-কিছু রচনা করা হয়েছিল তা কোনো বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা করা হয়নি। বিএনপি-জামাত ঘরানার ক'জন সাংবাদিক শিক্ষক এবং আমলা নিজেদের খুশিমতো, ইচ্ছেমতো, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা করেছেন, জীবনীও লিখে দিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তকে কী ধরনের শব্দ, ভাষা ও বক্তব্য প্রয়োগ করতে হয় ঐসব লেখকের তা মোটেও জানা ছিল না। তারা পাঠ্যপুস্তকে বিএনপির ১৯ দফা, দলীয় সংগীত 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রধান এবং একমাত্র নেতা হিসেবে জিয়াউর রহমানকে সর্বত্র তুলে ধরেছিলেন। এসব করতে গিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দলিলপত্রের তৃতীয় খণ্ডে জিয়াউর রহমানের নামে 'স্বাধীনতা ঘোষণা' নাম দিয়ে একটি 'দলিল' রচনা (!) করেছেন—যা মোটেও জিয়াউর রহমানের ২৭, ২৮ ও ৩০ মার্চের বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকে বিএনপি-জামাত ঘরানার লেখক-সাংবাদিকদের লেখা ঐসব বিকৃত তথ্য, ইতিহাস ও জীবনীর চাপে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা পর্যুদস্ত হয়েছে। একটি দেশের স্কুলের ২টি পাঠ্যপুস্তকে ৫ জন জাতীয় নেতার জীবনী পাঠ (মনগড়া, বানোয়াট তথ্যে, হীন উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা) ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করার বিষয়টি ভাববার মতো। এ ধরনের একটি পরিস্থিতি থেকে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বের হয়ে আসতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। তারা শুধু রচনাসমূহে কিছু সংযোজনী, সংশোধনী বাদ দেওয়ার কাজ করেছে। আদৌ চতুর্থ ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য এতগুলো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, থাকলেও দুটি পাঠ্যপুস্তকে তা সীমাবদ্ধ থাকবে কেন, কেন বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে নয়—ইত্যাদি গুরুতর প্রশ্ন রয়েই গেছে।

যে কথা বলেছিলাম। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বলতে যেন স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিলেন—তার মধ্যেই আটকে আছে। অতীতের পাঠ্যপুস্তকের মতো আগামী বছরও ছাত্রছাত্রীরা ঐ চিন্তার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারছে না। বলা হয়েছে : '১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করে। এ রাতেই সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তার বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে। বন্দি হওয়ার আগে ২৫ মার্চ দিবাগত মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই রাতেই চট্টগ্রামে মেজর জিয়াউর রহমান পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ... ২৭ মার্চ মেজর জিয়া চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে পুনরায় স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।' পাঠক লক্ষ করলেই আমাদের ইতিহাস জ্ঞানের দৈন্যদশা বুঝতে পারবেন। এখানে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পরের লাইনেই বলা হয়েছে, ''সেই রাতেই...'। এই বাক্য পড়ে ছাত্রছাত্রীরা বুঝবে যে, বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পর আর কেউ নয়, জিয়াউর রহমানই বিদ্রোহ করেন এবং তিনি ...।

১৯৭১ সালে কি অবস্থা তেমন ছিল? ২৫ মার্চ রাতে এ ঢাকা শহরের পিলখানাসহ অনেক জায়গাতেও বিদ্রোহ হয়েছে। সারা দেশেই বিদ্রোহ কমবেশি হয়েছিল। উদ্ধৃত অংশ পড়ে শিশু-কিশোর ছাত্রছাত্রীরা মনে করবেন ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর পরের ব্যক্তি হচ্ছেন জিয়াউর রহমান। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে এম এ হান্নান রাজনৈতিক নেতা হিসেবে দুইবার বক্তব্য দিয়েছেন। বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে মেজর জিয়াউর রহমান মোট ৩ বার বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা উক্ত কেতার থেকে প্রচার করেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি গ্রেপ্তার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু যেভাবেই হোক চট্টগ্রাম হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর ঘোষণাটি ১০ এপ্রিল প্রণীত 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'-এ বিবৃত হয়েছে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকার কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন দলিলপত্রে যেভাবে লিখিত হয়েছে সেটিকে বাদ দিয়ে পরবর্তী সময়ে অন্য কোনোভাবে বলা ও উপস্থাপন করা মোটেও ইতিহাসসম্মত হয় না। আমাদের এতবড় মহান মুক্তিযুদ্ধকে ১৯৭১ সালে একটি অস্থায়ী সরকারের সংগঠিত এবং নেতৃত্ব প্রদান করেছিল। সেই সরকারের প্রতি আস্থা স্থাপন করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ, বাঙালি সামরিক বাহিনী, পুলিশ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসহ সকল শ্রেণী-পেশার ও স্তরের মানুষ সমর্থন জানিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই দেশের মানুষকে একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পাকিস্তানি বাহিনী ভেবেছিল শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করার পর সবকিছু তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল জনগণ এবং বঙ্গবন্ধুর অনুসারী তাজউদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের যুদ্ধ, কূটনীতি এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ গণতান্ত্রিক বিশ্বের সাহায্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়ের উচ্চতর সোপানে নিয়ে আসে। সুতরাং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, কর্নেল ওসমানীসহ শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে উপস্থাপন করেই কেবল অন্যদের আনা যেতে পারে। নতুবা যে বিভ্রান্তি এবং শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তাতে স্কুলপর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস পাঠ ব্যর্থই হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ নিয়ে আমরা এখনো কানামাছির খেলাই খেলছি, ইতিহাসের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার ধারেকাছেও যাচ্ছি না। ইতিহাসে বলপ্রয়োগ, রাজনীতি, ভারসাম্য সৃষ্টি করার কোনো স্থান নেই। ইতিহাসকে কালের বাস্তবতায় উপস্থাপন করতে হয়। আমরা পাঠ্যপুস্তকে সেই কাজটি এখনো করতে পারিনি। তাছাড়া, শুধু পাঠ্যপুস্তকেই কেন, দেশের রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রচারমাধ্যমসহ সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে আরো বস্তুনিষ্ঠভাবে, আরো আবেগহীন, অন্ধবিশ্বাসহীন বা পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও অবস্থান থেকে মুক্ত থেকে চর্চা করার, গবেষণা করার কথা কেন ভাবি না?

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতাকে ১৯৭১ বা ১৯৭৫ বা ১৯৯১,২০০১, ২০০৭-এর রাজনৈতিক ও দলীয় বাস্তবতা দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে দেখলে মোটেও ইতিহাসসম্মত হবে না। এটিকে করতে হবে ১৯৭১ এবং এর পূর্ববর্তী বাস্তবতা দিয়ে। আমরা বারবারই স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক বিভাজন, দলীয় অবস্থান থেকে পাঠ্যপুস্তক, পত্রপত্রিকার লেখালেখি, রাজনেতিক আলাপ-আলোচনা ও বিশ্বাস তৈরি, প্রচার করার অবস্থান থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তাতে ব্যক্তির সাবজেক্টিভ চিন্তাভাবনা, বিশ্বাস, চাওয়া-পাওয়া ও প্রতিযোগিতা স্থান পেয়েছে। যতবেশি বিষয়বাদ স্থান পেয়েছে, ততবেশি মুক্তিযুদ্ধের ১৯৭১ সালের ইতিহাস খণ্ডিত, বিকৃত, অর্ধসত্য, অর্ধমিথ্যা বা সম্পূর্ণরূপে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ইতিহাসকে তাই কালের বাস্তবতায় উপস্থাপন ও চর্চা করার কথা শুধু পাঠ্যপুস্তকে নয়; রাষ্ট্র, সমাজ, প্রচারমাধ্যম ও রাজনীতিসহ সর্বত্র উপস্থাপন করতে হবে, চর্চা করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি দায়, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ, সেই চেতনায় নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার কথা ভাবতে হলে সেই সর্বজনীন জ্ঞানতত্ত্বে, ইতিহাস চর্চাতেই মনোনিবেশ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক একটি মাত্র অঙ্গন, মাধ্যম। রাষ্ট্র ও সমাজের সব অঙ্গনকেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গভাবে শ্রদ্ধাভরে চর্চা করার কথা শিখতে হবে।

ভোরের কাগজ, ৫ ডিসেম্বর ২০০৭

www.pathagar.com

গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

প্রতিবছর এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রপত্রিকা বা বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে কিছু তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দেশের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের ফলাফলের পার্থক্য, ব্যবধান বা বৈষম্যের একটা চিত্র এভাবে তুলে ধরা হয় (বলতে দ্বিধা নেই এই চিত্রটা সম্পূর্ণ নয়, সামান্যই মাত্র, বাস্তব চিত্রটা আরো করুণ এবং ভয়াবহ) যে, দেশের গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা পাসের প্রতিযোগিতায় শহরাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে, খারাপ ফলাফল করছে। ব্যস্! শিক্ষাবোর্ডের দুএকজন চেয়ারম্যানও গ্রামাঞ্চল এবং শহরাঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলের কিছু তথ্য-উপাত্ত দিয়ে চিত্রটা একভাবে আঁকার চেষ্টা করেন, তাতে ব্যবধানের চিত্রটা খালিচোখেই ধরা পড়ে। আমরা তেমন একটি চিত্রই প্রতিবছর দেখে আসছি, প্রায় একই কথাই শুনে আসছি। তবে এই চিত্রে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলের লেখাপড়ার বাস্তব অবস্থার পুরোপুরি ছবিটা যদি তুলে ধরা যেত, যদি আমরা যথার্থই এই ব্যবধানের মাত্রাটা বুঝতে চেষ্টা করতে পারতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি এর প্রতিকারের চিন্তা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতাম তাহলে হয়তো এতদিনে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা এমনটি হত না। কিন্তু চিত্রকরগণ যেন আঁকার জন্যই চিত্র আঁকেন, বক্তারা বলার জন্যই যেন বলে থাকেন! এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় দায়িত্ব ও ক্ষমতা যাদের হাতে রয়ে গেছে তারা এ পর্যন্ত কোনো মিশন-ভিশন জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করেননি, তাই এক্ষেত্রে ব্যবধানটি এখন এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে যে সেই দূরত্ব এখন কেউ ঘুচাতে পারবে কিনা জানি না, উদ্যোগ নেবে কিনা তাও জানি না।

একসময় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। শতবর্ষের কিছু ঐতিহ্যবাহী স্কুল নিভৃত কোনো পল্লীতে গড়ে তোলা হয়েছিল। কোনো দানশীল হিন্দু জমিদার অথবা প্রকৃত কোনো সমাজসেবক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে তাতে সাধ্যমতো লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতেন, সেইসব পুরাতন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দূরদূরান্তের ছেলেরা ছুটে যেত, জায়গির বা হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত, ভালো ফলাফলও অনেকে করত। সেইসব দিন অনেক আগেই

www.pathagar.com

গত হয়েছে। এরপর আরো কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে নানাজনের চেষ্টা, দান-খয়রাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলোর কোনোটি একযুগ ভালো করছে তো তিন যুগ মাথা থুবড়ে পড়ে আছে, হাঁটি হাঁটি পা পা করে বৃদ্ধবয়সেও চলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে নানাজন নানা উদ্দেশ্যে এখানে-সেখানে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা গড়ে তুলেছে। এগুলো প্রতিষ্ঠার পেছনে কোনোকালেই সরকারের কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিল না। শিক্ষা বোর্ডগুলোর একধরনের নীতিমালা আছে যা দুর্নীতিতে ভরা। তেমন একটি অর্ধপরিকল্পিত দুর্নীতিগ্রস্ত নীতিমালার মধ্যদিয়ে দেশের গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা গড়ে উঠছে যেগুলোতে দেশের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী পড়ছে, পড়তে বাধ্য হচ্ছে। সরকার উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে না, তোলার জন্য কাউকে উদ্বুদ্ধ করে না, তবে কেউ যদি একখণ্ড জমি দিয়ে, কিছু ইট-টিন দিয়ে একখানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে তাহলে নানা তদবির, অর্থকড়ি ঘুষ দিয়ে তার অনুমোদন নেওয়া, একই সঙ্গে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনাংশ দেওয়ার (অবশ্যই ঘুষের বিনিময়ে) ব্যবস্থা করে থাকে। কোনো সভ্য দুনিয়ায় এভাবে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে, পরিচালিত হতে পারে, হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে—তা ভাবাই যায় না। কিন্তু আমাদের এখানে এভাবেই দেশের বিশাল শিক্ষাব্যবস্থাটি গড়ে উঠেছে এবং চলছে। সুতরাং এর অবস্থা কী হতে পারে, এর থেকে প্রাপ্তি কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

দেশে এখন মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এর ৮০ শতাংশই গ্রামাঞ্চলে। এবং এগুলোর ৯৯.৯৯ শতাংশই বেসরকারি স্কুল, এগুলোর বেশিরভাগই গত ৪০/৫০ বছরে গড়ে উঠেছে। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাশাপাশি গড়ে উঠেছে সমসংখ্যক বা তার চাইতেও বেশিসংখ্যক মাদ্রাসা। একই গ্রামে এক বা একাধিক স্কুল এবং মাদ্রাসা পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, হচ্ছে। কেউ তার মরহুম পিতা বা মায়ের নামে, কেউবা নিজের নামে ঐসব প্রতিষ্ঠান গড়েছেন বা গড়ছেন; নিজের খেয়ালখুশিমতো, পছন্দমতো শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। দুচার বছর যেমন-তেমনভাবে প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা বোর্ডকে ধরে ধরে অনুমোদন বাগিয়ে নিয়েছেন, এমপিওভুক্ত করিয়ে নিয়েছেন (ঘুষের বিনিময়ে), এরপর অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতাই প্রতিষ্ঠানের দেখভালের দায়িত্ব প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। কেউবা হয়তো বেঁচে নেই, কেউবা বেঁচে থাকলেও শহরে চলে গেছেন, আবার কেউ কেউ খবরদারিত্ব করতে মোটেও কসুর করেন না। অধিকাংশ স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাতেই স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব, দাপট, ঠেলাঠেলি লেগেই আছে। গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ

www.pathagar.com

স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে শিক্ষাবিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্য যতটা না কাজ করেছে তার চাইতে বেশি কাজ করেছে কারো কারো নামধাম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্কিত করা, রাজনৈতিক বা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তার করা, সরকারি অনুদান লাভ করা, কিছু মানুষকে চাকরি দেওয়া ইত্যাদি।

আগেই বলেছি শত বছর আগে যখন কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেন, তখন তিনি তার নিজের জমি, অর্থ ও শ্রম দিয়েই তা করতেন। সরকারি অনুদান তাতে মোটেও ছিল না, তেমন ব্যবস্থাও সেকালে ছিল না। পাকিস্তানকালে বেসরকারি স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসার অনুমোদন দেওয়া ছাড়া সরকার তেমন অর্থকড়ি দিত না, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষাখাতে সরকারি বরাদ্দ প্রতিবছর বাড়ছে। কিন্তু সরকার নিজে স্বল্প, মধ্য বা দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নিয়ে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেনি, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিছু অনুদান, শিক্ষকদের কিছু বেতনাংশ দেওয়ার নীতি নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। ধীরে ধীরে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সরকারের সঙ্গে কখনো কখনো এসব সংগঠন আপসে, কখনোবা আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের বেতনাংশ (অধিকার) সরকারি কোষাগার থেকে আদায় করেছে। একসময় স্কুল ও কলেজ সরকারিকরণ, জাতীয়করণ ইত্যাদিও হয় বেশ জোরেশোরে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রতিটি থানায় এক বা একাধিক বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের সুযোগ পেলেও স্কুল সেভাবে সুবিধা পায়নি। তবে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারি অংশ প্রতিটি সরকারই নানা বিবেচনা (ভোট অবশ্যই) থেকে বৃদ্ধি করেছে; স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাকে অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অনুদান দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে ভোট পাওয়া না-পাওয়ার হিসাব-নিকাশ বেশ জোরদার হয়েছে, নির্বাচনে এসব বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দল বা দলের প্রার্থী, প্রভাবশালী নেতা এলাকার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাকে যত বেশি টিন, আর্থিক অনুদান দিতে পারে, সেই স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা সেই দল বা ব্যক্তির পক্ষে ভোটের সময় কাজ করে থাকে। একধরনের ভিক্ষাবৃত্তির সুবিধা পাওয়া-নেওয়ার মানসিকতা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। দেশের সরকার, রাজনৈতিক দল, ধর্মীয়গোষ্ঠী, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় ব্যক্তি, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এমন কিছু ক্ষতিকর ও শিক্ষাবিবর্জিত মানসিকতায় পরিচালিত হয়ে আসছে যা অবাক করার মতো, এর থেকে বের হয়ে আসার কোনো চেষ্টা কারো মধ্যে আছে বলে আমার জানা নেই।

গ্রামাঞ্চলের বেশির ভাগ স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাই অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনুমোদনও নানাভাবে পেয়েছে। বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

ব্যবস্থাপনা পরিষদে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি মনোনীত বা নির্বাচিত হয়ে আসেন, এদের বেশির ভাগই এখন রাজনৈতিক প্রভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদেরও পরিচালিত করতে চান। বেশিরভাগ সভাপতি ও সদস্য লেখাপড়া, শিক্ষাদীক্ষায় মোটেও আলোকিত নন। তারা বেসরকারি স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ পরিচালনার আইন, নিয়মনীতির কিছুই জানেন না, মানেনও না। অথচ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার নীতিনির্ধারণী দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা পরিষদের। দেখা যাচ্ছে ঐসব পরিষদে এমন সব ব্যক্তি বসেন, কথা বলেন, প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেন— যারা এটি যে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সে-ধারণাই রাখেন না।

এমন ভয়ানক তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে আমাদেরকে প্রতিনিয়ত পড়তে হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের অনেকের আচার-আচরণে মনে হচ্ছে তারা ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার, চেয়ারম্যান অথবা রাজনৈতিক দলের কেউকেটা কেউ একজন। সে ভাষাতেই তারা কথা বলতে চেষ্টা করেন। এরা শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা, ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের গুরুত্বকে মোটেও উপলব্ধি করতে পারেন না, চানও না। নিজেদের আত্মীয়স্বজন, এলাকার বেকার যুবক, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, সমর্থকদের নিয়োগদানে বরাবর উৎসাহী থাকেন; আর্থিক লেনদেনে অনেকেই জড়িত থাকেন; স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফরম পূরণের ক্ষেত্রেও লেনদেনে জড়িত থাকেন।

আগেই বলেছি, দীর্ঘদিন শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের সুযোগ নিয়ে বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অদক্ষ, অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ, রাজনৈতিকভাবে প্রভাববিস্তারকারী লোকদের শিক্ষকপদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যাদের বেশির ভাগই প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত পাঠদান করাতে পারেন না, বিশেষত গ্রামাঞ্চলের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতে গণিত, ইংরেজি, বিজ্ঞানসহ গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি বাংলাভাষায় পারদর্শী শিক্ষকের দারুণ অভাব; বলতে গেলে, তেমন যোগ্য শিক্ষক নেই-ই। ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান যেনতেনভাবে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাজীবনে যিনি ইংরেজিতে পাস করেছেন বা ভালো নম্বর পেয়েছেন তেমন শিক্ষক গ্রামের স্কুল বা মাদ্রাসাগুলোতে খুব একটা যান না। যেতে তারা চান না তেমনটি নয়। দক্ষ, অভিজ্ঞ শিক্ষক নেওয়ার চেষ্টা কম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরই ছিল। তাছাড়া এখন তো পদগুলো সবই পূরণ হয়ে আছে। রাতারাতি শিক্ষক পরিবর্তন করাও যায় না, নিয়োগও দেওয়া যায় না। যারা যে প্রক্রিয়ায় একবার নিয়োগ লাভ করেছেন তাদের অবসরে যাওয়া ছাড়া ঐসব পদ আর কোনোভাবেই খালি হবে না।

তাই বলে আশা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমি মনে করি, বিদ্যমান অবস্থার মধ্যেই পরিবর্তনসমূহ আনতে হবে, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে আদর্শবান, যোগ্য,

www.pathagar.com

দক্ষ, শিক্ষাসচেতন ব্যক্তিদেরই গুরুত্ব দিতে হবে, জবাবদিহিতার আওতায় পরিচালনা কমিটিকে আনতে হবে। এলাকার রাজনৈতিক গোষ্ঠী-পারিবারিক দ্বন্দ্ব, প্রভাব থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মুক্ত রাখতে হবে এবং যথাযথ আইন ও প্রাশাসনিক নজরদারিত্ব থাকতে হবে। বিষয়ভিত্তিক দক্ষ শিক্ষক সর্বত্র নিয়োগ দিতে হবে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের অতিরিক্ত সুযোগসুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সবার আগে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাদের ওপর দুদকের নজরদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষা অধিদপ্তর বা এ-ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর কারণে দেশের শিক্ষাঙ্গনে দুর্নীতি, অনিয়ম, অযোগ্য, অদক্ষ লোকদের রাজত্ব কায়েমের সুযোগ হয়েছে। হ্যাঁ, অবশ্যই স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাগুলোকে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের মানসম্মত পাঠদান; শিক্ষা, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া তথা সহশিক্ষাক্রমে ব্যস্ত রাখার কোনো বিকল্প নেই।

গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো যুগ যুগ ধরে প্রকৃত লেখাপড়ার পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, সেভাবেই ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষ ডিঙিয়ে উপরে উঠছে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছে না তাদের মেধার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানোর পাঠদান, পরিবেশ ও চিন্তার সুযোগ। সে কারণেই তারা যখন পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় তখন তাদেরও সম্বল থাকে খুবই কম। মা-বাবা এবং স্থানীয় পীর ফকিরের দোয়া—অতটা সম্বল নিয়েই তারা পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চায়। এদের মধ্যে সামান্য সংখ্যকই ব্যক্তিগত অধ্যবসায়, পিতামাতার অর্থখরচসহ যত্ন নেওয়া এবং শিক্ষকদের অতিরিক্ত মনোযোগ ইত্যাদিকে সম্বল করে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে। খুব কমসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই ভালো ফলাফল দেখিয়ে নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই এতবড় পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে লোকচক্ষুলজ্জায় পড়ে, যা কোনো কোনো ছাত্রছাত্রী সহ্য করতে পারে না। তাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা ছাড়া আমরা আর কী করছি?

একটি ভয়ানক রকমের ত্রুটিযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে প্রতিবছর আমাদের গ্রামাঞ্চলের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী অকৃতকার্যের তালিকায় নাম ওঠায়, শিক্ষাজীবন থেকে বিদায় নেয়, সমাজের বেকারত্বের মধ্যে নিজেদের নাম লেখায়। এর জন্য দায়ী আর কেউ নয়, আমাদের নীতিনির্ধারকমহল, যাদের অপসৃষ্টির ওপর দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা।

ভোরের কাগজ, ২০০৭

www.pathagar.com

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে বিতর্ক

গত শতাব্দীর নব্বুইয়ের দশক থেকে দেশে ছাত্ররাজনীতির পক্ষে-বিপক্ষে একটি বিতর্ক প্রায়ই চলতে দেখা যাচ্ছে, কিছুদিন বিরতি দিয়ে আবারো তা ফিরে আসতেও দেখি। রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদও একবার সকল রাজনৈতিক দলের কাছে ছাত্ররাজনীতি নিয়ে একটি জাতীয়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। গত ৪ দলীয় জোট সরকারের সময়ও দেশে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার পক্ষে-বিপক্ষে কয়েকবার বিতর্ক উঠতে দেখা গেছে। সবসময়ই বিতর্কটি কিছুদিন চলে আবার বন্ধ হয়ে যায়। সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন, বিচার ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ছাত্রসংগঠনকে দলীয় লেজুড়বৃত্তি থেকে মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে আইন করার কথা বললে আবার এ নিয়ে বিতর্কটি শুরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করতে যাচ্ছে, তাতেও দলীয় অঙ্গসংগঠনের পরিচয় থেকে ছাত্রসংগঠনকে বাদ দেওয়ার একটি বিধান রাখার পক্ষে চেষ্টা করা হবে। দেশে এখন জরুরি অবস্থা চলছে, ঘরোয়া রাজনীতিও এখনো শুরু হয়নি। তারপরও বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে একটি বিতর্ক এখন চলছে।

রাজনৈতিক দল এবং ছাত্রসংগঠনগুলোকে প্রায় একবাক্যেই ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা বা এ-ধরনের কোনোকিছু করার বিপক্ষে নানান মতামত রাখতে দেখা যাচ্ছে, তারা ছাত্ররাজনীতির অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর পক্ষে অনেক যুক্তি উপস্থাপন করছেন। অতীতেও যখন এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হত, তখন একই যুক্তি একই কথা শোনা যেত। আবার ছাত্ররাজনীতি যে এখন আর সুস্থধারার রাজনীতির সঙ্গে নেই; এখানে অস্ত্র, চাঁদাবাজি, শিক্ষাঙ্গন দখলে রাখার মতো ক্ষতিকর বিষয়গুলো ঢুকে গেছে, প্রধান হয়ে উঠেছে—একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। এ-ধরনের প্রেক্ষিতে কথা উঠেছে ছাত্ররাজনীতিতে বন্ধ করার। ছাত্ররাজনীতিকে নিষিদ্ধ রাখা, অথবা স্থগিত রাখা, অথবা দলীয় রাজনৈতিক দলসমূহের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেওয়ার পক্ষে একটি জোরালো মত রয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই এই বিতর্কটি কিছুদিন চলার পর আবার বন্ধ হয়ে যায়, কোনো কাজের সিদ্ধান্ত কেউ গ্রহণ করতে পারে না। এবারও বিতর্কটি শেষ পর্যন্ত তেমনই হতে যাচ্ছে কিনা তা দেখার বিষয়, ভাববার বিষয়।

www.pathagar.com

ছাত্ররাজনীতি বা ছাত্রসংগঠনগুলো নিয়ে বর্তমান বিতর্ক যেখানেই যাক, এর পক্ষে-বিপক্ষে যত যুক্তিই উপস্থাপিত হোক না কেন; একথা স্বীকার করতে হবে যে, এদেশে একসময় ছাত্ররাজনীতি থেকে মহৎ বেশকিছু অর্জিত হয়েছে। ভালো ভালো নেতৃত্ব বের হয়ে এসেছে। আবার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ছাত্রসংগঠনের নামে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় দখল রাখা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সংঘর্ষ, রক্তারক্তি, হানাহানির মতো দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতাও দারুণভাবে বেড়ে গেছে। ছাত্রসংগঠনগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীরূপে পরিচিত হওয়ার বেশি জাতীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অতীতের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে কোনো অবদান রাখছে না, এমনকি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার তিক্ত ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হওয়ার পর প্রচলিত ছাত্ররাজনীতি থেকে অতীতের মতো সৎ, যোগ্য, মেধাবী নেতৃত্ব বের হয়ে আসবে বা আসছে—তেমন আশাও খুব একটা করা যাচ্ছে না। সুতরাং ছাত্ররাজনীতি বা ছাত্রসংগঠনগুলো নিয়ে একদিকে আমাদের জাতীয়ভাবে আবেগ-অনুভূতি, গণতান্ত্রিক অধিকারের পক্ষে অবস্থানের যুক্তি কাজ করছে; অন্যদিকে গত ১৫/১৬ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং হতাশার চিত্রও ফুটে ওঠাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ-ধরনের একটি উভয় সংকট এক্ষেত্রে বিরাজ করছে। কথা হচ্ছে : আমরা এই সংকট থেকে যথার্থই বের হয়ে আসতে চাই কিনা; বিশ্ববাস্তবতা এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির গুরুত্বকে যথাযথভাবে চর্চা করতে চাই কিনা; আমাদের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার বিষয়টিকে আমরা আজকের দুনিয়ার অভিজ্ঞায় দেখতে চাই কিনা; যা-কিছু করণীয় আছে তা আমরা করতে চাই কিনা—তা বোধ হয় গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে, নির্ধারণ করতে হবে।

ছাত্ররাজনীতি নিয়ে সকলের আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও আমি বলব, পৃথিবীতে আমাদের দেশের মতো শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রসংগঠনের নামে ছাত্ররাজনীতির চর্চা, ধারা কোথাও খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশেও শুরুর দিকে ছাত্রসংগঠনের উৎপত্তি এবং কার্যক্রমের মধ্যে রাজনীতির বিষয়গুলো প্রধান ছিল না। বরং অরাজনৈতিক পরিচয়ে জন্ম নেয়া, কার্য চালিয়ে যাওয়া ছাত্রসংগঠনগুলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মতো মেধাচর্চার কর্মকাণ্ডেই বিশেষভাবে যুক্ত থাকতে দেখা গেছে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ঐসব সংগঠনের আকর্ষণ ছিল। কিন্তু জাতীয় রাজনীতির কিছু অপরিহার্য চাহিদা পূরণে ঐসব ছাত্রছাত্রী এগিয়ে এসে বড় ধরনের সাফল্যের স্বাক্ষর রাখার অভিজ্ঞতা আমাদের অরাজনৈতিক ছাত্রসংগঠনগুলোকে একসময় সকলের অজান্তেই ছাত্ররাজনীতির পরিচয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারা সততা, মেধা ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের দুই সত্তা তথা দুই পরিচয়ে বিকশিত হতে পেরেছিল; ছাত্রসংগঠন শিক্ষার আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের ভালো লেখাপড়া সংগঠনের মর্যাদাও অক্ষুণ্ন রেখেছিল। সেই সময়ের

www.pathagar.com

সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, মানসিকতা, এবং বিশ্ববাস্তবতা থেকে আমাদের তৎকালীন ছাত্রসমাজ, ছাত্রনেতৃত্ব খুব একটা বিচ্যুত হয়নি, ছাত্রনেতৃত্ব বরাবরই মেধাবীদের হাতে ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার পর দেশের রাজনীতিতে নানান উত্থান-পতন, আদর্শচ্যুতি বিচ্যুতির ঘটনাও ঘটেছে, রাজনৈতিক দলেরও আবির্ভাব ঘটেছে, উচ্চবিত্তের বিকাশেরও সম্ভাবনা ঘটেছে; জাতীয় রাজনীতিতে দুর্নীতি, লুটপাট ও সন্ত্রাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এসব চিত্র-বিচিত্র দুঃখজনক প্রবণতা আমাদের প্রায় সবকিছুকেই মূলধারা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এর প্রভাব এসে সরাসরি পড়েছে ছাত্রসংগঠন তথা ছাত্ররাজনীতিতে।

১৯৯০-এর সফল রাজনৈতিক আন্দোলনে ছাত্রসংগঠনগুলো শেষবারের মতো ছাত্ররাজনীতির মহৎ ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রাখার পর সবকিছু ওলটপালট হতে থাকে। ছাত্রনেতারা আন্দোলনের বিনিময় লাভে নেমে পড়ে, কেউবা সরাসরি নির্বাচনে মনোনয়ন লাভ করে; কেউবা চাঁদাবাজি, ব্যবসা-বাণিজ্য অথবা অন্যকিছু নিয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে তৎপর হয়ে ওঠে। ছাত্রনেতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের প্রভাবে ফুলে-ফেঁপে ওঠা, বিত্ত ও ক্ষমতায় বেড়ে ওঠার নজির আমাদের ছাত্ররাজনীতির জন্য নজিরবিহীন ছিল। এখান থেকেই ভিন্ন নজির সৃষ্টি হতে থাকল, দেশের শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রসংগঠনগুলো মূলধারা থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করল। ছাত্রছাত্রীদের একটি অংশ ছাত্রসংগঠনগুলোর নেতৃত্ব গ্রহণ করার মাধ্যমে বিত্ত ও ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠতে শুরু করে। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রসংগঠনগুলো আর আগের চরিত্রে, নীতি-নৈতিকতায় থাকেনি। সরকারসমর্থিত ছাত্রসংগঠন সরকারবিরোধী ছাত্রসংগঠনগুলোকে নজরদারিতে রাখা, দমিয়ে রাখা তথা ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীতে পরিণত হয়। দেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সরকারের সুদৃষ্টিতে থাকতে শুরু করে, সেখানকার প্রশাসনও দলীয় অনুগতদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ধারা তৈরি করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় সরকারসমর্থিত ছাত্রসংগঠন।

সরকারসমর্থিত ছাত্রসংগঠনে রাজনীতি শুরু হলে শিক্ষাঙ্গন থেকে বিদায় নেয় আমাদের চিরচেনা আবেগ-অনুভূতির সুস্থধারার ছাত্ররাজনীতি, ঘটে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার ছাত্ররাজনীতি। এতে রক্তঝরার ধারা সূচিত হয়। অনেক ছাত্রছাত্রীর মূল্যবান প্রাণ হারিয়ে যায় দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। একসময় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সরকারি বা বিরোধীদল পরিচয়ে ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনগুলো থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। কেননা এখন যে-সংগঠনটি বিরোধীদলের পরিচয়ে আছে সেই পরবর্তী নির্বাচনের পর আবার সরকারি দলের পরিচয়ে আবির্ভূত হয়ে দলবাজি, চাঁদাবাজি, অর্থ আত্মসাৎ, ছাত্রছাত্রীদের ওপর খবরদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কোনো নজির সৃষ্টি করছে না। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গত ১৫/১৬ বছরে ছাত্ররাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রসংগঠনগুলোর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য

www.pathagar.com

লড়াই হয়েছে অজস্র, অনেকের প্রাণ তাতে গেছে, কিন্তু এইসব শিক্ষাঙ্গন থেকে ঐসব ছাত্রসংগঠনের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন মতামতকে সবচাইতে বেশি দমন করে তাদের আবাসিক সুবিধা হরণ করেছে, তাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। এখন কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েই সরকারি ছাত্রসংগঠনের অপছন্দের মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতে দেয় না, দেশ জাতির সুস্থ ধারার রাজনীতি ও শিক্ষা সাংস্কৃতিক চর্চা বলতে গেলে সেখানে নিষিদ্ধ। এমনকি শিক্ষাক্রমেও আধুনিক বা মুক্তচিন্তার সুযোগগুলো কোনো কোনো ছাত্রসংগঠনের পেশিশক্তির কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

দেশের বেশির ভাগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল হল এখন কাদের দখলে, সেখানে কিসের চর্চা হচ্ছে—আমরা এর খবর কতটুকু রাখি। তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে, ছাত্ররাজনীতি ১৯৯১ সাল থেকে সম্পূর্ণরূপে এর আসল গতি হারিয়ে ফেলেছে। ফলে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই ছাত্রসংগঠনগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাদের আস্থায় যাওয়ার মতো নীতি-আদর্শ, কর্মসূচি, পরিবেশ কোনো ছাত্রসংগঠনের মধ্যেই এখন আর নেই। নীতি এবং আদর্শের কথা যেসব ছাত্রসংগঠন বলে থাকে তাদের সাংগঠনিক ভিত্তি তত মজবুত নেই, সরকারি ছাত্রসংগঠন, পেশি ও অস্ত্রবাজি করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, তাই শিক্ষাঙ্গনে আদর্শবান, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত হওয়া ছাত্রসংগঠনের অবস্থান এখন নামসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। আসলে ছাত্রসংগঠনের মধ্যে যেভাবে পেশিশক্তির উত্থান ঘটেছে তার ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। ছাত্রনেতাদের জীবন থেকে লেখাপড়া নামক শব্দটি প্রায় উঠে গেছে। তাদের বেশিরভাগই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মিছিল, সভা-সমাবেশ এবং কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগের কাজে ব্যস্ত থাকে; নিয়োগ বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, টেন্ডারবাজি ইত্যাদিতে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে থাকে।

এ ধরনের চরিত্র নিয়ে দেশের ছাত্রসংগঠনগুলো দাঁড়াবে, পরিচিত হয়ে উঠবে তা একসময় অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু এখন বাস্তবতা এমনই। সে কারণেই ছাত্ররাজনীতি সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক, এমনকি দেশের সচেতন মানুষদের কাছ থেকে সমর্থন হারিয়ে ফেলেছে। সকলেই এর পরিবর্তন চায়, এর থেকে মুক্তিও অনেকে আশা করে। কারণ ছাত্ররাজনীতির নামে ছাত্রসংগঠনগুলো এখন যেসব কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত, তার সঙ্গে ছাত্ররাজনীতি, জাতীয় রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা, মেধার বিকাশের সামান্য সুযোগ বা সংযোগ আছে বলে মনে হয় না। বরং শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু লেখাপড়া ও সাংস্কৃতিক চর্চায় বাধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দখলকারী ছাত্রসংগঠনগুলো।

এমনটি হওয়া উচিত ছিল না, তারপরও হয়েছে, চলছে, এর অবসান হওয়া দরকার। দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোতে এখন আর আমাদের দেশের মতো প্রচলিত ধারার ছাত্রসংগঠনের অস্তিত্ব কেউ খুঁজে পাবে না। সেইসব দেশে ছাত্রসংগঠনের

www.pathagar.com

কার্যকারিতা লেখাপড়ার চর্চা, সুবিধা-অসুবিধার বাইরে যাওয়ার মতো অবস্থানে নেই। আমাদের প্রতিবেশী ভারতেও এখন ছাত্রসংগঠন এবং ছাত্ররাজনীতি এর বাইরে খুব একটা চিন্তা করতে পাচ্ছে না।

আসলে জাতীয় রাজনীতিতে সুস্থ ধারা তৈরি হলে ছাত্ররাজনীতি ও ছাত্রসংগঠন অনেকটা নিজস্ব বলয় নিয়ে তৈরি হতে বাধ্য। সে কারণেই আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে একটি সুস্থধারার জাতীয় রাজনীতি সৃষ্টি করা; যেখানে নীতি-আদর্শ, আইন-কানুন মেনে চলার চর্চা হবে, শিক্ষা থাকবে, বাধ্যবাকতা থাকবে। তা হলে শিক্ষাঙ্গনেও কেউ লেখাপড়ার বাইরে অবৈধ, বেআইনি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার সুযোগ পাবে না। একই সঙ্গে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন আনতেই হবে। লেখাপড়া না করে ছাত্রনেতার পরিচয়ে পরীক্ষায় পাস করা, সার্টিফিকেট অর্জন করার সুযোগগুলো চিরতরে বিদায় করতে হবে। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা, অধ্যয়ন করা, রীতিমতো লেখাপড়া করা, গবেষণা করার মতো জরুরি বিষয়গুলো জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখাপ্রশাখাতেই বাধ্যতামূলক থাকতে হবে— তবেই মেধাবী ছাত্র এবং নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে।

প্রচলিত ছাত্রসংগঠনের কার্যক্রমের মধ্য থেকে মেধাবী ছাত্র বা নেতৃত্বের বিকাশ ঘটার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং যারা মনে করেন যে, জাতির মেধাবী নেতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য ছাত্রসংগঠনের প্রয়োজন, তাদের কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে, প্রচলিত ছাত্রসংগঠন ও ছাত্ররাজনীতি থেকে নয় বরং জ্ঞানবিজ্ঞানের আধুনিক মানসম্মত চর্চা ছাড়া, লেখাপড়া ছাড়া, সেই মানে শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজানো ছাড়া মেধাবী নেতৃত্ব তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর জন্য ছাত্রসংগঠন ও ছাত্ররাজনীতির সংস্কারের আগে চাই জাতীয় রাজনীতিতে বড় ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও সংস্কার। তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাব্যবস্থাতেও আমূল পরিবর্তন আনার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। তবেই আমাদের দেশে উন্নত দেশের মতো শান্তিপূর্ণ শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মান প্রভৃতি বজায় থাকলে জাতির আগামী দিনের মেধাবী নেতৃত্ব তৈরি হবে।

সবাইকে ছাত্রনেতা হতে হবে, সংগঠন করতে হবে, এমন সেকেলে চিন্তা ত্যাগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের সকল ছাত্রছাত্রীই আমাদের ভবিষ্যৎ নেতা। তাদের মধ্যে সেই গুণ ও প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হলে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম, জাতীয় রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। তাহলে পুরাতন বিতর্কে আমরা আর আটকে থাকব না।

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ মে ২০০৭

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং ইউজিসি

সম্প্রতি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর নতুন চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম দেশে বর্তমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়ে যেসব অভিযোগ রয়েছে, যেসব সমস্যা বিরাজ করছে—তার কিছু কিছু জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকাও স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আলোচনা বেশ গঠনমূলক, তথ্য ও যুক্তিনির্ভর ছিল। আমার ধারণা যারা অনুষ্ঠানটি দেখেছেন তারা হয়তো বিদ্যমান সমস্যাগুলোর কিছু উত্তর তাতে খুঁজে পেয়েছেন। এর আগে তাঁর পূর্বসুরি অধ্যাপক আসাদুজ্জামানও দেশের উভয় ধারার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব অনিয়ম-দুর্নীতি ও সমস্যা বিরাজ করছে তা তার মেয়াদের শেষদিকে অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন।

দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৯-এ উন্নীত হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হতেই এর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, সম্প্রতি ইউজিসি ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অবৈধ ঘোষণা করেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও নানা অনিয়ম জেঁকে বসছে। সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষার মান, সুযোগসুবিধা, গবেষণার গুরুত্ব, এমনকি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদাও খুব একটা বাড়েনি। বরং কমেছে। অপরদিকে ইউজিসিও এসব ক্ষেত্রে তেমন কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে এমনি একটি জটিল পরিস্থিতিতে কার কী করণীয় তাই আমাদের কাছে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নয় বলে মনে হচ্ছে। এক্ষেত্রে কিছু আইনগত বাধা, সীমাবদ্ধতা এবং একই সঙ্গে যুগোপযোগী সংস্কারের উদ্যোগহীনতাও যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

একসময় দেশে ছিল শুধুমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, তাও মাত্র ৪/৫টি। গত শতাব্দীর আশি ও নব্বইয়ের দশকে দ্রুত এ সংখ্যা বেড়ে এখন ২৯-এ উন্নীত হয়েছে, একই সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও চালু হয়ে তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। এতগুলো পাবলিক এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে এগুলোকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার, দেখভাল করার, নিয়ন্ত্রণ করার বা এগুলোতে জবাবদিহিতার প্রচলনের বিষয়গুলো যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল তা মোটেও হয়নি। মঞ্জুরি কমিশন আগের অবস্থানে বা নিয়মেই চলেছে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন এবং সংখ্যা বেশ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে একধরনের অনিয়ন্ত্রিত ভাব, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খল অবস্থা সর্বত্র সৃষ্টি হয়েছে— যা নিয়ন্ত্রণ করতে না সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, না ইউজিসি, না স্ব-স্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হচ্ছে। ফলে চেইন অব কমান্ড বলতে যা বোঝায় তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অধিকন্তু দেশে নির্বাচিত সরকারগুলোর মধ্যে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তা প্রভাব ফেলেছে। কোনোকিছু ভালোভাবে যাচাই-বাছাই না করে, প্রস্তুতি গ্রহণ না করে, আইন ও বিধি চূড়ান্ত না করে, এখানে সেখানে ধুমধাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা, এগুলোতে অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা সৃষ্টির আগেই লোক নিয়োগদানসহ যা-খুশি-তাই করা হয়েছে। ইউজিসি নামক সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানটি অনেকটাই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে, সেখানেও দলীয় অনুগত কিছু ব্যক্তিকে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল যারা সময় অতিক্রম করা ছাড়া কার্যকর কোনো সুপারিশ সরকারের কাছে রেখেছেন বলে মনে হয় না। এভাবে দীর্ঘ সময় চলার ফলে দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংখ্যাগত 'বিপ্লব' ঘটলেও শিক্ষার মানে প্রচণ্ড ধস আমাদের একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে। এ ধরনের একটি উভয় সংকটের জাঁতাকলে পড়ে সম্প্রতি ইউজিসি ৫৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে, ১৯৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংস্কার নিয়ে কিছু কথাবার্তা চলছে, কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতির তদন্ত করছে।

দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পরিবেশ এবং পরিস্থিতিটা আমার কাছে বেশ নাজুক মনে হচ্ছে। খুব দ্রুত এবং জাদুকরি কোনো সমাধান আমি হয়তো আশা করি না। তবে কতগুলো ক্ষেত্রে আমাদের শক্তভাবে প্রস্তুতি নিয়ে হাত দিতেই হবে, সেই উদ্যোগ যথাসম্ভব এখনই নিতে হবে। এই লেখায় কয়েকটি করণীয় দিক নিয়ে আমার নিজস্ব কিছু মতামত উল্লেখ করছি।

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ভূমিকাকে আরো কার্যকর ও অর্থবহ করার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। এতদিন মঞ্জুরি কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রয়োজনীয় অর্থ জোগানের ক্ষেত্রে সরকারের সঙ্গে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করেছে মাত্র, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। মঞ্জুরি কমিশনের কার্যক্রম অনেকটা তাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমার মনে হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মঞ্জুরি কমিশনের

www.pathagar.com

কার্যক্রম, ক্ষমতা, দায়দায়িত্ব ইত্যাদিকে অনেকগুণ বৃদ্ধি করার সুযোগ রয়েছে। দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করা, মান পরিবীক্ষণ করা, কোনো ধরনের দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বেচ্ছাচারিতার ঘটনা ঘটলে তা সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের মাধ্যমে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। ইউজিসিকে সেই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। ইউজিসিকে সত্যিকার অর্থে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অভিভাবক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা দরকার। ইউজিসির কাছে সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একধরনের জবাবদিহিতা থাকার ব্যবস্থা থাকতে হবে। একই সঙ্গে ইউজিসিকেও সেই মানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। এখানে দলীয় ও অনুগত কর্মকর্তাদের নিয়োগদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাক্রম, পঠনপাঠন, শিক্ষক নিয়োগ-পদোন্নতি, তাদের সুযোগসুবিধার বিষয়গুলোকে সম্পূর্ণরূপে নতুনভাবে বিবেচনা করার কথা ভাবতে হবে। যেসব বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে বিভাগগুলোর কার্যক্রম ও পাঠক্রম মানসম্মত কিনা, যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেগুলো বিন্যস্ত করা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। অধিকাংশ বিভাগে যুগ যুগ ধরে এমন কিছু পত্র পড়ানো হচ্ছে যা এখন অচল বলে পরিগণিত। পাঠক্রম যেন ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করে, তাদেরকে যেন লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহী করে তোলে, তাদের জ্ঞানবোধ ও জীবনবোধ যেন তা দ্বারা গঠিত হয়, সেভাবেই শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজানোর কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। একই সঙ্গে দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যথার্থ মেধাবী শিক্ষক তৈরির কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনো মেধাবী, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব যথেষ্ট। এক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য এবং মোটামুটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমান শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন অবশ্যই আনতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ দলবাজি, আঞ্চলিকতা, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতাসহ সকল সভ্যতাভব্যতাকে হার মানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলোতে কী কী বিষয় পড়ানো উচিত, কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষক প্রয়োজন, কেমন মানের শিক্ষক প্রয়োজন—সেগুলোর কথা আমরা আদৌ গুরুত্ব দিই না। অমুককে শিক্ষক নিয়োগ দিতেই হবে, তিনি ওই বিষয়টি আদৌ পড়াতে পারবেন কিনা তা আদৌ দেখি না। এভাবে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হলেও বিভাগ এবং বিষয়ের প্রয়োজনীয়তাকে যুগ যুগ ধরে উপেক্ষা করার ফলে বেশির ভাগ বিভাগই এখন প্রাণহীন ও মেধাহীন হয়ে পড়ছে। সে কারণেই আমি মনে করি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রমের নিরিখে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, সেই নিয়োগগুলো হতে হবে স্বচ্ছ উপায়ে। সেক্ষেত্রে ইউজিসি এত বছর কোনো ভূমিকা পালন করেনি। প্রার্থীর ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, ধর্ম, বর্ণ বা

www.pathagar.com

অন্য কোনো পরিচয় তার নিয়োগে কোনোভাবেই যেন প্রভাব বিস্তার না করে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাজীবনে ৩/৪টি প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্তিই যথেষ্ট যোগ্যতা নয়; পাঠদানে তার দক্ষতা, গবেষণা, বিষয়ের ওপর তার জ্ঞানের দখল ও কর্তৃত্ব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে। দল, অঞ্চল ও আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা ভারী করার মতো পাপ আর কোনোমতেই চলতে দেওয়া উচিত নয়। এছাড়া বিষয়-বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানানো, অতিথি-শিক্ষক, প্রবীণ ও খণ্ডকালীন শিক্ষক—এই ধারণাগুলো বিষয়, বিভাগ এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন, গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে বিশেষভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। কোনো প্রবীণ ও খণ্ডকালীন শিক্ষক যদি যথার্থ অর্থেই অবদান রাখতে পারেন তাকে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে। তবে তা যেন যথার্থ হয়, ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনে যথার্থই কাজে লাগে। এক্ষেত্রেও কেউ যেন এই সুযোগের অসদ্ব্যবহার না করতে পারে সেই নিয়ম থাকতে হবে। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের যতবেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরে রাখা যায় তার ব্যবস্থা করা উচিত।

তৃতীয়ত, দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাটি বোধহয় এতদিনে বেশ তেতো হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় না হয়ে শেষপর্যন্ত এটি একটি স্নাতক-স্নাতকোত্তর পর্যায়ের বোর্ড অফিসে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের আমলানির্ভর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। দেশের দেড়-দুই হাজার ডিগ্রি কলেজ স্নাতক, অনার্স, মাস্টার্স ইত্যাদি শিক্ষাক্রম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় নামধারী এ প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে চলছে তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। আমরা ডিগ্রি অনার্স ও মাস্টার্সের মতো উচ্চশিক্ষা নিয়ে কতখানি তামাশা করতে পারি—তা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নামক প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষাক্রম দেখে বোঝা যায়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় ২ শত কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে পড়ছে দেশের লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী। অথচ ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না আছে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনকারী প্রয়োজনীয় শিক্ষক, না আছে ল্যাব, কম্পিউটার, লাইব্রেরি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগসুবিধা। গত ১৫ বছরে প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে চলছে, এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার ধারণাই আমাদের ভুলভাবে পরিচালিত হবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা এবং বাস্তবতাকে ঢেলে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

চতুর্থত, দেশের একমাত্র দূরশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এটি এখন পর্যন্ত খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এর মেরুদণ্ড অনেকটাই ভেঙে দিয়ে গেছেন বিতাড়িত উপাচার্য এম এরশাদুল বারী। এটিকে একটি যথার্থ

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়রূপে দাঁড় করানোর এখনো যথেষ্ট সুযোগ আছে। ইউজিসি এক্ষেত্রেও একটি বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে।

পঞ্চমত, জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় বলে ঘোষণা দেওয়া হলেও এর অনেক কিছুই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়মে চলছে না। এখনই যদি এটিকে ট্র্যাকে না আনা যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এটিও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি কিম্ভূতকিমাকারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

ষষ্ঠত, দেশের বেশির ভাগ আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন আঞ্চলিক দুষ্টশক্তি, রাজনৈতিক অপশক্তি বাসা বেঁধেছে, সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ঐসব অপশক্তির প্রবেশ ঘটতে শুরু করেছে। বস্তুত সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়েই কিছু কিছু অপশক্তির প্রভাব বিস্তার, ছাত্রাবাস দখলে রাখা, টেন্ডারবাজি করা, নিয়োগ বাণিজ্য করা ইত্যাদি শিক্ষাবিরোধী কর্মকাণ্ড বেশ দাপটের সঙ্গে চলছে। এগুলোকে শক্তহাতে দমন করার জন্য আমরা সরকারের কাছে ফরিয়াদ জানাতে পারি, কাজের কাজ কতটা হবে তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যদি যথাযথ লেখাপড়ার কার্যক্রম গতি পায়, সচল থাকে, ছাত্র-শিক্ষকরা যদি লেখাপড়া ও গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে বাধ্য হন, তাহলে অনেক সমস্যারই আপনাআপনি সমাধান আসবে বলে আমার ধারণা। ইউজিসি সে-ধরনের কোনো উদ্যোগ নেবে কি?

ভোরের কাগজ, ৬ জুন ২০০৭

www.pathagar.com

নতুন-পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গন্তব্য কোথায়?

গত কয়েক দিনে দেশে ৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন বেশ ঘটা করে করা হয়েছে। চট্টগ্রামে এশিয়ান উইমেন এবং সেনাবাহিনীর জন্য নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে ব্যতিক্রমধর্মী এতে কোনো সন্দেহ নেই। গতানুগতিক ধারায় যুক্ত হয়েছে সর্বশেষ রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়—যেটির উপাচার্যও সবেমাত্র নিয়োগ পেয়েছেন; কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এখনো নিয়োগ পাননি। ভাড়াবাড়িতে এ বছরই ছাত্র ভর্তি ও ক্লাস শুরুর কথা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আর কোনো নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর শুরু হতে যাচ্ছে কিনা জানি না। তবে দেশে এখন ৩০-এর অধিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শোনা যাচ্ছে। আমাদের চাহিদার তুলনায় সংখ্যাটি তেমন বেশি নয়, তবে দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে নজিরবিহীন ভয়ানক এক নৈরাজ্য চলছে। সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ১৯৫টি অনার্স কলেজ, ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮১টি সরকারি-বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ, নানা ধরনের বেসরকারি কলেজ ইনস্টিটিউট যার যার মতো করে চলছে। দেশের লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স, পাস, বিবিএ, চিকিৎসা, প্রকৌশল ইত্যাদি কোর্সে ভর্তি হচ্ছে, উচ্চশিক্ষার সনদ নিচ্ছে। বর্তমান নিবন্ধে উচ্চশিক্ষার এতসব বাস্তবতা, সমস্যা, ধারা, উপধারা, প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোকপাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়; মূলত দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গন্তব্য নিয়ে সামান্য আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

উচ্চশিক্ষা লাভে দেশের বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর ভর্তির প্রধান বিবেচনা হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে ঢাকা-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের পর দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অবস্থিত পুরাতন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, গত এক-দেড় দশকে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের নির্বাচনীর তালিকায় একেবারে শেষের দিকেই থাকে। এর বেশকিছু বাস্তবসম্মত কারণ আছে।

এদিকে মনে হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার তাগিদ আমাদের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে না। অধিকন্তু নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকে আমরা অধিকতর

www.pathagar.com

মনোযোগী হয়ে পড়েছি। বিদ্যমান পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রায় সবকটাই উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে গভীর সমস্যায় জর্জরিত, পরবর্তী সময়ে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলোর মেরুদণ্ড অনেক আগেই ভেঙে মাথা থুবড়ে পড়ে আছে, সদ্য প্রতিষ্ঠিতগুলো নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও বেশির ভাগই গুরুত্ববিহীন প্রতিষ্ঠানের নাম কুড়াতে যাচ্ছে। এ এক ভয়াবহ বাস্তবতা যা বাইরে থেকে বোঝা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা যারা ভেতরে আছি, উন্নত দুনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছি, মাঝে মধ্যে যাওয়া-আসার সুযোগ পাচ্ছি—আমরা স্পষ্টতই বুঝতে পাচ্ছি আমাদের উচ্চশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নামে আছে, বাস্তবে মোটেও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশে তামাশা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হচ্ছে কিন্ডারগার্ডেন আর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা যেন এদেশে এক মানের, এক স্তরের পর্যায়ের শিক্ষা!

আগের এক লেখায় উল্লেখ করেছিলাম, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, জ্ঞানী-গুণী একঝাঁক প্রখ্যাত শিক্ষক ঢাকায় এসেছিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথমদিন থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের পর্যায়ে থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছিল; এখানকার ছাত্রছাত্রীদের বুঝতে দেওয়া হয়নি, বা তাদের অনুভব করতে হয়নি যে তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামান্যতম পিছিয়ে পড়া একটা অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করেছে। রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায় প্রতিষ্ঠার পরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অনেকেই অধ্যাপনা করতে সেখানে গেছেন, তাদের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকদের গুরুত্ব, ভূমিকা ও অবদানের কোনো আবেদন ছিল কিনা জানি না, তবে তারা এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যাত্রাকালে হাল না ধরলে হয়তো এগুলো সেভাবে দাঁড়াতে পারত না। একসময় এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মর্যাদা ঢাকার সমপর্যায়ে না হলেও একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো ছিল না। এখন মনে হচ্ছে মধ্যখানে কখন কোথায় কী যেন কী ঘটে গেছে; ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগরসহ সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই খেই হারিয়ে ফেলেছে। ততদিনে আরও কটা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে প্রতিষ্ঠা করা হল, দেশে এসেছে বাহারি নামের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এখন যত্রতত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের নামফলক শোভা পাচ্ছে।

খুব খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু কী দেখে খুশি হব? বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেখে, নাকি নিজে একটা চাকরি পেয়েছি বলে? শুধু একটি নাম বা চাকরির জায়গা নয়, এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ যেখানে মানুষ সর্বোচ্চ জ্ঞানচর্চা, জ্ঞানোৎপাদন ও পুনরুৎপাদনে মগ্ন থাকার কথা। না, এর কোনোটিই এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

নেই। তাহলে কী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তা কি খুব বলে দিতে হবে? কেজি স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা আর উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজের মান, ধ্যান, জ্ঞান ও ধারণা নিয়ে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরিচালনা ও লেখাপড়ার কথা ভাবলে বোধহয় এমনটিই হবে—এর চাইতে ভালো কিছু হওয়া আদৌ সম্ভব হবে না এটি অনেকটাই নিশ্চিত।

একটি কথা দেশের নীতিনির্ধারক মহলকে উদ্দেশ্য করেই বলতে চাই, তা হচ্ছে : রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয় ভবন তৈরি করা সম্ভব হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ বলে বিবেচিত, পরিচিত ছাত্র-শিক্ষক তৈরি করা মোটেও সম্ভব নয়। হ্যাঁ, উচ্চমাধ্যমিক পাস কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা যেতে পারে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মানে তাদের তৈরি করা, ধরে রাখা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। সেজন্য প্রধানত যথেষ্ট যোগ্য শিক্ষক, দ্বিতীয়ত আধুনিক বিশ্বমানের শিক্ষাক্রম অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষক এবং বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে যাত্রা শুরু করার কারণে। কিন্তু এখন বাংলাদেশে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রম শুরু করেছে তাতে প্রকৃত শিক্ষক কোথায়, শিক্ষাক্রমই বা কোথায়? এখন দেখছি দেশের বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়েছে, তাসের ঘরের মতো তছনছ করে ভেঙে পড়ছে, সন্ত্রাসী ও মৌলবাদীদের দখলে এক একটি চলে যাচ্ছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এগুলোতে বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেই বললেই চলে, শিক্ষাক্রমও নেই, সবকিছু নামে আছে, সারবত্তায় নেই।

এমনিতেই গোটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে দক্ষ, মেধাবী, সৎ ও যোগ্য শিক্ষকের দারুণ অভাব রয়েছে। তেমন শিক্ষক তৈরি হওয়ার উপাদান শিক্ষাব্যবস্থায় নেই; সুযোগ, পরিবেশ, নিয়মনীতি ও বিবেচনা কোথাও ক্রিয়াশীল নেই। সর্বত্র দুর্নীতি, অনিয়ম, তদবির, স্বজনপ্রীতি, এলাকাপ্রীতি, সম্প্রদায়প্রীতি ইত্যাদি প্রাধান্য পাচ্ছে। ফলে শিক্ষকতা পেশায় নীতি-নৈতিকতাসম্পন্ন মেধাবী, সৎ ও যোগ্য মানুষদের আগমন নিশ্চিত হতে পারছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও এতসব গুণ ও বিষয়ের সমন্বয়ে ছাত্র-শিক্ষক খুব একটা তৈরি করছে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ধরনের অসৎ, অগ্রহণযোগ্য প্রবণতা প্রভাব বিস্তার করবে বলে সাধারণত আশা করা হয় না। কিন্তু যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কোর্স-কারিকুলাম ত্রুটিপূর্ণ, বিজ্ঞানচিন্তায় ব্যাপক ঘাটতি, দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরপুর, জীবন-জগৎ, প্রকৃতি, মানুষ ও মানুষের চিন্তন, কর্ম-সৃজনশীলতা নিয়ে জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণা তৈরিতে উপযোগী নয়—সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানুষের প্রকৃত মেধা ও গুণাবলির উন্মেষ বা বিকাশ সাধনে যথেষ্ট সহায়ক হবে, তেমনটি আশা করার কোনো কারণ নেই। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এভাবেই উচ্চতর

www.pathagar.com

শিক্ষাক্রমের প্রত্যাশিত মান ও ধারা থেকে সরে এসেছে, হয়ে পড়েছে কতগুলো সার্টিফিকেট বিতরণের কেন্দ্রে।

পুরাতন বিশ্ববিদ্যায়গুলোতে শিক্ষকস্বল্পতা আছে—তেমনটি বলা যাবে না, তবে বিশ্বমান বা একবিংশ শতাব্দীর মানে শিক্ষক খুব একটা নেই। তেমন মানসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে না-ওঠার প্রধান কারণ হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন লেখাপড়া ও গবেষণার অনুকূল পরিবেশের দারুণ অভাব। অধিকন্তু এটি আধুনিক বিজ্ঞানচর্চাবিমুখ ও বৈরী হয়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীদের সেভাবে নিরন্তর লেখাপড়ায় ব্যস্ত রাখার কোনো শিক্ষাক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই, নেই গবেষণার বিধান এবং বাধ্যবাধকতা। ফলে যেনতেন উপায়ে এমএ ডিগ্রি নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা বের হচ্ছে—যারা আলোকিত মানুষরূপে গড়ে ওঠার শিক্ষাই খুব একটা পায় না। শিক্ষাক্রমের মারাত্মক ত্রুটি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মানহীন, প্রগতিবিরোধী কেন্দ্রে পরিণত করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে ৩০/৪০ বছর আগের নিয়মনীতি এখনও বহাল আছে। অথচ গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরে দুনিয়া অনেকভাবে বদলে গেছে, বলা চলে উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমাদের এখানে শিক্ষার মান বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একদিকে যেমন কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে প্রথমশ্রেণী প্রাপ্তির নিয়মনীতি সহজকরণ করা হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ, পদোন্নতিসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডে এখন মূল্যবোধের দারুণ ধস পরিলক্ষিত হচ্ছে, অধঃপতন ঘটেছে। ছাত্রছাত্রীদের মেধার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটানোর চাইতে অনেক শিক্ষকই ব্যক্তিগত পছন্দ, স্বার্থ, রাজনৈতিক পছন্দ-অপছন্দে ছাত্রছাত্রীদের প্রথমশ্রেণী প্রদান, তাদের শিক্ষক পদে নিয়োগদানে যেভাবে ভূমিকা রেখেছেন বা রাখছেন তা রীতিমতো লজ্জাজনক ও কলঙ্কজনক বিষয়। বলতে দ্বিধা নেই এইসব শিক্ষকই বিশ্ববিদ্যালয়-চত্বরে 'প্রভাবশালী' শিক্ষক বা শিক্ষক-নেতা হিসেবে অনেকের কাছে পরিচিত। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা মেধাবী, আদর্শবান শিক্ষক তাদের সংখ্যা এতটাই হ্রাস পেয়েছে যে আর কয়েক বছর পর হয়তো তেমন কাউকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

এ মুহূর্তে বাংলাদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রের শিক্ষক পদে নিয়োগ পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই শূন্যের কোটায়। কেননা, গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যারা জড়িত থাকেন তাদের বেশিরভাগই তথাকথিত 'প্রভাবশালী শিক্ষক' বলে পরিচিত। উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যগণ তো চরমভাবে দলীয় অনুগত ব্যক্তি। তাঁদের হাত দিয়ে ভিন্নমতাবলম্বী, প্রখর মেধাবী, উচ্চতর ডিগ্রি-গবেষণাসমৃদ্ধ প্রার্থী নিয়োগ পাবেন—এটি আশা না-করাই শ্রেয়। জোট সরকারের শাসনামলে কাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেই তালিকা ও তাদের জীবনবৃত্তান্ত যদি প্রকাশ করা হয় এবং যেসব প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, যারা ঐসব নিয়োগ বোর্ডের সদস্য

www.pathagar.com

হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন তাদের নাম, গবেষণাকর্ম ইত্যাদি যদি প্রকাশিত হয়—তাহলে আমি নিশ্চিত আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ব।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান ও মর্যাদা হারানোর পেছনে বিগত বছরগুলোতে নির্লজ্জ দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি, মেধাবীদের বঞ্চিতকরণ, জামাতীকরণ চূড়ান্তভাবে কাজ করেছে। এ মুহূর্তে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে সবচাইতে বেশি সফল ও লাভবান হয়েছে জামাতপন্থী শিক্ষকগণ—যারা ছাত্রছাত্রীদের প্রথমশ্রেণী প্রদান, মেধাবীদের বাদ দেওয়া, বিভিন্ন নিয়োগ কমিটি, দলীয় মেকানিজমকে ব্যবহার করা, ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে হোমওয়ার্ক করে অগ্রসর হয়ে থাকে। ফলে এ মুহূর্তে অন্য সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থন ও কর্মী হিসেবে পরিচিত যত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে রয়েছেন তার চাইতে ঢের বেশি আছেন এককভাবে জামাতে ইসলামীর। গত সাত বছরে শিক্ষক পদে যেসব নিয়োগ হয়েছে তাতে একচেটিয়া সুবিধা নিয়েছে ছাত্রশিবিরের কর্মী ও নেতাগণ, যাদের লেখাপড়ার মান মোটেও অন্য প্রার্থীদের চাইতে ভালো নয়। কিন্তু গত সাত বছরে যেসব উপাচার্য উপ-উপাচার্য শিক্ষক নিয়োগ বোর্ডে সভাপতিত্ব করছেন তারা কেউই শিবিরের নেতা-কর্মীকে বাদ দিয়ে প্রকৃত মেধাবীদের শিক্ষক নিয়োগদানে ভূমিকা রেখেছেন এমন কোনো নজির খুঁজে পাইনি।

প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের অনেক অহংকার ছিল। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যারা নিয়োগ পেয়েছেন—খবর নিয়ে দেখুন তাদের মধ্যে কতজন ছাত্রশিবিরের ক্যাডার বা কর্মী হিসেবে উঠে এসেছেন? আমি নিশ্চিত করেই বলে দিতে পারি বেশ কয়েকজন শিবিরের ক্যাডার শিক্ষকপদে নিয়োগ পেয়েছেন—যাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে জামাতের মেকানিজম চমৎকারভাবে কাজ করেছে। দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ই এখন রাজনৈতিকভাবে জামাত-শিবিরের নিয়ন্ত্রণে অবস্থান করছে। আগে জামাত ছাত্রশিবিরকে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দখল করেছে, এখন সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী পদগুলো সহজে পেয়ে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাদের অনেকটা নিয়ন্ত্রণে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে জামাত-শিবির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে সেখানে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা অনেক আগেই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম অনেকটাই তাদের নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার চাইতে জামাতের নির্দেশিত 'ইসলামি বিপ্লব' সম্পন্ন করার ক্যাডার তৈরি, কোর্স করিকুলাম সেভাবে পরিবর্তন, নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সেভাবেই প্রকৃত মেধাবী জ্ঞানী-গুণী মানুষদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সে-ধরনের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে শুধু জামাতপন্থী নন, বিএনপিপন্থী, সুবিধাবাদী, আদর্শহীন, এমনকি কোনো কোনো 'প্রগতিপন্থী' শিক্ষক, শিক্ষক-নেতাও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছেন। এমন একটি স্থানে দেশের সবকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় চলে গেছে, তেমন মহাসড়কে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেক আগেই উঠে এসেছে, নির্বিকারে ও সরবে চলছে। সুতরাং বাংলাদেশের শুধু উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎই নয়, রাজনীতির ভবিষ্যৎও কোন্ পথে হাঁটছে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

অতএব, নিয়ম-নীতিমালায় যদি মেধাকে নিশ্চিত করা না যায়, দলবাজকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া না যায়, তাহলে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দেশ ও জাতিকে পেছনের দিকেই টেনে নেবে—যা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপরিপন্থী বলেই জানি।

ভোরের কাগজ, ২৯ অক্টোবর ২০০৯

www.pathagar.com

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ এবং বাউবি

এতদিন বছরের শুরুতে স্কুলে ছাত্রভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা ও যুদ্ধ করার দৃশ্য সকলে দেখে এসেছেন। শিশুদের স্কুলে ভর্তিযুদ্ধ এখন মহাযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে। এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি, আলোচনা-সমালোচনা দেশে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস এলে শুরু হয়, আবার ক্লাস শুরু হওয়ার পর ভর্তিযুদ্ধের পর্ব বিষয়ক সমস্যা চাপা পড়ে যায়, ডিসেম্বর -জানুয়ারি মাসে পুনরায় তা চাড়া দিয়ে উঠে। এভাবেই চলেছে—সমস্যার মৌলিক কোনো সমাধানের উপায় খোঁজা হচ্ছে না।

শিশুদের স্কুলে ভর্তি নিয়ে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ কিন্তু বিদ্যালয়ের সংখ্যাস্বল্পতা নয়, বরং আমার বিবেচনায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কাছাকাছি মানে গড়ে না-তোলা। দেশের শহরগুলোতে অপরিকল্পিতভাবে নানা ধারা, মান, পরিবেশ, কারিকুলাম ও খরচাপাতির বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও বিদ্যালয় বলতে যা বোঝায় তার ধারেকাছেও এগুলোর বেশির ভাগ পৌঁছায়নি। তেমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এগুলোর প্রতিষ্ঠাতাদের আছে বলে মনে হয় না। ফলে অভিভাবকদের বেশির ভাগকেই ছুটতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত নামীদামি স্কুলের দিকে। ফলে এসব বিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে সবাইকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হচ্ছেই, নানা ধরনের বাণিজ্য, অনিয়ম, কোচিং, লেনদেন চলার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোও আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দাবি করতে পারছে না। সবচাইতে বড় কথা, ৪/৫ বছরের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে এভাবে পরীক্ষা দিতে হবে তা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। অথচ বাড়ির কাছের স্কুলটি যদি নির্ভর করার মতো মানসম্পন্ন হত তাহলে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তায় পড়তে হত না, এভাবে শিশুদের নিয়ে ছুটাছুটি করতে হত না, অতিরিক্ত অর্থ খরচও করতে হত না। আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নীতিনির্ধারক মহল দেশে এক্ষেত্রেও কোনো সুষ্ঠু নীতি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারেনি, ফলে শহরগুলোর বেশিরভাগ শিশুর শিক্ষাজীবনের শুরু হচ্ছে ভর্তিযুদ্ধ দিয়ে—যা শেষপর্যন্ত অব্যাহত থাকছে।

হালে ভর্তিযুদ্ধ একই কারণে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য ও উচ্চ স্তরের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ছে। মাধ্যমিক স্কুল, উচ্চমাধ্যমিক কলেজ স্তর—কোথাও ভর্তি নিয়ে

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদের মহাসংকটে পড়তে হচ্ছে না। অথচ ঢাকা শহরে স্কুল বা কলেজের অভাব আছে তা কিন্তু বলা যাবে না। এখানেও সমস্যা একই। যেগুলো আছে তা শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন করতে পারছে না, সে কারণে এসব পর্যায়েও ভর্তি নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি। দিন দিন সর্বত্র ছাত্রভর্তি নিয়ে সংকট প্রকট হচ্ছে। সমস্যা ও সংকটগুলো দূরীভূত হচ্ছে না বলে তীব্র যানজটের মতো ভর্তিসংকট প্রকটতর হচ্ছে। এর ফলে দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে স্কুল ও কলেজশিক্ষাও।

ছাত্রভর্তির সংকট এখন গভীর হয়ে উঠেছে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রেও। ভর্তিচ্ছু ছাত্রীছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও বাড়ছে। তারপরও ভর্তির সমস্যা কিন্তু কমছে না। ছাত্রছাত্রীরা উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলেজ বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও ঝুঁকছে না নানা সঙ্গত কারণেই। তাদের এবং অভিভাবকদের বিবেচনা এখন ঘুরেফিরে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, বুয়েট, কৃষি এবং সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর দিকেই থেকে যাচ্ছে। সেশনজট, মারামারি, গণ্ডগোলের মতো অপ্রত্যাশিত বিষয়গুলোর উপস্থিতি শিক্ষাঙ্গনে থাকার পরও তেমন কেউই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না বরং এদিকেই প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ছে। বিষয়গুলো নিয়ে নীতিনির্ধারক মহলকে গভীরভাবে ভাবতে হবে, চিন্তাভাবনা করতে হবে এবং কার্যকর উদ্যোগও নিতে হবে।

একটু বলে নিই—আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা নামের মধ্যেই মস্তবড় গলদ রয়েছে। সনাতন স্নাতক তথা বিএ/ বিএসসি/ বিকম (পাস) শিক্ষার তেমন কোনো গ্রহণযোগ্যতা এখন আর নেই, অথচ দেশে ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা হচ্ছে ১ হাজার ৩৯২টি (সরকারি ২০৮, বেসরকারি ১ হাজার ১৮৪টি)। এগুলোতে যত খুশি তত ছাত্রই ভর্তি হতে পারছে, এগুলোতে আসনসংখ্যা ৭ লাখের ওপর। কথা হচ্ছে : ৭ লাখ ছাত্রছাত্রী পাসকোর্সে ভর্তি হলে কী লাভ? তাদের চাকরি কোথায়? তারপরও এগুলোতে ভর্তি হচ্ছে দুই থেকে আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী। বাকি আসনগুলো খালি থাকছে। বাকি শিক্ষার্থীরা যাচ্ছে কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে, যেহেতু এখন স্নাতক অনার্স ডিগ্রি ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের চাকরির কপাল মহামন্দায় পড়ে, তাই এসএসসি-এইচএসসি মিলিয়ে মোট জিপিএ ৭ থেকে ৭.৫ নম্বর প্রাপ্ত প্রায় সকল ছাত্রছাত্রীই অনার্স বা সমমানের কের্সে ভর্তি হতে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। সেক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতে পাবলিক পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভর্তির জন্য তাদের কাছে বেশি বিবেচিত হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে হাতেগোনা ৪/৫টি অবস্থাপন্ন পরিবারের অভিভাবক-ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করতে পারলেও বাকিগুলো তা পারেনি। অন্যদিকে ১৯৫টি অনার্স কলেজও পারেনি ছাত্রছাত্রীদের সেভাবে আকৃষ্ট করতে।

www.pathagar.com

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে না-পারার পরই কেবল ছাত্রছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনার্স ও সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হওয়ার চিন্তাভাবনা করে থাকে। বিষয়গুলো সেভাবেই দেশে চলে আসছে। একসময় প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে স্বপ্ন দেখালেও সেই মোহ বা স্বপ্নভঙ্গের অনেক ঘটনাই দেশে ঘটে গেছে। ফলে আবার ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকগণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

দেশের পুরাতন-নতুন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কেই আমি হয়তো উচ্চশিক্ষার জন্য আইডিয়াল বলব না, কিন্তু প্রত্যাশিত বা কাঙ্ক্ষিত মানের উচ্চশিক্ষা দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বাইরে বেসরকারি পর্যায়ে, কিংবা কলেজ পর্যায়ে খুব একটা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। বেসরকারি যে কটি বিশ্ববিদ্যালয়কে মানসম্পন্ন বলে ধরা হচ্ছে তা এখনো প্রতিষ্ঠিত নয়, তবে কিছুটা আলোচিত বিষয় মাত্র। কিন্তু সেগুলো প্রকৃত মেধাবী এবং মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে অবস্থান করছে। সুতরাং বিত্তবান, মাঝারি ও বিত্তহীন সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীই এখনো পর্যন্ত উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি মেডিকেল, প্রকৌশল ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই ভিড় করছে। তাতে ভর্তির ক্ষেত্রে চরম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে। এবছর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাত লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২ থেকে ৩ লাখ শিক্ষার্থী ২৭/২৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেই। অথচ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ১৯৫টি কলেজ ছাড়া বাকি সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে হয়তো সর্বোচ্চ হাজার বিশেক ছাত্রছাত্রী। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দেবে, অথচ সেখানে এখনো শিক্ষক, ক্লাসরুম নেই। ৪/৫ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও শিক্ষক, শ্রেণীকক্ষ, ল্যাব, লাইব্রেরির নানা অভাবের পরও ছাত্রছাত্রীদের ভিড় ঠেকানো যাচ্ছে না। বেশির ভাগ নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব। অতি শিগগির এ সমস্যার নিরসন হবেও না। কলেজ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দক্ষ, অভিজ্ঞ, মেধাবী শিক্ষকের অভাবের চাইতে আরো প্রকট, অনার্স কোর্স সেসব প্রতিষ্ঠানে নামমাত্র চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়টি এখন ছাত্রছাত্রীদের জানা হয়ে গেছে। তাই তারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়, এরপর সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই ছুটে যাচ্ছে। ফলে চাপ পড়েছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর। সরকার ইউজিসি বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি, ডাবল শিফট চালুর মাধ্যমে আরো বেশিসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দিতে আগ্রহী। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন বা শিফট বাড়ানোর ক্ষেত্রে নানা

www.pathagar.com

ধরনের সমস্যা রয়েছে। শিক্ষক, আবাসন, শ্রেণীকক্ষ, ল্যাব, লাইব্রেরিতে রাতারাতি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কাঙ্ক্ষিত সমাধান দ্রুত হবে এমন নিশ্চয়তা বা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা আরো জটিল। এগুলোর বেশি ভাগই শিক্ষকসমস্যায় পড়েছে। দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকসংখ্যা রাতারাতি বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ দিলেই চলবে না; গবেষণা, লাইব্রেরি সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি না করা হলে তরুণ শিক্ষকগণ বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষক হয়ে উঠতে পারবেন না, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে না; মানসম্পন্ন পাঠদান, নিয়মনীতি, আইনকানুনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারবে না। এই সমস্যাগুলো নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। জানি না, ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে তারা কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেবে। এ বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দেড়শোটি আসনের বিপরীতে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করেছে। অদূর ভবিষ্যতে আরো বেশি হয়ে যেতে পারে। এই চাহিদা পূরণের উপায় কী?

আমার ব্যক্তিগত প্রস্তাব হচ্ছে, সরকারকে অবিলম্বে উচ্চশিক্ষার চাহিদা দেশীয় এবং বিশ্ববাজারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরি করার পরিকল্পনা এখনই নিতে হবে। উচ্চশিক্ষার চাহিদা ও বাস্তবতার মধ্যে সমন্বয় আনা জরুরি। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে আরো কীভাবে কার্যকর করা যায়; যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যায় পিছিয়ে আছে, নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে আছে সেগুলো যাতে দ্রুত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, সেগুলো যাতে দ্রুত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং শিক্ষাক্রম নিয়ে দাঁড়াতে পারে তা নিশ্চিত করা। আমরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসিকে জানিয়েছি যে, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, লোকবল, অবকাঠামোগত অবস্থান থেকে অনেক সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো অবস্থানে আছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সরকার ও ইউজিসি চাইলে এখনই ১৭/১৮টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার মতো উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

আমি মনে করি না, ক্যাম্পাসভিত্তিক অনার্স, এমএ কোর্স চালু হলে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। না, তেমনটি হওয়ার কারণ নেই। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষাক্রমের অন্যতম প্রধান কাজ পাঠসামগ্রী প্রণয়ন যা ইতিমধ্যে শিক্ষকগণ সম্পন্ন করেছেন; সংশোধন, সংযোজন করেই চলছেন, সেই প্রক্রিয়া নিরন্তর চলবেই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ শুধু বই লেখা ও পরিমার্জনের মধ্যেই

www.pathagar.com

পড়ে থাকবেন তা বোধহয় সঙ্গত নয়। শিক্ষকদেরকে পাঠদানে সম্পৃক্ত করতেই হবে, নতুবা তাদের স্বকীয়তা ও বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। সে-কারণে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ১৬ বছরে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশব্যাপী দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ২৩টি প্রোগ্রাম দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, এগুলো স্বাভাবিক গতি ও নিয়মে চলবে। এতে মারাত্মক কোনো বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা নেই। এখন শিক্ষকগণ ক্যাম্পাসভিত্তিক পাঠদানেও অবদান রাখতে পারবেন।

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের সমস্যা, সম্ভাবনা মিলিয়ে সবকিছু দেখে এবং বুঝে আমরা সরকার ও ইউজিসিকে আশ্বস্ত করতে পারি যে, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়া গেলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণের পাশাপাশি ক্যাম্পাসভিত্তিক অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সেও প্রতি বছর এক-দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে। এর জন্য সরকারের খুব বেশি বাড়তি অর্থ খরচের প্রয়োজন পড়বে না। বিষয়টি প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা, ইউজিসি এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন। আমরা বাউবির শতাধিক শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

ভোরের কাগজ, নভেম্বর ২০০৮

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষার সংকট নিরসন হওয়া জরুরি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যতসংখ্যক ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে তাদের মধ্যে খুবই কমসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে; বাকিদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ অনেকটাই এলোমেলো হয়ে যায়, বন্ধও হয়ে যায়। এতে দেশে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি, মেধার বিকাশ, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ইত্যাদি দারুণভাবে হোঁচট খাচ্ছে, রুদ্ধ হয়ে পড়ছে; সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে অদক্ষ, অযোগ্য, বেকার ও নিম্ন-মাঝারি শিক্ষিত মানুষের ভয়ানক নানা সমস্যার চাপ যা ১৫ কোটি মানুষের এই দেশ সামাল দিতে পারছে না। প্রতিযোগিতার এই বিশ্বে উচ্চশিক্ষা ব্যতীত বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যাসহ নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত দেশের টিকে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। অথচ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষার পথ দিন দিন নানা ধরনের সংকটে জড়িয়ে পড়েছে। এটি সংখ্যা বা পরিমাণগত কোনোদিক থেকেই প্রত্যাশার ধারে-কাছে অবস্থান করছে না। এক্ষেত্রে বিরাজমান সংকটের কয়েকটি দিক সংক্ষেপে তুলে ধরছি; একই সঙ্গে উত্তরণের কয়েকটি আশু ব্যবস্থার প্রস্তাব করছি।

প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয় তথা উচ্চশিক্ষার সংখ্যাগত চিত্রটি সংক্ষেপে তুলে ধরছি। দেশে এ মুহূর্তে নতুন তথা সদ্যপ্রতিষ্ঠিতসহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সম্ভবত ৩১টি, এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ১৯৫টি অনার্স কলেজ থাকলেও যোগ্য, উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণায় রত শিক্ষকের অভাবসহ নানাবিধ কারণে অনার্স পড়তে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের সর্বশেষ আশ্রয় হিসেবে এগুলো বিবেচিত হচ্ছে। যে ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন লাভ করেছে তার মধ্যে মাত্র ৩/৫টি এ পর্যন্ত মানের অভিযোগ থেকে মুক্ত আছে, বাকিগুলোতে সনদপত্র লাভের বিষয়টিই মুখ্য বলে অভিযোগ আছে। তাছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করার সঙ্গতি বেশিরভাগ অভিভাবকেরই নেই। চিকিৎসা ও প্রকৌশল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও তেমন বেশি নয়। সেখানেও বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যয়ভার নির্বাহ করার ক্ষমতা অনেকেরই নেই। সে-কারণে ছাত্রছাত্রীদের বেশির ভাগই ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, বুয়েট, কৃষিসহ হাতে-গোনা পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে

www.pathagar.com

ভর্তি হতে ভিড় জমাচ্ছে। মূল চাপটি এগুলোর ওপরই যখন সৃষ্টি হয় তখন সত্যি সত্যিই ভর্তিযুদ্ধের এক ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়। অথচ পুরাতন এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন আছে সর্বসাকুল্যে দশ-বারো হাজার মাত্র।

লক্ষ্য করুন, এ বছর এইচএসসি পাস করেছে ৭ লাখ ২৬ হাজার ৫৬৩ জন; এদের মধ্যে প্রায় ২৫ হাজার ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছেন, জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে আছে ৫০ হাজারের অধিক। ৭ লক্ষাধিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অন্তত এক লাখের অধিক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সকল শর্ত অতিক্রম করার বাস্তবতা থাকার কথা। কিন্তু ভর্তির ক্ষেত্রে এর ধারেকাছে যাওয়ার কল্পনাই আমরা করতে পারছি না। তাছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা দুর্নীতিমুক্ত করা সম্ভব হলেও ছাত্রছাত্রীদের আরব্ধ বিষয়প্রাপ্তি অনেকটাই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে আছে, ফলে উচ্চশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এ ধরনের 'উচ্চশিক্ষা' যেহেতু ব্যয়বহুল (তা সরকারি অর্থায়ন বা ব্যক্তিগত অর্থ খরচের মাধ্যমেই হোক), তাই এটিকে পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত করা অতীব প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের চাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দেশে অনেক কম। সরকারি-বেসরকারি কলেজ, বেসরকারি এবং পাবলিক (নতুন) বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মানহীন হওয়ার কারণে ঘুরেফিরে অল্প কয়েকটি পুরাতন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর যে চাপ পড়েছে তা কোনোভাবেই সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। যেভাবে সামাল দেওয়া হচ্ছে তাতে প্রত্যাশিত ফল দেশ ও জাতি পাচ্ছে না। একই সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, গত ১৫-২০ বছরে যে ক'টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেগুলোতে শিক্ষক, ল্যাব, গবেষণা, অবকাঠামোর সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। অধিকাংশ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়েই অভিজ্ঞ শিক্ষক নেই, এমনকি যেনতেন উপায়ে ক্লাস চালিয়ে নেওয়ার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকও নেই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান চলছে নামমাত্র, কলেজগুলোতে অনার্স কোর্স মানসম্মত পাঠদান মারাত্মক সংকটের মধ্যদিয়ে চলছে।

আমাদের দেশে যে ক'টি পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সংখ্যার দিক বিবেচনা করলে একেবারে কম নয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সমৃদ্ধ করার কর্ম-পরিকল্পনা এবং তা বাস্তবায়ন মোটেও সন্তোষজনক নয়। ফলে প্রতিটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ই রুগ্‌ণ ও জরাজীর্ণ অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে নির্লজ্জভাবে দলীয় আনুগত্য, আঞ্চলিকতা, দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতাকে সর্বোচ্চ বিবেচনা ও প্রাধান্য দেওয়ায় দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ

www.pathagar.com

শিক্ষক সংকটে পড়েছে। বিভাগ ও শিক্ষাক্রম নিয়েও গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা চালু থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারেস্ট ও প্রস্তুতি যেমনি চরমভাবে উপেক্ষিত; কোর্স কারিকুলামও অনেকটা একইভাবে বাস্তবতা, যুগ ও প্রয়োগ বিবর্জিত অবস্থায় চলছে। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ বিভাগের শিক্ষাকার্যক্রম থেকে দক্ষ, অভিজ্ঞ, মেধাবী, মননশীল, সৃজনশীল, উচ্চতর মূল্যবোধ, নীতিনৈতিকতার জ্ঞানসমৃদ্ধ জনগোষ্ঠী তেমন নজির সৃষ্টি হচ্ছে না।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জ্ঞানের অন্বেষা, অনুসন্ধিৎসু মনোভাব সৃষ্টি, গবেষণামুখী করাসহ উচ্চতর শিক্ষার পরিবেশ পাবলিক ও বেসরকারি কোনো ধারার বিশ্ববিদ্যালয়েই গড়ে তোলা যাচ্ছে না। উচ্চতর শিক্ষার পরিধিটাই এখানে ছাত্রছাত্রীদের কাছে অজানা, অস্পষ্ট, অনুন্মোচিত ও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। এর জন্যে ছাত্রছাত্রীরা কোনেভাবেই দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন— যাদের অনেকেই উন্নত দুনিয়ার শিক্ষাক্রমের সঙ্গে পরিচিত, অথচ নিজ দেশের যুগযুগ ধরে চলে আসা পুরাতন, অনুপযোগী শিক্ষাক্রম দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চালিয়ে নিচ্ছেন তারা। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মানে শুধু স্নাতক বা স্নাতকোত্তর এক-একটি সনদও লাভ করা নয়, জ্ঞানচর্চা ও উচ্চতর দক্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করাই এর উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে তেমন চিন্তাভাবনা, জ্ঞানচর্চা ও পরিকল্পনার অভাব দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। এর ফলে উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে দলবাজি, আঞ্চলিকতা, সুবিধাবাদসহ নানা ধরনের অপশক্তির একচ্ছত্র প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। হাল আমলে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তি ও দুর্নীতি অপ্রতিহত গতিতে সম্প্রসারণ ঘটিয়ে উচ্চশিক্ষাকে ভাবমূর্তির নানা সংকটে ফেলে দিয়েছে। অথচ উচ্চশিক্ষার সঙ্গে এসবের কোনোটিরই সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

উচ্চশিক্ষার ধারণা প্রগাঢ় ও যথাযথ মানে প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হলে উপরে উল্লিখিত খারাপ প্রবণতা ও প্রবৃত্তিগুলো, বা দেশে এখন উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে যেসব অপরাধ বিরাজ করছে যার কারণে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। আমাদের সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রীরা তা কালক্রমে দূরীভূত হতে বাধ্য। এমনিতে মেঘে মেঘে অনেক বেলা গেছে, সমস্যাও আমাদের মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। দেশের পত্রপত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় দেশের ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে অনেককিছু লেখা হচ্ছে বলা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব উদ্যোগ তেমন বেশিকিছু নেয়া যাচ্ছে না। সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে আসন বৃদ্ধি, ডাবল শিফ্‌ট চালু ইত্যাদি আবেদন করেও খুব একটা লাভ হয়নি। অত্যন্ত তাড়াহুড়া করে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় চালু ও ছাত্রভর্তির সিদ্ধান্ত নেয়া দেশে

www.pathagar.com

ছাত্রভর্তির সংকট নিরসনে সরকারের একধরনের দুশ্চিন্তা ও ভাবনাচিন্তার বহিঃপ্রকাশ বলেই মনে হচ্ছে।

সরকারের এ-ধরনের উদ্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে সফল হওয়া বেশ কঠিন এবং জটিলও। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার জন্যে শিক্ষক, ক্লাসরুম এবং কোর্স কারিকুলামের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মোটেও অবহেলা করা যায় না। নিকট অতীতে এলোমেলো, অগোছালো ও অপরিকল্পিতভাবে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার কার্যক্রম শুরু করতে গিয়ে যে লেজে-গোবরে অবস্থা তৈরি হয়েছে তার ফল মোটেও ভালো হয়নি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বেসরকারি কলেজ এবং নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষা লাভের বিবেচনায় মোটেও গুরুত্ব পাচ্ছে না। ঘুরেফিরে ছাত্রছাত্রীরা ঢাকাসহ পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেই ভিড় করছে, ভর্তি নিয়ে যুদ্ধের মতো তুমুল অবস্থা তৈরি করছে। ফলে সরকার এবং ইউজিসিকে বিষয়গুলো নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে বলব।

দেশে যে ১৯৫টি অনার্স কলেজ আছে সেগুলো কেন ছাত্রছাত্রীদের বিবেচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে না, অথচ এর প্রতিটিই এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা। উন্নত দুনিয়ায় কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, অথচ আমাদের এখানে তা হতে পারল না কেন—তা বোঝা দরকার, সেভাবে চিন্তাভাবনা ও কর্ম-পরিকল্পনা নেয়া দরকার। সেভাবে নতুন করে উদ্যোগ নিলেও প্রচুর সময়ের দরকার। কিন্তু ততদিনে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তি নিয়ে সংকট আরো ঘনীভূত হবে, মারাত্মক আকার ধারণ করবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই। সরকারকে অবশ্যই উচ্চশিক্ষার নীতি ও কর্ম-পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তবে আপাতত বিকল্প সম্ভাবনাগুলোকেও কাজে লাগানোর ত্বরিত উদ্যোগ নিতে হবে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সময় অর্থ ও শিক্ষকসমস্যাটি প্রধান; অর্থের জোগান দেয়া গেলেও শিক্ষকসমস্যার সমাধান রাতারাতি সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে সমস্যার ব্যাপকতাকে একটু সমাধান দিতে পারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকেই মনে করছেন এটি বোধহয় শুধু দূরশিক্ষণের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত। না, সেই ধারণাটি মোটেও সঠিক নয়। দুনিয়াজুড়েই দূরশিক্ষণ পদ্ধতির পাশাপাশি ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষাক্রমও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শতাধিক শিক্ষক কর্মরত আছেন। নিজস্ব ক্যাম্পাস, ভবনসহ নানাধরনের সুযোগসুবিধা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে। এখানে এখন যেসব সুবিধা রয়েছে তা ব্যবহার করে অনায়াসে ১৫/ ২০টি অনার্স কোর্স চালু করা সম্ভব। তাতে অন্তত ২/৩ হাজার ছাত্রছাত্রী একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেতে পারে।

www.pathagar.com

আমার ধারণা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ইউজিসি এবং সরকার একটি প্রতিষ্ঠিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, শিক্ষক, প্রযুক্তিসহ সকল সুযোগসুবিধা এখনই ব্যবহার করার উদ্যোগ নিতে পারে। এ ধরনের সম্ভাবনার ব্যবহারে এখনই উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শিক্ষকসহ আরো অব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানের কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ২০০৮

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি নিয়ে কী করা উচিত?

প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় বা সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি হওয়া নিয়ে একটি অনিশ্চয়তা, বিড়ম্বনা, যুদ্ধ, সময় ও অর্থখরচের পর্ব শুরু হয়; এর শেষ হয় হয় করেও হতে চায় না। আগস্ট-সেপ্টেম্বরে ফল প্রকাশিত হলেও ভর্তিপরীক্ষা, ফল প্রকাশ, ভর্তি কার্যক্রম, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি শুরু ও শেষ হতে বছর প্রায় শেষ হতে চলে। ছাত্র অভিভাবকদের এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটে না; দৌড়াদৌড়ি, অর্থ ব্যয়—কোনোটিই যেন শেষ হয় না। দিন যতই যাচ্ছে সমস্যাটি ততই প্রকট হচ্ছে। যদিও দেশে পাবলিক, বেসরকারি মিলিয়ে সাধারণ, প্রকৌশল, চিকিৎসাসহ নানা পেশা ও বিষয়ের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটের সংখ্যাও বাড়ছে; তথাপি চাহিদার তুলনায় মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আশানুরূপ বাড়েনি। ফলে চাপ বাড়ছে পাবলিক পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের ওপর।

ভর্তি নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তা কতিপয় প্রসিদ্ধ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই ঘটে থাকে। নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতি এখনো ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের আকর্ষণ বাড়েনি। না-বাড়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। তবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের মধ্যেও হাতে-গোনা কয়েকটি মাত্র ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। তা ছাড়া ঐসব প্রতিষ্ঠানে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন পড়ে তার যোগান দেওয়া অনেক অভিভাবকের পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না। তাই নানা কারণেই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিযুদ্ধটি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে প্রসিদ্ধ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের প্রতি। এখানেই সমস্যার কারণ অনেকটা নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়।

ধরা যাক এ বছরের কথা। গত ২৬ আগস্ট এইচএসসি তথা সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। দেশের ৭টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, ১টি মাদ্রাসা এবং ১টি কারিগরি— এই ৯টি বোর্ডের অধীন অনুষ্ঠিত তিন ধারার ছাত্রছাত্রীরা উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে। সাধারণ এইচএসসিতে এ বছর পাস করেছে ২ লাখ ৭৭ হাজার ৫২৩ জন পাস করে। এদের মধ্যে ১০,২০৫ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। মাদ্রাসা বোর্ডের আলিম পরীক্ষায় ৩৮ হাজার

www.pathagar.com

৬৮১ জন পাস করেছে; সেখানেও জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯৩০ জন। কারিগরি বোর্ড থেকে এইচএসসি পাস করেছে ৩৩ হাজার ৮৬৩ জন। অবশ্য সেখানে জিপিএ- ৫ পেয়েছে ৫ জন। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী এ বছর উক্ত তিনটি ধারা থেকে উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে। এদের মধ্যে অন্তত ২ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীই উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে অনার্স বা বাজারমূল্য রয়েছে এমন বিষয় নিয়ে পড়তে চাইবে। এরা স্বভাবতই দেশের প্রসিদ্ধ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির একটি চেষ্টা করবেই। দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৮টি, তবে ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বিবেচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ কৃষিসহ হাতে-গোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোর দিকেই থাকে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন আছে বিশ হাজারের মতো। বুয়েটে ৮১০টি, অন্যান্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪,৫০০টি, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহে ১,৪৫০টি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ৪,০০০, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ১১,০০০ (এগারো হাজার)। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় দুইশত কলেজে ৬-৭ হাজার আসন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার পর হাজারখানেক সরকারি-বেসরকারি কলেজ রয়েছে যেগুলোতে পাসকোর্সে ভর্তি হওয়ার শেষ ভরসা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে দীর্ঘদিন থেকে মেডিকেল কলেজে ভর্তির একটি অভিন্ন পদ্ধতি চালু হয়ে আছে। এর ফলে চিকিৎসা বিষয়ে ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের বারবার এখানে-সেখানে দৌড়াতে হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীরা এক পরীক্ষাতেই চুকিয়ে নিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে যেতে হয়। আজ এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ক ইউনিটে দিচ্ছে তো, কাল অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গ-ইউনিটের পরীক্ষায় অংশ নিতে দৌড়াতে হচ্ছে। এতে ছাত্রছাত্রীদের ওপর মানসিক, দৈহিক এবং আর্থিক প্রবল চাপ পড়ে। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হয়। থাকা, খাওয়া এবং যাতায়াতের বিড়ম্বনার কথা তো সকলেরই জানা কথা। এক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়টি যাচাই-বাছাই করা ছাড়া সাধারণত করা হয় না। উন্নত দুনিয়াতেও ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়ই। সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে কিছু মান বজায় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাদের দেশে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব পদ্ধতিতে নানা ইউনিটে এসব ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে। তবে কেন যেন একটা বড় ধরনের গ্যাপ দিন দিন তৈরি হয়ে চলছেই। যে ছাত্র এসএসসি-এইচএসসিতে পড়ে এসেছে বিজ্ঞান নিয়ে, সে শেষপর্যন্ত ভর্তি হচ্ছে এমন বিষয়ে যা সে আগে কখনো পড়েওনি, নামও হয়তো শোনেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে, একটি

www.pathagar.com

ডিগ্রি নিতে হবে, সনদ পেতে হবে, অতএব তাকে শেষপর্যন্ত ভাগ্যকে সানন্দে বরণ করে নিতে হচ্ছেই। এ ধরনের পরিস্থিতি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

এখানেই আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের উচ্চশিক্ষার একটি বড় অসফলতার বোঝাকে আমরা বিরামহীনভাবে বৃদ্ধি হতে দিচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিষয় নিয়ে উচ্চতর পড়াশোনা করবে অথচ শিক্ষার্থীর এ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, জ্ঞান, প্রস্তুতি থাকবে না, এমনকি আকর্ষণ থাকবে না— তা কী করে হয়? অথচ আমাদের দেশে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই নিজের শিক্ষাজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, পছন্দের বিষয়ে পড়তে পারছে না। ফলটা খুব একটা ভালো হয়ও না। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না, কিছুটা একাত্ম হতেই তাদের ২/৩ বছর চলে যায়, ততদিনে দার্জিলিং ট্রেন অনেক দূর চলে যায়, পেছনে পড়ে থাকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা। আমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা জেনেশুনেই বছরের-পর-বছর এ-ধরনের আর্থিক ও মেধার অপচয় করে আসছি। একদিকে জনগণের বিপুল অর্থ খরচ হচ্ছে, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরাও নিজেদের মেধা এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। খুব সামান্য সংখ্যক ছাত্রছাত্রীই বিষয়ের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে নিতে পারছে, ভালো ফলাফল করতে পারছে। এর ওপর রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব দুর্বলতা, অদক্ষতা, শিক্ষাক্রমের দুর্বলতা, শিক্ষকস্বল্পতাসহ অনেক সমস্যা। ফলে আমাদের উচ্চশিক্ষা দিন দিন গতি হারাচ্ছে, এর ঔজ্জ্বল্যও হারাচ্ছে। এটি এখন অনেকটাই প্রতিষ্ঠান এবং নামসর্বস্ব হয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, কলেজগুলোর মতো জিপিএ ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির বিষয়টি মঞ্জুরি কমিশন এবং সরকার গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করছে। আমি জানি না বিষয়টি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে গ্রহণ করবে; বিবেচনা করবে কিনা। তবে বর্তমান ভর্তিপরীক্ষার পদ্ধতিতে দুর্নীতি অনেকটা রোধ করা গেলেও উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে খুব একটা সফল হচ্ছে বলে মনে হয় না। উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশে সফল না হয়ে যদি উল্টো অবস্থা বিরাজ করে তাহলে তেমন ভর্তিপদ্ধতিতে অবশ্যই সংস্কার আনতে হবে, পদ্ধতিটিকে আধুনিকায়ন করার কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মেধা, বিষয় দক্ষতা, আকর্ষণ, পূর্বপ্রস্তুতি যাচাই-বাছাইকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। শুধুমাত্র জিপিএ-৫ দেখে কাউকে যে-কোনো বিষয়ে ভর্তি করালেই চলবে না, ছাত্রছাত্রীর উক্ত বিষয়ে পড়ার আগ্রহ থাকতে হবে, পড়ার মতো প্রাথমিক ভিত্তিও বিবেচ্য বিষয়। সে-ধরনের যাচাই-বাছাই এখন খুব একটা হচ্ছে না।

www.pathagar.com

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস এবং শিক্ষার পরিবেশ

পৃথিবীর সবদেশেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধ্যায়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রাবাস রয়েছে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে থাকে। স্কুল পর্যায়ের ছেলেমেয়েরা সাধারণত পিতামাতার তত্ত্বাবধানে থাকে, তাই এই স্তরে হোস্টেলের প্রয়োজনীয়তা খুব একটা অনুভূত হয় না। তারপরও কোনো কোনো স্কুলকর্তৃপক্ষ তাদের তত্ত্বাবধানে কিছু কিছু হোস্টেল পরিচালনা করে থাকে। সেটি স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে নয়, বরং ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখা যায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীরা বয়সে তরুণ থাকে; নিজেদের নিরাপত্তা, ভালো-মন্দ অনেকটাই বুঝতে শেখে; স্বাধীনভাবে থাকতে, পড়তে ও চলাফেরা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। ধরে নেয়া হয় যে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছেলেমেয়েরা অনেকটাই স্বাবলম্বী। যারা ততটা নয় তারাও বরং হোস্টেল জীবনে এসে ভিন্নভাবে নিজেদের তৈরি করার সুযোগ পায়।

আমাদের দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বয়স খুব বেশি নয়। তারপরও বলতে দ্বিধা নেই, গত ষাট-সত্তর বছর ধরে দেশে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলে ও মেয়েরা গ্রাম, মফস্বল শহর, এ-শহর ও-শহর থেকে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল-হোস্টেলে বিছানাপত্তর নিয়ে উঠছে, থাকছে। যারা একখানি থাকার সিট পাচ্ছে না তারা আত্মীয়স্বজনের বাসায় থাকছে; মেস, বাসাভাড়া করে থাকছে। হালের বেসরকারি বিশ্বাবিদ্যালয়গুলোতে পড়তে আসা ছেলেমেয়েরা তো চরম বিপাকে জীবন কাটাচ্ছে। অন্য শহর বা গ্রাম থেকে আসা ছেলেমেয়েরা বাসা, হোস্টেল, মেস ভাড়া করে এখানে-সেখানে থাকছে। সরকারি কলেজ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠার সময় ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে হল-হোস্টেল নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়ে থাকে। সুতরাং এ-ধরনের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ছাত্রাবাস একটি আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে।

শুরুতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবাসগুলো শুধু ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক ভবনই ছিল না, এগুলো লেখাপড়া, সংস্কৃতি, ক্রীড়াচর্চা ও মানসিক বিকাশেরও একটি অনুকূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা রেখেছিল। দূরদূরান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রাবাসে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার, এক অঞ্চলের

www.pathagar.com

ছেলেমেয়েরা অন্য অঞ্চলের আচার-আচরণ, জীবনাবস্থা জানার সুযোগ পেত। নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য স্থাপন করত; লেখাপড়ায় একজন অন্যজনের সাহায্য নেয়া, প্রতিযোগিতা দেয়া ইত্যাদি সুযোগগুলো কাজে লাগাত। নিয়মিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করার প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তোলার দিকে মনোযোগী হত। হল-হোস্টেলের নিয়ম মানার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের গভীর দৃষ্টি থাকত; নিয়ম ভাঙা, উচ্ছৃঙ্খল আচরণকারীদের প্রতি অনাস্থা তখন প্রবল ছিল। হল-হোস্টেলে ছাত্রছাত্রীরা নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন ও নেতৃত্ব প্রদান ইত্যাদি সুযোগ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দারুণভাবে উপভোগ করত। সে-কারণে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর হোস্টেল-হল জীবনের প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ ছিল। যে ক'বছর হলে থাকার সুযোগ পেত লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজেদের গড়ে তোলা, জীবনকে আনন্দময়, বৈচিত্র্যময় করে তোলার জন্যে সকলেই কমবেশি আগ্রহী ছিল। সে-কারণে এখনো দেখা যায় যে, জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও অনেকেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের হোস্টেলের দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করতে পছন্দ করছেন, নস্টালজিয়ায় ভুগছেন, কিছুক্ষণের জন্য ফিরে যেতে ব্যাকুল হয়ে আছেন।

অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এখন বাংলাদেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল-হোস্টেলে উপরে বর্ণিত সেই পরিবেশ নেই; সেরকম ব্যবস্থাপনাও নেই কোথাও। দখলদারিত্ব, অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, মারামারি, জোরজবরদস্তি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অচল করে দেয়া, জিম্মি করে রাখার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে হোস্টেলগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে, বিবেচিত হচ্ছে। বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে থাকছে বাধ্য হয়ে— থাকার বিকল্প ব্যবস্থা নেই বলে। সরকারি কলেজগুলোর ছাত্রাবাস, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রাবাসসমূহ কোনো-না-কোনো প্রভাবশালী ছাত্রসংগঠনের দখলে থাকে। যে কলেজ যে ছাত্রসংগঠন একবার দখল করতে সক্ষম হয়েছে সেখানে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের চলাফেরা, লেখাপড়া, শিক্ষক বদলি, শিক্ষকদের আচার-আচরণ সেই রাজনৈতিক সংগঠনের ইচ্ছেমতো চলছে; অন্য সংগঠনের সমর্থক-কর্মীদের লেখাপড়া, থাকা, যাতায়াত অনেকটাই থাকে নিয়ন্ত্রিত, হুমকির মুখে। বস্তুত লেখাপড়ার পরিবেশ, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক চর্চা, ক্রীড়া ইত্যাদি সবকিছুই চলছে দখলদার ছাত্রসংগঠনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর, তাদের রুচি ও অভিরুচি অনুযায়ী। সরকার আসে যায়, ঐসব কলেজে দখলদারিত্ব খুব একটা পরিবর্তিত হয় না, ছাত্রছাত্রীরা মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে খুব একটা পারছে না। হোস্টেলজীবনও ওইসব কলেজে যুগ যুগ ধরে একইভাবে চলে আসছে। এসব দখলদারিত্বের সঙ্গে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও জোরজবরদস্তি এমনভাবে জড়িত আছে যে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া, থাকা, খাওয়া, চলাফেরা মোটেও স্বাভাবিক ও স্বাধীন নয়। বাংলাদেশে বেশিরভাগ ঐতিহ্যবাহী সরকারি কলেজের সুনাম এখন হারিয়ে যেতে বসেছে, লেখাপড়ার সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হয়ে আছে; শিক্ষকগণ ও রাজনৈতিক দলাদলি, সুবিধা আদায়-অনাদায়ে ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃতভাবে লিপ্ত হয়েছেন।

www.pathagar.com

না, আমরা শত বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সেইসব কলেজের নাম এখন আর ভালো কলেজের তালিকায় দেখি না। বরং ঐসব কলেজের ছাত্রাবাসে কোনো-না-কোনো ছাত্রসংগঠনের দখলদারিত্ব, চাঁদাবাজি, গাড়ি-ভাঙচুরের কথা শুনি; সেইসব কলেজ হোস্টেলে মাদকদ্রব্য সামগ্রীর প্রভাববৃদ্ধির কথা শুনি; প্রভাবশালী তথাকথিত ছাত্রনেতার কেউ কেউ হোস্টেলগুলোকে তাদের আরাম-আয়েশ, অসামাজিক কাজে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করার কথা শুনি; যথেচ্ছাচার জীবনযাপনের কথাও মাঝে মধ্যে শুনি। এসবই দুঃখজনক কথা এবং অভিজ্ঞতা। কলেজশিক্ষা জীবনকে অর্থবহ করার জন্য যে ছাত্রাবাসগুলো গড়ে তোলা হয়েছিল—এখন মনে হচ্ছে গোটা কলেজের শিক্ষাজীবনকে অন্ধকারে ধাবিত করতে ছাত্রাবাসগুলো কোনো-না-কোনোভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলোর ব্যবস্থাপনায় কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। সিট বণ্টনসহ সবকিছুই চলছে দখলদার ছাত্রসংগঠনের নেতাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে। হল-ছাত্রাবাসে প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আইন, দেশের আইন—সবই যুগ যুগ ধরে অচল ও ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। ফলে বেশিরভাগ সরকারি কলেজের শিক্ষার পরিবেশ, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ম্লান হয়ে গেছে; জিম্মি হয়ে আছে দখলদার ছাত্রসংগঠনগুলোর কাছে—যারা ঐসব কলেজের ছাত্রাবাসে বসেই কলেজগুলো, আশপাশের ব্যবসা-বাণিজ্য, দলীয় রাজনীতি ও সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন বলুন কলেজ শিক্ষার সঙ্গে এসবের আদৌ সম্পর্ক থাকা উচিত কি? বাংলাদেশের কলেজ শিক্ষাকে আপন মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে হলে কলেজ হোস্টেলসহ সকল বিষয়কেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিতে হবে, পরিবর্তনের আয়োজন ও উদ্যোগ ব্যাপকভাবে থাকতে হবে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পরিবেশ ক্রমাগত নিচে নেমে যাচ্ছে। মানহীনতার অনেকগুলো কারণ আমরা ইতিমধ্যে নিজেরাই জন্ম দিয়েছি। দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য, অদক্ষ ও দলীয় অনুগত ক্যাডার-শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মানহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। এর একটি মস্তবড় প্রভাব পড়েছে হল প্রশাসনেও। সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ছাত্রসংগঠনগুলো দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধান বিবেচনায় থাকে বা আছে। বিশেষত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত ছাত্রসংগঠন এক্ষেত্রে অগ্রণী থাকে। ইসলামী ছাত্রশিবির অবশ্য গত শতাব্দীর আশির দশক থেকেই দেশের সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত হয়েছে, নব্বইয়ের দশকে তারা আঞ্চলিক সবকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে নিজেদের দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ৪ দলীয় জোট সরকারের সময়ে এক্ষেত্রে ছাত্রশিবির সবচাইতে বেশি প্রশাসনিক সুবিধা লাভ করেছে। হলগুলোতে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার তারা করেছে, নিজেদের দলীয় ক্যাডারদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরূপে ব্যাপকহারে নিয়োগদানের সুযোগ করে দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলোতে জোট সরকারের আমলে ছাত্রদলের একচ্ছত্র প্রভাব ছিল। ছাত্রলীগ ছিল বিতাড়িত। এখন মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগ হলগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হওয়ায় হলগুলোতে নানা প্রতিরোধ ও বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে। এগুলোর কোনোটাই

www.pathagar.com

সমর্থনযোগ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার, রাজনৈতিক দল কারো জন্যই মঙ্গল বয়ে আনার মতো বিষয় নয়। বরং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্রাবাসমূহকে কীভাবে দখলমুক্ত করা যায়; হল প্রশাসনকে আইনের নীতিতে পরিচালনা করা যায়; ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া, থাকা-খাওয়া ও উন্নত জীবন চিন্তার অনুকূল পরিবেশ হিসেবে গড়ে তোলা যায়—সেকথাই গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে হবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করেছি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হলে ৫ বছর আবাসিক শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র হিসেবে দুই বছর এসএম হলে থেকেছি। আমার অভিজ্ঞতা হল, উন্নত দুনিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা কোনো ছাত্রসংগঠনের প্রভাব, দখলদারিত্ব, কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সামান্যতম লক্ষণ খুঁজে পায় না। হোস্টেলে নিয়মনীতির বাইরে কারো চলার কোনো সুযোগ নেই। তেমন চিন্তা কোনো ছাত্রছাত্রী করে বলে মনে হয়নি। আমাদের এখানে ছাত্রছাত্রীদের মনমানসিকতায় কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস জীবনের ঘাটতি ব্যাপকভাবে আছে। একশ্রেণীর ছাত্রছাত্রী জীবনের ওই স্তরে এসে নিজেদেরকে খুব একটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। লেখাপড়ার সঙ্গে তাদের প্রাত্যহিক সম্পর্কটা খুবই ক্ষীণ হতে দেখা যায়। দল, আড্ডা, ঘুরে বেড়ানো, প্রভাব বিস্তার করা, অবৈধ সুযোগসুবিধা নেয়া, ফাও খাওয়া, বয়-বেয়ারারদের ব্যবহার করা, মারধোর করা, সিট দখল করা, ধরে রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

হল প্রশাসনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দলীয় অনুগত শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ছাত্রসংগঠনগুলোও তেমন প্রশাসনই পেতে আগ্রহী থাকে। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হল প্রশাসনও চলে ঢিমেতালে, ছাত্রনেতাদের খুশি রেখে, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে। হলগুলোতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত জীবন অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় দখলদার ছাত্রসংগঠনের নেতা-ক্যাডারদের মর্জির ওপর। সিট পাওয়া, সিটে থাকা ইত্যাদিও ক্যাডার নেতারাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আবাসিক-অনাবাসিক ছাত্রদের অনেককেই ছাত্রসংগঠনের মিছিল, কর্মসূচি ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। হলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পরিবেশ খুব একটা অনুকূলে নেই। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই হলে যে ধরনের জীবন প্রতিদিন অতিবাহিত করে তার সঙ্গে লেখাপড়ার পরিবেশ খুব একটা দেখি না। অথচ আমার বিদেশ জীবনের ছাত্রাবাসের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এসবের কোনো মিল নেই, পরিচিত হওয়ার সুযোগই ছিল না। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষা জীবনের ধরনধারণ চরিত্রই ভিন্নতর, একই সঙ্গে ছাত্রাবাসও। সুতরাং দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় একবিংশ শতাব্দীর পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া না হলে সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ ছাত্রাবাস জীবনে খুব বেশি স্থায়ী পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয় না।

ভোরের কাগজ, ২৪ জানুয়ারি ২০০৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com